

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নির্বাচিত

গল্পগুচ্ছ

বাংলা অনুবাদ



অসম সাহিত্য সভা

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার

নির্বাচিত অসমীয়া গল্পগুচ্ছ

(বাংলা অনুবাদ)

মুখ্য সম্পাদক

ড° পরাগ কুমার ভট্টাচার্য

সম্পাদক

ড° পরমানন্দ রাজবংশী



অসম সাহিত্য সভা

BRAHMAPUTRA UPPATYAKAR NIRBACHITA ASAMIYA GALPA-GUSCHA Edited by Dr. Parag Kumar Bhattacharyya & Dr.Paramananda Rajbongshi and Published by Prahlad Chandra Tasa, General Secretary, Asam Sahitya Sabha, Chandrakanta Handiqui Bhavan, Jorhat-785001, January, 2014,

Price: Rs. 160.00

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার নির্বাচিত অসমীয়া গল্পগুচ্ছ

(বাংলা অনুবাদ)

গ্রন্থস্বত্ব

অসম সাহিত্য সভা

প্রকাশ কাল

জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক ঃ

প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা

প্রধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন,

যোরহাট ৭৮৫০০১

বেটুপাত ঃ

মনজিৎ রাজখোআ

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টকা

ছাপাখানা ঃ

ডেষ্টীনি প্ৰিন্টিং প্ৰেছ

বাজগড় ৰোড়, গুৱাহাটী-৩

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য

গত প্রায় একশো বছর ধরে অসম সাহিত্য সভা গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এক অভিলেখ সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। সাহিত্য সভা এখন অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টিৰ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বাংলা গদ্য ও পদ্য প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। অসমীয়া ছোট গল্পকে বাংলা রূপান্তৰ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল কটন কলেজে এক অনুবাদ কর্মশালা অনুষ্ঠিত করে। তার অধিক সংখ্যক গল্প এই সংকলনটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আলাদা আলাদা অনুবাদকের গল্পও বইটিতে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানিতে খুব অল্প সংখ্যক অসমীয়া ছোটগল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী কালে আরো অধিক গল্প সন্নিবেশের জন্যে প্রয়াস করবো।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে ড° পরাগ কুমাৰ ভট্টাচার্য ও ড° পরমানন্দ রাজবংশীর নিরন্তর প্রয়াসের জন্যে সংকলনটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দুজনকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা
প্রধান সম্পাদক

২০ ডিচেম্বৰ, ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ
চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভবন
যোরহাট

সূচীপত্র

ভূমিকা

উনিশ শতকে নির্দিষ্ট কলানিপুণ শৈলী সহযোগে, স্বকীয় রূপনির্মিতিতে উদ্ভাসিত কথাশিল্প হল ছোটোগল্প, যা আধুনিক সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন। উপন্যাস গীতিকবিতা নাটক উপাখ্যান রূপকথা ইত্যাদি নানা প্রচলিত সাহিত্যরূপের উপাদান সংগ্রহ করে কাহিনি বিবৃত করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল আধুনিক ছোটগল্পে। এখানেও রয়েছে চরিত্রাঙ্কন সংলাপ কাহিনিবিন্যাস জীবনদর্শন প্রভৃতি, সাহিত্যের তথাকথিত উপাদান। কিন্তু এসব কিছুর বাইরেও, মূলত স্রষ্টার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত জীবনবোধে, ছোটগল্প সমুজ্জ্বল। ছোটগল্প হল শিল্পসম্মত রূপে অঙ্কিত, একটি ক্ষুদ্রচিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জিত, জীবন ও জগতের এক অনন্য রূপ।

জীবনের এই ক্ষুদ্র ছোট্ট মুহূর্তটির ওপর লেখকের দৃষ্টি যতটা গভীরভাবে নিপতিত, তা থেকেই উদঘাটিত হয় একটা নতুনতর সত্য। যার জন্য সকল কলারীতিকেই স্রষ্টা নিয়োগ করেন, সেই মুহূর্তটিকে আশ্চর্য সুন্দররূপে উদ্ভাসিত করে তোলার জন্য। সকল প্রকার কাব্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করার ফলে ছোটগল্প নামক শিল্পটি অধিক সংহত রূপ লাভ করেছে। এবং পাঠকের হৃদয়ে আলোড়ন জাগিয়ে তোলার মতো প্রাচুর্য আহরণ করেছে। এ সব কারণেই আজকের ব্যস্ত কোলাহলময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্রেণির সাহিত্য, বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, পাঠকের মন।

আধুনিক মানুষের মনের খোরাক জোগাতে বস্তুজগৎ তথা মনোজগতের প্রতিচ্ছবি এখানে প্রতিফলিত। আধুনিক যুগমানসের উপযোগী আঙ্গিকও ব্যবহৃত। বস্তুত এটি পরিপূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্ভূত একটি নব্য রচনা। প্রখ্যাত গল্পকার এবং সমালোচক ফ্রাঙ্ক ওকোনার এই লক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বর্তমান কালে ছোটগল্পকে যথার্থ সাহিত্যিক শৈলী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

"The short story like the Novel is a modern Art form,that is to say it represent better than poetry or drama our own attitude to life" – (The lonely voice)

গল্প বলা আর শোনার যে আদিম কৌতূহল তারই পরিণতি হিসেবে যুগে যুগে কথাসাহিত্য বৈচিত্রমণ্ডিত রূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নানা রীতিতে মনোরঞ্জনধর্মী কাহিনি বিবৃত করার কলারীতি রূপকথায় গৃহীত হতে আমরা লক্ষ করেছি। এই প্রবণতায় সিঞ্চিত হয়েই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমধিক কথাসাহিত্যের সৃষ্টি।

কাহিনিকে ক্রমান্বয়ে একটা সংহত বিন্দুর কাছকাছি নিয়ে গিয়ে ঔৎসুক্যের মাঝখানে

পাঠকের মনকে মুক্তি দেয়া, এবং একই সঙ্গে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা অব্যাহত রাখার প্রয়াস, মধ্যযুগের আখ্যান সাহিত্যে প্রকটিত হয়েছিল। এই সময়ের তিনজন প্রখ্যাত কথাকার বোকাচ্চো, চসার এবং র‍্যাবলে। এঁরাই সাহিত্যের এই ধারাকে সমুন্নত শিল্পরূপে উন্নীত করে গেলেন। বোকাচ্চোর হাতে বাকশিল্প যে-শ্রেষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার নিদর্শন আছে তাঁর 'দ্য ফেলকন' গল্পে। ফেদরিকো তার প্রিয়তমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে না, তার ব্যঞ্জনাময় অতৃপ্তি, মূল গল্পের শরীরে উৎকীর্ণ হয়ে যেন আধুনিক ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণকেই নির্দিষ্ট করে গেছে। আর রোমাঞ্চ রূপক ও নীতি-উপদেশের সমন্বয়ে মনোরম কথাসাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছেন চসার। তাঁর বিচিত্র চরিত্রনির্মাণ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। তাঁর 'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এর কাহিনিবৈচিত্র ও চরিত্রনির্মাণ-পদ্ধতি পাঠককে আজও বিস্মিত করে। আবার র‍্যাবলে অনুরূপ বাগভঙ্গিমায় আধুনিক গল্পকারদের দিয়ে গেলেন বুদ্ধি আর ব্যঙ্গের উত্তরাধিকার।

ছোটগল্পের বৈচিত্র এবং বুদ্ধিদীপ্ততা উৎসারিত হয়েছে আধুনিক বাস্তববোধ থেকে। এই বাস্তববোধের জাগরণে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবও নগণ্য নয়। উনিশ শতক থেকেই গল্পে এই বাস্তববোধের সংক্রমণ ঘটেছে। অবশ্য রোমান্টিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গোড়ার দিকে রোমাঞ্চের আতিশয্য লক্ষণীয়। এই রোমাঞ্চের প্রভাব, পরবর্তীকালে বাস্তববোধমথিত গল্পের মধ্যেও, অভিনব সৌন্দর্যরূপে অঙ্কিত হয়েছে।

উনিশ শতকে রোমান্টিকতার পয়োভর দেখা যায়— এবং এই সময় জর্মান দেশ রোমান্টিক ভাবালুতায় মত্ত। এই শতকে গল্পের বিকাশ ঘটল রোমান্টিকতার কাণ্ডারী হেনরিখ ভন ক্লেইস্ট, ই.টি.এ হফম্যান, গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে। উপকথা রূপকথা রূপকের আঙ্গিক-আশ্রিত এই কথাসাহিত্য ছিল মূলত রোমাঞ্চধর্মী।

আমেরিকায় আরভিঙের 'স্কেচ বুক'-এর মনোরম কাহিনি যখন পাঠককে আলোড়িত করছিল, ঠিক তখনই ছোটগল্পের অভিনব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হলেন এডগার অ্যালেন পো, তাঁর বিচিত্র সব গল্পরাজি নিয়ে, পাঠকের দরবারে। পো-র গল্পের আকর্ষণ এবং প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি বাস্তবতাপ্রবণ শিল্পী ছিলেন, যদিও তা ছিল কৃত্রিমতা পূর্ণ।

গল্পের এই রোমান্টিক আতিশয্যের বিপরীতে সাধারণ মানুষের সুখদুখের চিত্রায়ণ ও বাস্তবজীবনের প্রতিফলন ঘটালেন রাশিয়ান গল্পকার আলেকজান্দার পুশকিন এবং গোগোল। প্রকৃতার্থে গোগোলকেই ছোটগল্পের সার্থক শিল্পী বলে অভিহিত করা যায়। সমসাময়িক সমাজ পটভূমিতে, গল্পে তিনি জন্ম দিলেন বাস্তবতাবাদের। তাঁর 'ওভারকোট'-এর মতো ব্যঞ্জনাময় গল্প পরবর্তীকালে প্রায় সকল গল্পকারকেই

বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। দারিদ্রপীড়িত একজন কেরানি নিজের কষ্টার্জিত ওভারকোটটি হারিয়ে, সেই অন্যায়ের সুবিচার প্রার্থনা করে মৃত্যু জগৎ থেকে উঠে এসেছে। গোগোলের অনুবর্তীকালে, গল্পকার চেখভের হাতে ছোটগল্প মনোরম কলানৈপুণ্যে প্রকাশ পেল।

ফরাসি সাহিত্যে বাস্তবতাবাদের প্রসার ঘটেছিল বালজাক, গুস্তভ ফ্লব্যের, মেরিমে প্রভৃতি গল্পকারদের হাতে। তাঁদেরই সার্থক উত্তরাধিকারি হলেন মোপাঁসা। তাঁর হাতে ছোটগল্পের লিখনশৈলী পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশেষ করে শৈলীসংগঠন, কাহিনির সুবিন্যাস, বহিরঙ্গ উপাদানের অপসারণ, পরিমিত ভাষা, চিত্রকল্প আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অপূর্ব সঙ্গমে।

বিশ শতকের গল্পসাহিত্য, মানবিক মূল্যবোধের রূপান্তরের পটভূমিতে নিত্য নতুন পরিসর, পাঠকের সম্মুখে উন্মোচিত করল। নতুন দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট রূপান্তর, ইত্যাদির সাক্ষ্য বহন করল এ কালের গল্পসমূহ। শুরু হল মানবচৈতন্যের বিশ্লেষণ। তার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হল, মানবচরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর সঙ্গে তা প্রভাবিত করল আঙ্গিককেও। সমারসেট মম, ক্যাথরিন ম্যাসফিল্ড, ফ্রানৎজ কাফকা প্রভৃতি লেখকগণ যে-ধারার গোড়াপত্তন করলেন, সেই ধারাকে আরও বেশি প্রবলভাবে তুলে ধরলেন পরবর্তী গল্পকাররা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথা বস্তুবাদী সভ্যতার প্রসার ভারতবর্ষেও আধুনিক সাহিত্যে বিভিন্ন আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছে। মূলত পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পরই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ভারতীয় সমাজে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেটাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিনব পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্যক্তিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা। আর এ সময়ে ভারতে সংঘটিত জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতেও যে-জাগরণ দেখা গেল তার ফলশ্রুতিতেই জন্ম নিল ছোটগল্প।

এই নব্য শিক্ষার আলো অসমের জাতীয় জীবন বিধৌত করে যাবার পরই, অসমে নতুন নতুন সাহিত্যরূপের জন্ম হতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে অসমিয়া সাহিত্যে নতুনত্বের ঢল নিয়ে উপস্থিত হয় 'অরুণোদই'। অরুণোদই পত্রিকাটি ছিল মুখ্যত ধর্ম সম্পর্কীয়। তবুও সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর, বিশ্বের বিভিন্ন সাহিতকীর্তির অনুবাদ আদি যাবতীয় রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে সেটিপ্রকাশ পেত। খ্রিস্টান মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৮৪৬ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ করে। এবং ১৮৮২ সাল পর্যন্ত

সুদীর্ঘকাল এই পত্রিকাটি অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যে অভিনব অবদান রেখে যায়। এই কালখণ্ডেই, পত্রিকাটি আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যকে রূপদান করে। এবং অসমিয়া সাহিত্যে নানা ধারার আমদানি করে। বস্তুত, বুনিয়নের 'পিলিগ্রিমস প্রগ্রেস' উপন্যাসের অনুবাদ অসমিয়া সাহিত্যে আধুনিক কথাসাহিত্যের ধারাকে বহন করে নিয়ে আসে। এক কথায় এই পত্রিকাটি পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের প্রবাহ অসমিয়া সাহিত্যে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। পত্রিকাটির আমদানিকৃত সাহিত্য-আন্দোলনের পটভূমিতেই পরবর্তীকালে অসমিয়া সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে।

আধুনিক কথাসাহিত্যের পত্তনে এই পত্রিকাটির অবদান অনস্বীকার্য। এই পত্রিকার পাতায়ই প্রথম দেশি এবং বিদেশি রূপকথা সমূহ লিখিত রূপ পেল। মৌখিক কাহিনি লিখিত গদ্যের আকার নিয়ে অনন্য 'রূপ'-এ প্রকাশিত হয়ে উঠল। বেশির ভাগই খ্রিস্টধর্মের মহিমাকীর্তন। যদিও সেইসব গল্পগাছাই, কথাসাহিত্যের যাত্রার শুভারম্ভ সূচনা করে। তথায় প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য কাহিনি 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এবং 'নিউ টেস্টামেন্ট' থেকে সংকলিত Solomon's decission (এপ্রিল ১৮৪৩) The richman and Lazarus (আগস্ট ১৮৪৮) Parable of prodigal son ইত্যাদি (আগস্ট ১৮৪৪) এবং ভারতীয় ও গ্রিক মহাকাব্য থেকে বিভিন্ন রূপকথা তথা খ্রিস্টান ধর্মান্তরের সংবাদগুলো রসাল গল্প হিসেবে প্রকাশিত হত। এই বর্ণনাগুলো ছিল অপূর্ব কথাসাহিত্যেরই নিদর্শন (সে যুগে)। ড. মহেশ্বর নেওগ 'অরুণোদই"-এর পাতায় প্রকাশিত এ হেন গল্পরাজি পরবর্তীকালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পের চাহিদা পূরণ করছিল বলে অরুণোদই সম্পাদনার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আবার, এসব গল্পকে কোনোপ্রকারেই ছোটগল্পের সারিতে স্থান দেওয়া যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করে বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন "These note that appeared in the Oroneadoi gave varied information of life all round us yet these stories were not short story"

যথার্থ ছোটগল্পের বিকাশ ঘটে এর পরবর্তীকালে, 'জোনাকি' যুগের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার স্বহস্তে। 'জোনাকি' পত্রিকাটি অসমিয়া সাহিত্যে রোমন্টিক আন্দোলনকে সাদরে বরণ করে এনেছিল। ফলে সাহিত্যের নিত্যনতুন রূপ অসমিয়া সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে। ফলে রূপকথা বুরঞ্জির কাহিনি প্রভৃতি নতুন ভাবে ও ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশে সামর্থ্য অর্জন করল। পাশ্চাত্য ছোটগল্পের অনুকরণে রূপকথা ও লোকজীবনের দু-একটি চিত্র, গল্পের পোশাকে উপস্থাপিত হচ্ছিল। প্রথমত একে ছোটগল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। যদিও পাশ্চাত্য ছোটগল্পের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে প্রস্ফুটিত

হচ্ছিল।

রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এ ধরনের কথাসাহিত্যের স্রষ্টা। 'জোনাকি' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত, যদিও তিনি জোনাকি প্রকাশের পূর্বেই এই শ্রেণির গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর 'ভদরি' গল্পে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তের ওপর আলোকসম্পাৎ করে জীবনচিত্র অঙ্কন, চিত্তাকর্ষক শুরুয়াৎ, পরিসমাপ্তি, সংহতি, ঘটনার ঐক্য, এবং নৈর্ব্যক্তিকতা ইত্যাদি ছোটগল্পের সমুদায় লক্ষণই তাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক তথা সাহিত্য সমালোচক ড. বীবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন— "বেজবরুয়া বিভিন্ন ধরনের গল্প রচনা করেছেন, যদিও তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক চিত্র 'ভদরি'ই হল ছোটগল্পের পথ প্রদর্শক।"

বেজবরুয়ার পরে অসমিয়া গল্পসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, গল্পকার শরৎচন্দ্র গোস্বামী। সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতি উদ্ভাবন করে এই গল্পকার অসমিয়া গল্পকে একটা নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। তাঁর পরে সূর্যকুমার ভুঞা, দণ্ডিনাথ কলিতা এবং মিত্রদেব মহন্তপ্রভৃতি লেখকগণ অসমিয়া ছোটগল্পের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করলেন।

১৯২৯ সালে 'আবাহন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় গল্পকার নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দীননাথ শর্মার সম্পাদনায়। অসমিয়া ছোটগল্প বর্ণাঢ্য রূপ নিয়ে হাজির হয় এই পত্রিকাটির পাতায়। এই পত্রিকা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন রোমন্টিক আন্দোলনের গতি তীব্রতর হল, তেমনি অন্যদিকে বাস্তবধর্মী গল্পসাহিত্যেরও বিকাশ ঘটল। একদিকে বাস্তববোধ অন্যদিকে রোমান্টিক ধারার পরিপূর্ণতা এ যুগের গল্পের বিশেষ লক্ষণ।

এই সময় অসমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বাড়তে শুরু করে। কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতির বাতাবরণও অসমে গা করে ওঠে। গুয়াহাটিতে কটন কলেজ স্থাপিত হবার পর, এখানেও পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে। এর ফলে বিভিন্ন ভাবধারার বিকাশ ঘটে এবং অসমিয়া সাহিত্যও অভি নব রূপ পরিগ্রহ করে। বিশ্বসাহিত্যের জটিলতা অসমিয়া সাহিত্যকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। বিশ্বের চিন্তাবিদদের উদ্ভাবনা সাহিত্যকে দান করে জটিলতা, ফলে পূর্বেকার লোকসাহিত্যের সরলতার স্থান দখল করে নেয় আধুনিক চিন্তাবিদদের চিন্তার জটিলতা। বিশেষ করে ডারউইনের মতবাদ, মানুষ ভগবান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাগুলোর আমূল পরিবর্তন সাধন করে। মানুষ যে ভগবানের সৃষ্ট নয় বরং তা জীবেরই ক্রমবিকাশের এক রূপ সে-

কথা ডারউইন তাঁর Theory of evolution-এর মাধ্যমে প্রতিপন্ন করলেন। ফলে মানুষের মধ্যে আরোপিত ঈশ্বরত্বের যেন অবসান ঘটে গেল। এবং ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের সূচনা হল। এর সঙ্গে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত সূত্রও, মানুষের প্রবৃত্তির ভেতর বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করে আবেগ অনুভূতির অবসান ঘোষণা করে। মানুষের মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফ্রয়েড আবিষ্কার করলেন লিবিডোর বিচিত্র লীলাখেলা। সামাজিক দর্শন হিসেবে এ সময় মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ ঘটে। যদিও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মার্কসের চিন্তাসূত্রের সঙ্গে এই যুগের লেখকগণও পরিচিত হলেন। ১৯৩৭ সালে, কটন কলেজে অধ্যয়নরত জনাকয়েক ছাত্র মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন র‍্যাডিকেল ক্লাব। এবং সেই ক্লাবের মাধ্যমে বলশেভিক সাহিত্য অসমিয়া সাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে, জনাকয়েক বুদ্ধিজীবীর হাতে পড়ে। ফলত, অসমিয়া লেখকগণ সুতীব্র জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেন। এবং সাহিত্যেও তা নানা আকারে রূপ লাভ করতে থাকে। এ ধরনের বিভিন্ন প্রভাব এ যুগের গল্পসাহিত্যকে অভিনবত্ব প্রদান করেছিল।

এ যুগের লেখকগণ গল্পের ক্ষেত্রভূমে নতুন কলারীতি প্রয়োগ করার জন্য অনুপ্রেরণা পেলেন বিদেশি গল্প লেখকদের কাছ থেকেই। মোপাঁসা এবং চেখভের গল্পের সঙ্গে এ যুগের লেখকদের সবিশেষ পরিচয় ঘটল। মোপাঁসা ছিলেন সম্পূর্ণ বাস্তববাদী লেখক গুস্তভ ফ্লব্যরের শিষ্য। এবং সেজন্য তাঁর গল্পগুলোও বাস্তবের সংঘাতে হয়ে উঠেছে সমুজ্জ্বল। চরিত্রের সূক্ষ্ম মানসিক বিশ্লেষণ, মোপাঁসার গল্পের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। চেখভের গল্প-বলার ভঙ্গিও ছিল অত্যন্ত মনোরম। কাহিনির চমৎকারিত্বের পরিবর্তে চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে তাঁর সমগ্র অন্তকরণ নিবেদিত ছিল। এই দুজন প্রখ্যাত লেখকের গল্প-রচনার শৈলী এ কালের গল্প লেখকদের অধিক প্রভান্বিত করে।

এই লেখকদের ওপর সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারার প্রভাব স্পষ্ট, যদিও পূর্ববর্তী লেখক বিশেষ করে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার প্রভাব চোখে পড়ার মতো। মহীচন্দ্র বরার মতো, এ যুগের লেখকগণ, বেজবরুয়ার ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করার প্রয়াস করেন। সমাজ সমালোচনার ধারণাটি এ যুগের লেখকগণ পূর্বযুগের আদর্শ হিসেবে যেন জীবন্ত করে রাখলেন। তথাপি বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ভাষা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে 'আবাহন' যুগের লেখকগণ 'জোনাকি' যুগ থেকে যে একধাপ এগিয়ে এসেছেন সে-কথা স্বীকার করতেই হবে।

অসমিয়া গল্পসাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগটি হল 'রামধেনু'র যুগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এ যুগের পত্তন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্বের সাহিত্য-শিল্প জগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের প্রবল ঘুর্ণাবর্ত মানুষের প্রচলিত মূল্যবোধকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। অর্থনৈতিক সংকট ও মানবীয় নৃশংসতা মানুষের মনে জন্ম দেয় বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা। যুদ্ধ-শেষে কোনো ইতিবাচক মানসদৃষ্টির অভিক্ষেপের সন্ধান দুরূহ হয়ে ওঠে। বিমুখ বর্তমান এবং শূন্যগর্ভ ভবিষ্যের দিকে তাকিয়ে লোকে পঙ্গুর অসহায়ত্ব অনুভব করল। ফলে এ কালের জনমানসের প্রতিচ্ছবিবাহী সাহিত্যে, কতক পরিমাণে নৈরাশ্য, হতাশা, আর অনিকেত ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। যুদ্ধ পরবর্তী কালে সাহিত্যে প্রসারিত হল একটি জটিল দৃষ্টিভঙ্গি। যুদ্ধ মানুষের বিশ্বাস এবং আশার বেদী ভেঙে চুরমার করে ফেলে, তার দানবীয় শক্তির প্রকোপে। মানবতার পতনে মানুষের মনে জন্ম হল প্রবল নৈরাশ্য আর কারুণ্য। প্রেমপ্রীতিস্নেহভালোবাসা ইত্যাদির মতো চিরন্তন হৃদয়বৃত্তিকে তা নিঃশেষ করে দিল একেবারে। রোমান্টিক কল্পনা হারিয়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃতি আগের মতো আর মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না। উদার মানবপ্রেমের আদর্শ মানুষকে উদবোধিত করতে পারছে না। নানা বৈজ্ঞানিক সামাজিক মতবাদ ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে, শান্ত জীবন উচ্ছল হয়ে উঠলো। চিরন্তন প্রাচীন ভাবধারা, মূল্যবোধ ইত্যাদি অসার বলে প্রতিপন্ন হল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক সমতার জন্য যে শ্রেণিদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, তাতে মার্কসীয় চিন্তার বিকাশ নতুন গতি লাভ করল। শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্নে ব্যাকুল সাহিত্যিকগণ মার্কসীয় মার্গে যেন তার সন্ধান পেয়ে গেলেন। এবং তাকেই মানবমুক্তির পথ বলে নির্ণয় করলেন। এটা সম্পূর্ণ মানবসত্তারই সুভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথে আশার সঞ্চার করল। তদুপরি তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ সহযোগে সমাজের সামনে আগত সমস্যারাজি সমাধানের ইঙ্গিতও সূচিত করল। এ দুয়ের প্রভাবে সাহিত্য আশাবাদী ও বাস্তবমুখী হয়ে উঠলো। এমন সময়ে অন্য আরও একটি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এবং তা হল ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের প্রভাব। এই তত্ত্বের আলোকে মানুষের মনের নির্জ্জন স্তরে গিয়ে লেখকগণ নানা ধরনের রহস্যের লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করলেন। এর ফলে মানবিক আচরণের সকল রহস্যই প্রকাশিত হল এবং পূর্বেকার পাপবোধ ও নিষিদ্ধ চেতনাকেও সাহিত্যিকগণ সহজ ভাবে স্বীকৃতি দিলেন। মানবীয় দোষত্রুটি, কামনা বাসনার প্রতি, উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হল। সাহিত্যের কলারীতিকে এই তত্ত্ব

বিশেষ রূপে প্রভাবিত করল। এ সবের সঙ্গে অপর একটি প্রভাব এলো, সার্ত্রের অস্তিবাদী চিন্তাপ্রসূত। ব্যক্তিসত্তার মূল্যবোধকে জাগ্রত করে তোলাই ছিল এই তত্ত্বের মূল কথা। এইসব বিভিন্ন চিন্তার সুসমন্বয়ে যুদ্ধোত্তর যুগের সাহিত্য নানা জটিলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যুদ্ধোত্তর কালে অসমিয়া জীবনধারায় আশ্চর্যরকম পরিবর্তন সাধিত হল। অসমেও যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছিল। যুদ্ধের বাজার নতুন রূপে ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি করল। যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করল, শুধু অর্থনৈতিক কারণে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জেও রাজনৈতিক চিন্তার প্রসার বাড়তে লাগল। সর্বসাধারণ মানুষের জীবনেও রাজনৈতিক সংঘাত অনুভূত হল। শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে মার্কসীয় চিন্তার পঠন-পাঠন শুরু হলে সমাজ তথা ব্যক্তিজীবন, তাঁদের কাছে নতুন তাৎপর্যে ধরা দিল।

এইসব প্রভাবের ফলেই সাহিত্য থেকে পূর্বেকার যুগের রোমান্টিক কল্পনা, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি অন্তর্হিত হতে আরম্ভ করে। ভাববাদের পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্য বাস্তবতার পথে পদসঞ্চার ঘোষণা করে। খেটে-খাওয়া মানুষের সুখদুখের দীর্ঘশ্বাসে সাহিত্য জনজীবনের কাছাকাছি আশার উপক্রম করে। এ ছাড়া বহির্ঘটনাকে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের আলেকে যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে, সচেষ্ট হয়ে পড়ায় মানুষের মনোজাগতিক সত্তার আভাস সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই সময়ে অসমিয়া গল্পে সাহিত্যিক-ভঙ্গির রূপান্তরের ছাপ স্পষ্টতা পেল। আগেকার গল্প-লেখকদের গল্পে মানবতাবাদ এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের সুন্দর বিকাশ ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই মানবতাবাদের ধারা সাম্প্রতিক কালের গল্পের একমাত্র উপজীব্য নয়। আধ্যাত্মিকতার প্রখর উপলব্ধির যোগেও তা ভাস্বর নয়। এর পরিবর্তে বাস্তববাদী লেখকদের গল্পে গা করে উঠেছে, মার্কসবাদী দর্শনের আলোয় মানবমুক্তির চেতনা। অস্তিবাদী চিন্তার প্রভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করতে গিয়ে দু-একজন গল্পকারও দেখা গেছে সমাজচিন্তার দ্বারাই বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এ যুগের গল্পে দুটি রীতি দেখা যায়। একটা হল পরম্পরাগত অন্যটি পরীক্ষামূলক। প্রথম রীতির গল্পকাররা সাধারণত একটা সংগঠিত কাহিনি নিয়ে, উৎকণ্ঠা সৃষ্টির মাধ্যমে, সেই কাহিনির পরিসমাপ্তি করেন। অন্যদিকে পরীক্ষামূলক গল্প লেখকগণ একটা সুগঠিত কাহিনির মাধ্যমে গল্প লেখার পরিবর্তে, ভিন্ন শৈলীতে কোনো একটা বিশেষ মুড বা পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে জীবনের এক-একটি সত্য উদ্ভাসিত করে তোলেন। পরম্পরাগত লেখকদের চেয়ে এঁদের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা। অসমে এই শ্রেণির গল্পকার নিতান্তই সামান্য, যদিও দু-একজন লেখক এই শৈলীতে

গল্প লেখা শুরু করেছেন। এ সময়ের গল্পসমূহের আঙ্গিকে ফ্ল্যাশব্যাক, চেতনাস্রোত পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রতীক, চিত্রকল্পের সুব্যবহার, এবং অবিভাজ্য সময়ের ভিত্তিতে কাহিনিকে উপস্থাপনের মাধ্যমে নতুনত্ব আনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

যুদ্ধোত্তর যুগের গল্প লেখকদের মুখ্য পত্রিকা ছিল 'রামধেনু'। যদিও রামধেনু প্রকাশের পূর্বে দু-একজন গল্পকার নিজেদের গাল্পিক-প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন মূলত 'জয়ন্তী', 'বাঁহী', ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে। রামধেনু প্রকাশের পূর্বে গল্পগুলো তেমন খটমটো ছিল না। জয়ন্তী পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত কেবল দু-একটি গল্পই উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সময়ের গল্পের শৈলীতে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষাও দেখা যায় না। অবশ্য এ সময় অনুশীলন-ব্রতী দু-একজন গল্পকার পরবর্তী রামধেনু যুগে নিজেদের গাল্পিক-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হন। আর তেমনই একজন লেখক হলেন সৈয়দ আবদুল মালিক।

জীবনের সংঘাতকে বিন্দুবন্ধ করে তোলা এবং তার অতলতায় ডুবে গিয়ে অনন্ত জীবনের স্বাদ পরিব্যাপ্ত করাই গল্পকারের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই বিশ্লেষণধর্মিতার পরিবর্তে তা সংক্ষিপ্ত, এবং এই একই কারণে ছোটগল্প ইঙ্গিতধর্মী। সুতরাং উপন্যাসের অব্যবহিত পরবর্তী হয়েও ছোটগল্প উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করেছে এবং অধিক নিকটবর্তী হয়েছে নাটকের। অন্য সাহিত্যিক-রূপের উপাদান এখানে ঢুকে গেলেও ছোটগল্প আধুনিক যুগসন্ধিতে তার একক এবং অনন্য অবয়ব গড়ে তুলেছে। আধুনিক চিন্তা জগতের সকল বৈশিষ্ট্য একাত্ম করে ভাব এবং আকৃতিতে সম্পূর্ণ নিজস্বতা প্রদর্শন করেছে। আধুনিক রূপকথার রোমাঞ্চ, ভৌতিক তথা অতিপ্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই সবকিছুকে আত্মসাৎ করে লেখকের স্বকীয় ভঙ্গি গল্পকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প করে তুলেছে। লেখকের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, তা থেকে প্রতীতি আহরণ, প্রকাশোপকরণ এবং তাঁর সিদ্ধান্ত এই সবকিছু মিলে গড়ে ওঠে লেখকের নিজস্ব স্টাইল।

সাম্প্রতিক অসমিয়া গল্পের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। নতুন জীবনচেতনাকে নিজস্ব স্টাইলে সন্নিহিত করে ও গল্পকে শিল্পে রূপান্তরিত করে এর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ইন্ধন জুগিয়েছেন, সাম্প্রতিক লেখকগণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং সামাজিক চেতনাবোধ এ কালের গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য সামাজিক চেতনার নামে প্রচারধর্মী কিছু গল্প যে সৃষ্টি হয়নি সে-কথা বলা যাবে না। এইটে মনে রাখবার মতো কথা যে প্রচারধর্মিতা , অতিমাত্রায় সংস্কারকামিতা গল্পকারের প্রাথমিক উপলব্ধির পরিচায়ক মাত্র। তার মোহ ছাড়তে পারলেই তবে তা প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টিতে

রূপান্তরিত হবে। অনুরূপ ভাবে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, এবং হাস্যবোধের প্রকাশ, তথা জীবনের তরল উপলব্ধির মাধ্যমে মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম থাকে এবং এই ধর্মটি হল তাঁর শিল্প চেতনা। সেই শিল্প চেতনাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গল্পকারদের হতে হয় বিশেষ ভাবে সচেতন। কারণ প্রখ্যাত গল্পকার ফ্রাঙ্ক ওকোনার গল্পকে পরিশুদ্ধ কলা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই পরিশুদ্ধ কলা হিসেবেই গল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সেখানে থাকতে হবে শ্লেষ এবং ব্যঞ্জনার অপূর্ব সমাহার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভারেও শ্লেষের এমন অনুপম প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সাম্প্রতিক অসমিয়া গল্পের কথনরীতি মোটমুটি পরম্পরাগত। দু-একজনের গল্পেই কেবল পরীক্ষমূলক রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথম রীতির গল্পকাররা সাধারণত একটা সুগঠিত কাহিনি নিয়ে উৎকণ্ঠা সৃষ্টির মাধ্যমে সেই কাহিনির পরিসমাপ্তি করেন। এই ধরনের গল্পগুলিতে সাধারণত সমাজের প্রচলিত দুর্নীতি, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এই গল্পগুলিতে সাধারণত বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশও দেখি। দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পে আছে কাহিনির পরিবর্তে আঙ্গিক সর্বস্বতা, কোনো একটা আদর্শ বা চিন্তাকে বিমূর্ত রূপে এই গল্পকারগণ প্রকাশ করেন। দেবব্রত দাস, নগেন শইকিয়া, অপূর্ব শর্মা, প্রভৃতি গল্পকার নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অসমিয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। সংস্কারের চেতনা থাকলেও নবীন শর্মার গল্পে নতুন আঙ্গিকের সমাবেশ ঘটেছে। কুল শইকিয়া ছোটগল্পের নানা শৈলী আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যঞ্জনা শ্লেষ আদির সাহায্যে গল্পকার নতুন নতুন উদ্ভাবন রীতির সঞ্চার করেন। অতি কমসংখ্যক গল্প লিখেও নিজের গাল্পিক প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন গল্পকার যতীন্দ্রকুমার বরগোহাঞি। ব্যক্তি মনের বিচিত্র ভাবানুভূতি তিনি সার্থকভাবে রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সমস্যাগুলিকেও শিল্পসম্মত রূপে পরীক্ষা করেছেন। অরূপ নাথের গল্প পরম্পরাগত। সেখানে সংস্কার এবং মানবতাবাদী চিন্তা প্রোজ্জ্বল। পরমানন্দ রাজবংশীর গল্পে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটি হল লোকজীবনের উপকথা, কথকতা ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করে, তাকে শিল্পরূপ দেবার মতো ক্ষমতা। বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের গল্পে সংস্কারের চেতনা এতটাই প্রোজ্জ্বল যে তা গল্পের ক্ষতিসাধন করে। বিমলকুমার হাজরিকার গল্প বলার ভঙ্গি সুন্দর। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা-যুগের উত্তর অধুনিক চিন্তা তাঁর গল্পে সম্প্রসারিত হযছে। বিতোপন বরবরার গল্পেও এমনই উত্তর আধুনিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। তাঁর গল্পের কথনরীতি অনন্য। আধুনিক জীবনচেতনার বিভন্ন দিক প্রকটিত হয়েছে জ্যোতিষ শিকদার, অরূপা পটঙিয়া কলিতা, অনুরাধা শর্মা পূজারি প্রভৃতির গল্পে। ঠিক তেমনি অভিজাত পরিবারের ভেতরকার

নানা চিত্র মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন।

প্রবীণ কয়েকজন গল্পকার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গল্পে নতুন চিন্তার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তেমনই একজন গল্পকার হলেন রংবং তেরাং। তাঁর গল্পে উত্তর আধুনিক চিন্তার বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। বিশেষ করে প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সৃষ্ট পরিবেশ প্রদূষণের সমস্যাটি তিনি গল্পে পরীক্ষা করে দেখেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লক্ষ্মীনন্দন বরা তাঁর গল্পে নব্যচিন্তার সূচনা করেছেন। রিজু হাজরিকার গল্পের হাস্যব্যঙ্গ নতুনমাত্রা লাভ করেছে, নব্য সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে। খুব কম গল্প লেখেন দিলীপ চন্দন। তাঁর গল্পে সমসাময়িক জীবন চেতনা কলা-সুষমামণ্ডিত রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রণবপ্রাণ ভট্টাচার্যের গল্পে, হাস্যকৌতুককে রুচিশীলতার মাঝখানে টেনে আনার অবকাশ আছে। অভিজিৎ শর্মা বরুয়ার গল্প কলাগত দিক থেকে মনোযোগের দাবি রাখে।

অসমিয়া গল্পের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করছে এমনই, বেজবরুয়া থেকে সাম্প্রতিক যুগের গল্পকারদের গল্প এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক কাল বলতে বিশ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকের গল্পকারদের পরে আমরা যেতে চাইনি। যদিও উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের কথা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। অসুবিধাবশত বহু গল্পকারের গল্প সংকলনে সন্নিবিষ্ট হয়নি, তা লেখকদের অসমর্থতা নয়, অসমর্থতা সম্পাদনার। গল্প সংকলন সম্পাদনার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সম্পাদনা কার্যে সম্পাদক তথা অসম সাহিত্য সভার প্রধান সম্পাদক ড. পরমানন্দ রাজবংশীর প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। তাঁর পরিকল্পনা এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলন প্রকাশ পেত না। এ অবকাশে অসম সাহিত্য সভা এবং প্রধান সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানাই।

।। ভাষাবদল : মিহির মজুমদার ।।

পরাগ কুমার ভট্টাচার্য
মুখ্য সম্পাদক
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নির্বাচিত অসমিয়া গল্প

ভদরী

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

প্রথম অধ্যায়

'ওই ভাত নিয়ে আয়। শুনছিস, ভাত নিয়ে আয়'। এই বলে লাঙলটি উঠোনে রেখে হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে রাখা ভেজা ধুতি পাল্টে রান্নাঘরের সামনে এসে দেখল ভাত তখনও ফুটছে। কাটা সবজিগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়— মলিন ও কালো হয়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ ঢেঁকিশাকের মুঠো কেটেকুটে রাখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ধোয়া হয়নি। এক টুকরো কলাপাতার ওপর একটি মৃত পাখি কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথা থ্যাতলানো, মাটিমাখা কয়েকটি কই মাছ ভাং খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটানো ভস্মমাখা ফকিরের মতো মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। ওদিকে ভাতের হাঁড়ির তলায় কাঁচা ভেজা খড়ি তাড়াহুড়ো করে গুঁজে দিয়ে ভদরি কামারের হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস করে ফু দিচ্ছে কিন্তু খড়ি শুকনোই হচ্ছে না, আগুন জ্বলছে না, উল্টে সোঁ সোঁ শব্দে ভেজা খড়ির গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আপাদমস্তক ক্রুদ্ধ শিশুরামের ক্রোধ মাথার চুলের ডগায় গিয়ে পৌঁছলো। বেশকিছু কারণে আজ সকাল থেকেই শিশুরাম রাগে আগুন হয়ে ছিল। ভরদুপুরে হাল বেয়ে এসে ভাত না-পাওয়ায় সেই আগুনে যেন কেউ ঘি ঢেলে দিল। প্রথম কারণ, আগের দিন শিশুরাম উপোস করে ছিল এবং কৃষ্ণ একাদশী থাকায় জমিতে হালও বাইতে পারেনি। দ্বিতীয় কারণ, একাদশী করে নেতিয়ে পড়া মহিলাদের মতো শিশুরামের বলদ দুটো সকাল থেকেই কাজে বেগড়বাই করছিল ফলে শিশুরাম অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সব কিছু যদি বিশদভাবে বলা যায় তাহলে বলতে হয়, কাজের সময় গাফিলতি করে জোয়াল কাঁধে শুয়ে পড়লে বলদ দুটোকে দোষারোপ করাই যায়। তা ছাড়া হিন্দু হয়েও হিন্দুদের পূজ্য গোজাতির প্রতি অহিন্দুসুলভ বাক্য প্রয়োগের জন্য বলদ দুটির মালিককেও দোষী সাব্যস্ত করা যায়। কিন্তু লোকে যা-ই বলুক না কেন আমরা কিন্তু কুচক্কুরে লোক নই। কারও পেছনে লেগে, একাদশীর উপোস করে বুকে পিঠে একাকার শিশুরামকে আর উপবাসে

রাখা আমাদের ইচ্ছে নয়। আর বলদজোড়ার প্রতি ভদরির শ্যাওলার মতো সেঁটে থাকার সু-অভিমতও ঘষে-মেজে তুলে দেবার অভিলাষ আমাদের নেই। তৃতীয় কারণটিও এখানে আগেভাগে বলে রাখাই ভালো, নইলে ভদরি-শিশুরামের এই উপাখ্যানটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেমন মাঠে কাজ করার সময়ই জমির সীমা লঙ্ঘন করার জন্য বেথাই বহুয়ায় সঙ্গে সেই ভোরবেলায় শিশুরামের তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল। তর্কাতর্কি অনেকটা ঘিয়ে ভাজা লুচির মতো ফুলে-ফেঁপে উঠছিল। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে বেথাই বহুয়া খোঁচা মেরে ফুলে ওটা লুচিটিকে চুপসে দিয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। তা বলে ভাববেন না এই বিবাদ শেষ হল বরং তা একই রইল। বিচিত্র এই পৃথিবীতে পূর্বাপর প্রচলিত একটি নিয়ম আছে যে, যখনই পুরুষের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেখানে সেই ক্রোধকে কোনো সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রশমিত করতে না-পারলে বাড়ি ফিরে সেই ক্রোধ সত্য-মিথ্যায় সাজিয়ে স্ত্রীর ওপর ফলিয়ে নিজের পৌরুষের পরিচয় দিতে হয়। আমাদের সংসারী শিশুরামও এই নিয়মের বাইরে নয়। এর আগেও সে একদিন কুখ্যাত বেথাই বহুয়ার পাল্লায় পড়ে অপদস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে। আর এসেই, গোয়াল ঘরে কেন মশা তাড়ানোর ধোঁয়া দেয়া হয়নি সেই বাহানায় ঘরে ঢুকেই ভদরি বেচারির পিঠে উত্তম মধ্যম সেধেছিল। সে কথাও আমরা জানি।

স্বামীর এ ধরনের উগ্র পৌরুষের অর্থ ভদরিও ভালো করে জানে বলেই কোনো রা-শব্দ না-করে মাতা বসুমতীর মতো পিঠ পেতে স্বামীর এ ধরনের অত্যাচার সর্বদা সহ্য করে। বস্তুত ভদরির এমন বিশ্বাস জন্মেছিল যে চড়-ঘুষি-লাথি আর চ্যালাকাঠ ও ঢেঁকির মুশলের প্রহার হচ্ছে সংসারে ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়ার মতোই বৈবাহিক জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু প্রতিটি বিষয়েরই একটি যুক্তিসঙ্গত সীমা থাকে— কিল-চড়-লাথিও অসীম ঈশ্বরের মতো অসীম একটি পদার্থ নয়। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা বসুমতীরও বাঁধ ভাঙে, ভূমিকম্প দেখা দেয়। আমাদের ধৈর্যশীলা ভদরির রক্তমাংসের শরীরও কখনো অসহ্য মনে হলে বিরক্ত হয়ে খেদ প্রকাশ করাটা এমন কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। কাঁচা খড়ির আগুনে ফু দিতে-দিতে নাকের জল আর চোখের জল এক হয়ে দুর্ভাগ্যবশত আজ ভদরি একটি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ক্ষোভ প্রকাশ করল।

শিশুরাম— 'ওই, অমুকের ঝি, তিন প্রহর কেটে গেল এখনো ভাত রান্না হল না কেন?' ভদরি — 'আমার মাথা দিয়ে ভাত রেঁধে দেব? একগাছি খড়ি নেই। কাঁচা-ভেজা খড়ি ফু দিতেই হয়রান হয়ে গেলাম। না- বুঝে না- শুনে শুধু দপদপিয়ে

বেড়ালেই চলে?'

'মাগি, কীইইই বললি?' এই বলে জমদগ্নি শিশুরাম মাটি থেকে কই মাছের রক্তমাখা বঁটিখানা নিয়ে ভদরির পিঠে পরপর দু-কোপ বসাল। তৃতীয় কোপ বসাবার আগেই ভদরির চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে শিশুরামের দূর সম্পর্কের ভাই কিনারাম। পেছন থেকে 'আরে আরেএএএ দাদা কর কী কর কী!' বলে শিশুরামকে জাপটে ধরে। থাবা মেরে হাত থেকে রক্তমাখা দা-খানা কেড়ে নেয়। আর ভদরি রক্তে ভেসে এলিয়ে পড়ে থাকে, দলা পাকিয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাসপাতালে একটানা তিন দিন থাকার পর জ্ঞান ফিরে পেল ভদরি। জ্ঞান ফিরে পেয়েই প্রথমে পাশে দণ্ডায়মান ড্রেসারকে জিগ্যেস করল — 'উনি কোথায় গেলেন?'

ড্রেসার — 'কৌন উনি'?

ভদরি — (সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে) 'আমাদের উনি। আমার স্বামী।'

ড্রেসার — 'ও আদমি হাজোতমে আছে।'

ভদরি— 'দয়া করে ওকে ডেকে পাঠান।'

ড্রেসার — 'ক্যা ডেকে পাঠাও, ও আদমি আভি আসিতে না পারবে। উসকো তো হাজত মে দিয়াছে। আচ্ছা তুমি রহ এখন। তোমার আদমিকা বাত তুমি আভি নাহি ভাববে। ও বাত আভি ভাবিলে হামি জানিছে তোমার অসুখ বেশি হবে!'

হাসপাতালের ড্রেসারের কথা শুনে ভদরি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এমন সময়ই বড়ো ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। কম্পাউন্ডারের মুখে রোগীর সকল বৃত্তান্ত শুনে শিশুরামকে হাজত থেকে এনে রোগীর সামনে দাঁড় না-করালে সে যে আরোগ্য হবে না তা বুঝে তক্ষুনি তিনি তার ব্যবস্থা করলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এইবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে ভদরি দেখল তার বিছনার পাশে দুটি লাল পাগড়ি পরা কনস্টেবলের মাঝখানে শিশুরাম দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ডাক্তার সাহেব।

ভদরি — (শিশুরামের দিকে তাকিয়ে) 'তোমার শরীর কেমন আছে? আজ

ভাত খেয়েছ ? তোমার ভাত-টাত খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?'

উত্তরের বদলে শিশুরামের দুচোখে জলের ধারা নেমে গড়িয়ে পড়ল।

ভদরি— (ডাক্তরের দিকে তাকিয়ে, হাতজোড় করে) 'হে ঈশ্বর! হে ধর্মাবতার! ওঁর কোনো দোষ নেই, ওঁকে ছেড়ে দিন। তোমার মেয়ে সকাতরে তোমার কাছে প্রার্থনা করছে, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। মাছ কাটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ধারালো বঁটির ওপর পড়ে গিয়ে এই দাসীর শরীর কেটেছে।'

ভদরির সকরুণ বিলাপ শুনে ডাক্তার, ড্রেসার, কনেস্টবল সবাই অবাক। শিশুরামও আর সহ্য করতে না-পেরে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল — 'না হুজুর আমিই ওকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছি, আমাকে ফাঁসি দিন হুজুর। ধর্মাবতার আমি মহাপাপী; আমি এ হেন এক নারীর শরীরে অস্ত্রাঘাত করেছি!'

উপসংহার

অল্পদিনের মধ্যেই ভদরি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও স্বামীকে নির্দোষ প্রমাণ করে আইনের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারল না। শিশুরামের তিন মাস কারাদণ্ডের হুকুম হল। শিশুরাম হাসতে-হাসতে শ্রীঘরে প্রবেশ করল আর ভদরি শোকার্ত হৃদয়ে নিজের ঘরে গেল। এখানেই আমাদের সংক্ষিপ্ত কাহিনিটি সমাপ্ত।

।। অনুবাদ : তিমির দে।।

ভাঙন

সৈয়দ আব্দুল মালিক

মানুষ মরছে। ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হচ্ছে, নির্বিকার। বুড়ো মরছে। বুড়ি মরছে। যুবক-যুবতী মরছে। কিশোর-কিশোরী মরছে। কোলের শিশু মরছে। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে মানুষ মরার উৎসব চলেছে। কান্নাকাটি করার কেউ নেই। চোখের জল কবেই শুকিয়ে গেছে। শুকনো চোখ চিকচিক করছে। কান্না আসছে না, মানুষ মরছে।

যারা জীবন্মৃত, তারা মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। নদীপাড়ে কবর খনন করে পুঁতে দেবার লোক নেই। যে-পোশাক পরে মরল, সেই ময়লা-ছেঁড়া পোশাক বদল করে, নতুন কফনের কাপড় পরাবার কাপড় নেই। কাপড় কেনার পয়সা নেই। মানুষ মরছে।

নিজের এক বছরের মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে পথের ধারে বসে আছে জমীলা। কাঁদবে যে, শরীরে সেই শক্তি নেই। বাচ্চাটা গতরাতে মরেছে। ওর স্বামীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে লুইতের (ব্রহ্মপুত্রের) খরস্রোত। সে একলাটি নয়, মৃত শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে এখনও তার কোলে শুয়ে আছে। জমীলা পথিকদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কাউকে কিছু বলার শক্তি নেই শরীরে। তা ছাড়া তার দিকে তাকাবার ফুরসতও নেই কারো। কোণে শায়িত মৃত শিশুটির দিকে তাকাবার সময় নেই কারো। মানুষ সেই রাস্তায় যাতায়ত করছে।

রাস্তার কিনারে বসে আছে জমীলা। ভাত-চাল ভিক্ষে করার জন্য নয়। সে শুধু চাইছে তার মৃত শিশুপুত্রের জন্য এক মিটার সাদা কফনের কাপড়। জীবিতকালে জমীলা তার ছেলেটার জন্মের কয়েকমাস পর একটা নতুন ফতুয়া কিনে পরিয়েছিল। ছেলেটা সেই ফতুয়াটাই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরেছে। এখন সে মরল। মায়ের কোলে সে শুয়ে আছে। এখন তার নতুন জামার দরকার নেই। দরকার অব্যবহৃত আনকোরা দু'হাত লম্বা সাদা রঙের সুতোর-কাপড়। কফনের কাপড়। সেটা পরে সে চুপচাপ কবরের নিচে শুয়ে থাকবে। সেই পোশাকই শেষ পোশাক।

দু'হাত লম্বা কফনের কাপড় দেওয়ার ক্ষমতা নেই জমীলার। তাই রাস্তার পাশে

বসে ভিক্ষে চাইছে তার কোলের মৃত শিশুটির জন্য, একখণ্ড কফনের কাপড়। কাপড়ের দাম।

মানুষ আসছে। যাচ্ছে। মানুষ মরছে।

বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

নদীর ভাঙন চলছে। পাড় ভাঙছে।

এক মাইল দূরে চলছে সর্বভারতীয় ধর্মসভার শামিয়ানা টাঙানোর হুলস্থূল। সারা দেশের ধর্মপ্রাণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসছেন। চতুর্দিকে ব্যস্ততা, উন্মাদনা।

মৌলানা-মৌলবী সাহেবদের কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি ঝুলে আছে। তাদের গায়ের পোশাক লম্বালম্বি নিচ পর্যন্ত প্রসারিত। এক একজন মৌলানা-মৌলবীর শরীরে আছে পায়জামা, কুর্তা, আচকান, সিরওয়ানি, চোগা সেদরিয়ার — বাতাসে উড়ছে, রাজপোশাক। একজনের শরীরে চেপেছে তিনজনের পরার মতো কাপড়। দামি কাপড়ের জামা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে জমকালো জোব্বা।

জমীলা পথের পাশে বসে আছে তার কোলের মরা-ছেলের জন্য দুহাতি একটুকরো কাপড়ের আশায়— ভিখারিণী হয়ে। ব্রহ্মপুত্রের দুই পাড়, ঘোলাজল — যেন ব্রহ্মপুত্র নয়, ওই পাড় ঠিক ঠাহর হয় না। মনে হয় যেন এক অচেনা সাগর। ব্রহ্মপুত্রের বুকে সফেন বুদ্বুদ, ভরা বর্ষার খরস্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে।

জল, জল এবং শুধু জল। সেই জলের সঙ্গে, সেই জলের বুকে হারিয়ে গেছে লাহরিঘাট— গাছপালা, মানুষ, গরু-ছাগলে পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত একটি গ্রাম। মাটির ওপরে বিদ্যমান গ্রামখানিকে নদী বুকে করে কোথায় নিয়ে পুঁতে রেখেছে, তা কেউ জানে না। লুইতের ভরা স্রোত খসিয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে গেল লাহরিঘাটের গ্রামখানাকে।

এখন আছে জল, কোল ভরা নদীর জলের পাগলপারা স্রোত। জমীলার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কাঁদলেও সেই চোখ দিয়ে জল বেরোয় না, বেরোয় বুকপোড়া তপ্ত ধোঁয়ার দীর্ঘশ্বাস! তার পেটে খিদের আগুন। তার চোখে দুঃখের পোড়া অঙ্গার।

ব্রহ্মপুত্রের (লুইতের) বুকে জল। প্রবল বন্যা এসে নদীপাড়ের বেশ কয়েক মাইল জুড়ে বসবাসকারী জীবিত মানুষকে, গরু-ছাগল, হাঁস-কবুতর পরিপূর্ণ প্রাণচঞ্চল গ্রামখানিকে, গিলে ফেলেছে। এর আগে, কোনো কোনো বর্ষায় নদীতে ভাঙন হয়েছে। খহনিয়া, অর্থাৎ নদী ভাঙন আরম্ভ হলে নদীপাড়ের মানুষেরা ছেলেমেয়ে, গরু-ছাগল, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নদীপাড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেত। মাটি-বালি ধসে যায়, গাছপালা উপড়ে পড়ে, কোথাও বা দুচারটে গরু-মোষ ভেসে যায়। মানুষ তখন নিজেকে বাঁচায়। নিজের সন্তান-সন্ততি বাঁচায়। কিন্তু এইবার সেটা সম্ভব হল

না। প্রবল বন্যায় লাহরিঘাট গ্রামটিকে নিশ্চিহ্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, গৃহপালিত পশু ভাসিয়ে নিয়ে গেল, এবং সেই বন্যায় ভেসে গেল গোটা গ্রামের সঙ্গে যতসব ধানের গোলা।

ধানের গোলা রক্ষা করতে না-পারলে মানুষ রক্ষা পায় না। মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, জীবিত থাকতে হলে ভাত চাই। ভাতের জন্য চাই ধান। ধানের জন্য কৃষিজমি। চাই ধান রাখার গোলা। নিজেদের গোলা না-থাকলে, ধান রাখার ভাঁড়ার বা গোলাঘর না-থাকলে, গ্রামের মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। গ্রাম ছেড়ে, ভাত মেগে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গ্রামে-নগরে ঘুরতে হয় তখন। যেখানে ভাত আছে, সেটাই নিজের গ্রাম, নিজের দেশ।

জমীলাদের গ্রামে বন্যার ধাক্কায়, নদীপাড়ে নেমেছিল ধস। পাড় ভাঙতে-ভাঙতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গ্রামখানি। ঘরবাড়ি ভেসে গেল। গোলা, গরুঘর ভেসে গেল। জমীলা, এক সন্তানের জননী, যুবতী জমীলার স্বামী করম আলীকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাদের নদীপাড়ের ঝুপড়ি বস্তি ধসে যাওয়ার সময় শিশুটিকে নিয়ে জমীলা অন্য কোথাও ছিল। সে যখন ফিরে এল, তখন তাদের ভিটেমাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, ছিল শুধু ব্রহ্মপুত্রের মাতালা ঢেউয়ের মাতামাতি, গর্জন!

যারা গেল, গেল। যারা ভেসে যায়নি, তারা পায়ের নিচের মাটির খোঁজে নদীপাড় থেকে সরে এল। কারো কিছুই রক্ষা করা গেল না। কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে মানুষগুলি বেঁচে গেল। উপরে শূন্য আকাশ, সেখানে নদীর ধস নেই, পেটে খিদে, আর আতঙ্ক, আর কিছু নেই। চারদিকে মৃত্যুর করাল হুঙ্কার।

মানুষের মাথাগোঁজার ঘর নেই, খাবার ভাত নেই, যে-পোশাক পরণে ছিল, সেই পোশাকের বাইরে অন্য কোনো কাপড়-চোপড় নেই। রোগ থেকে পরিত্রাণের কোনো ওষুধপত্র নেই। যে-ব্রহ্মপুত্র তাদের এতদিন আশ্রয় দিয়েছিল, সেই ব্রহ্মপুত্র তাদের ভিটেমাটি, ঘরবাড়ি, গরু-মোষ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল!

মানুষ পথের ভিখিরি হয়ে গেল। পথের পাশে অন্যলোকের ঘরের বারান্দায় কেউ কেউ আশ্রয় নিল। কাউকে কাউকে নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে তা ব্রহ্মপুত্র ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারবে না।

সরকার খবর পেল। পুলিশ খবর পেল। অন্যান্য জায়গার মানুষও খবর পেল। খবরের কাগজে খবর বেরুলো, ফটো ছাপল। কিছু কিছু মানুষ স্কুলঘরে ঠাঁই পেল। কেউ কেউ জায়গা না-পেয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীধসের গ্রাসে বিপর্যস্ত মানুষগুলির ভোট পেয়ে যারা এম.এল.এ, মিনিস্টার হয়েছে, সেই রাজনীতি-করা

বিশিষ্ট লোক এসে মানুষগুলোকে দেখে গেল। দুঃখ প্রকাশ করল, সমবেদনা জানাল। সব ব্যবস্থা হবে — চিন্তা করবেন না। তারপর হেসে-হেসে সুন্দর গাড়িতে উঠে সে তার গন্তব্য পথে চলে গেল। মানুষগুলি খোলা আকাশের নীচে খালিমাটির ওপর পড়ে রইল।

ঘর নাই, নাইবা থাকল।

কাপড় নাই, না-থাকুক!

কিন্তু ভাত না-থাকলে, বেঁচে থাকার আশা থাকে না। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে খেটে-খাওয়া যায় না। বিক্রি করার মতো কারো কোনো জিনিস নেই, আছে কেবল শরীরের মেহনত, শ্রম, খাটুনির সম্বল। শহরের এদিক-সেদিক কাজের সন্ধানে যেতে হলে বাস চাই। তাদের যে বাসভাড়ার পয়সা নেহ! হেঁটে যে শহরে যাবে, পথ তো সামান্য নয়! গেলে (হেঁটে) একদিনে ঘুরে আসা মুশকিল। ওইদিকে শহরে রাত কাটাবার মতো জায়গা নেই।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে ছোট-ছোট বাচ্চাদের। ক্ষুধায় কাতর শিশুরা শুধু জল খেয়ে-খেয়ে মাটিতে শুয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এ কান সে কানে কথাটা রাষ্ট্র হল যে, ডিমাপুর না কোথায় যেন নাগা-রা ছেলেমেয়ে কিনছে। কাজ করার মতো বয়স হলে ছেলেমেয়েদের দাম পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দেয়। বয়স একটু কম হলে একশো।

লাহরিঘাটের বন্যাতাড়িত গৃহহীন ভিখিরি-প্রতিম মানুষগুলির জন্য এটা একটা সুখবর। এখানে না-খেয়ে, পড়ে-পড়ে মরার চাইতে কোথাও গিয়ে একমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকাটাই বড়ো কথা — নাগা পাহাড়, কার্বি আংলং, ডিমাপুর, হোজাই, বোকাজান, কাজিরঙা — যেখানেই হোক, যেখানে গেলে অনাহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়েরা একমুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকবে, সেখানে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর ওদের কোথাও বিক্রি করে যদি কয়েকটা টাকা পাওয়া যায়, তবে অন্য চিন্তা করারও দরকার নেই। মা-বাবা হয়ে যদি ওদের একমুঠো ভাত আর একপ্রস্থ কাপড় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেই না পারলাম, তবে ওদের খাওয়া-পরা না-দিয়ে মরার জন্য আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। বাপ-মা, পরিবার-পরিজনের স্নেহ-ভালোবাসা ওদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না, বাঁচিয়ে রাখবে একমুঠো ভাত। যেখানে ওদের একমুঠো ভাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে ওদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। যারা ওদের কিনে নিয়ে গোলামের মতো খাটাবে, ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, সেখানে আর কিছুমাত্র দেরি না-করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, সেখানে ওদের বাপেরা গিয়ে রেখে আসুক।

জমিরত, হানিফ, জুবেদ, মহবত, আকব্বর এবং অন্যান্যরা বসে আলোচনা করছিল, তাদের ছেলেদের কোথায় বিক্রি করলে ভালো হবে। যার তিন-চারটি ছেলে, তার বড় দুটি ছেলে বিক্রি করে রেখে এলে খুব একটা খারাপ লাগবে না। কিন্তু যার ছেলে একটা, তার ছেলেটিকে কোথাও বিক্রি বা ছেড়ে রেখে এলে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু সেটা না-করেও তো ওদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো উপায় নেই! অনাহারে ছেলেমেয়েদের মৃত্যু চোখের সামনে দেখার চেয়ে, ওদের দূরে পাঠানোই ভালো। যদি মরতেই হয়, তবে দূরে কোথাও গিয়ে মরুক।

একটা-দুটো করে ছেলে ডিমাপুর, ডিফু বা অন্যকোথাও বিক্রি হতে লাগল। চিৎকার-চেঁচামেচি কিছু কমল। ছেলের সংখ্যা কিছু কমল। কোথাও একমুঠো ভাত পাওয়ার পর সেখানে ভাগ বসানোর অংশীদার কমে গেল। নিজের ছেলেমেয়েরা চোখের সামনে না-খেয়ে তিল-তিল করে মরবে, সেই মৃত্যুদৃশ্য দেখা অসম্ভব। খেয়ে জীবিত থাকার চেয়ে, না-খেয়ে মরাটা বড়ো ধর্ম হতে পারে না। কোথাও গিয়ে ছেলেগুলো বেঁচে থাক। মুসলমান হয়ে, হিন্দু হয়ে, খ্রিস্টান হয়ে, যা খুশি হয়ে বেঁচে থাকুক গে! বেঁচে থাকাটাই আসল কথা। ঘর থেকে বের করে কোথাও কাউকে বেচে দেওয়া ছাড়া ওদের বাঁচিয়ে রাখার আর অন্য কোনো উপায় নেই।

আমাদের বয়স হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র তীরে অনেক দিন কায়ক্লেশে খেয়ে না-খেয়ে কোনক্রমে বেঁচে রইলাম। এখন মরলেও দুঃখ করার কিছু নেই। কিন্তু অনাহারে আমাদের ছেলেমেয়েদের মরার দৃশ্য চোখের সামনে চেয়ে চেয়ে দেখতে পারব না। এখানে আটকে রাখলে ওরা মরবে। সংবাদপত্রে খবর বেরুচ্ছে। মন্ত্রী, এম.এল.এ-রা বাণী প্রচার করছে। সমবেদনার অন্ত নেই।

মানুষ মরছে।

ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হচ্ছে।

লাহরিঘাটের নদীপাড় ভাঙছে।

অনতিদূরে বিরাট শামিয়ানার তলে সর্বভারতীয় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বক্তৃতা, ওয়াজ, গজল, কসীদা — এসব চলছে। লাউডস্পিকারে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে ধর্মপ্রাণ মৌলানা-মৌলবীদের ওজস্বী বক্তৃতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। গজল কসীদার সুরের ঝংকার। ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য মুলতুবি রাখা হচ্ছে স্বর্গবাসের সুখ— আনন্দের লোভনীয় বর্ণনা — যা হুজুর জনাব সাহেবদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে।

বাতাসে উড়ছে জনাবদের শরীরের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে জমকালো, মৃত্তিকা অবধি লম্বমান পোশাক। সেই আচকান-চাপকানের আঁতরের গন্ধ বাতাসকে করছে মাতোয়ারা।

ধর্মপ্রাণ মানুষ এসেছে বহু দূর দূর থেকে — মৌলানাদের মুখের অমৃতবাণী

শোনার জন্য। বক্তৃতা চলছে।

মানুষ মরছে।

রাজকীয় মহাভোজ! সেই রন্ধনশালার পোলাও-কোর্মার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গরম মশলার তৈরি রাজভোগের সুগন্ধ নাকে এসে লাগছে।

ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলেছে।

দিন শেষ হয়ে রাত হচ্ছে। আকাশে একফালি চাঁদ! নির্বিকার।

সারাদিনের জন্য আশে-পাশে কাজের সন্ধানে যারা গিয়েছিল, তারা ফিরছে আশ্রয় শিবিরে। দূর-দূরান্ত থেকে তারা ফিরছে, ধুঁকতে-ধুঁকতে, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে। এদিক-সেদিক তাকাবার সময় নেই। রোজগারের পয়সা দিয়ে কিনে আনা চালটুকু সেদ্ধ করে খাবে এবং মাটিতে শুয়ে থাকবে। আবার কালই যে কাজের সন্ধানে বেরুতে হবে।

তখনও মৃতপুত্র কোলে নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে জমীলা। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। কয়েকদিন তার পেটে কিচ্ছুটি পড়েনি। পথিকদের দিকে সে হাত পেতে আছে কোলের ছেলেটির কফনের এক টুকরো কাপড়ের জন্য। এক টুকরো কফনের কাপড় পেলেই সে তার ছেলের গা ঢেকে দিয়ে কবরে শুইয়ে দেবে। দুহাত সাদা কাপড় চাই।

সামনা দিয়ে মানুষ চলে যাচ্ছে। তার দিকে, বা তার কোলে শায়িত মৃত সন্তানটির দিকে কারো তাকাবার সময় নেই। ঘরে রেখে আসা বুড়ো-বুড়ি, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কারা মরল, কারা বেঁচে রইল, বলা তো যায় না! সবাই ফিরছে ছেড়ে আসা আপন মানুষগুলির কাছে।

চাঁদ আকাশের উপরের দিকে চলে এসেছে। কোলের মৃত শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে জমীলা অবশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। কোনো এক সময় সকলের অজান্তে মৃতপুত্র বুকে জড়িয়ে সে মাটিতে ঢলে পড়ল।

মা-ছেলে দুজনই রাস্তার ধারে ঘাসের উপর পড়ে রইল। শহর থেকে জন খেটে ফিরছিল লাহরিঘাটের রামনাথ। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরছিল সে। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে আসছিল। তাই পদক্ষেপ মন্থর এবং এলোমেলো হয়ে আসছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় সে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে আসছিল। হাতের ঝুলন্ত ব্যাগে ছিল কিনে আনা অল্প চাল, লবণ, আর চারহাত লম্বা একফালি কাপড়। সেটা আনছিল স্ত্রীর মেখলা এবং জামা সেলাই করে পরার জন্য। কাপড়-চোপড় না-থাকায় রামনাথের

স্ত্রী ঘরের বাইরে বেরুতে পারছিল না।

পথের ধারে কেউ পড়ে রয়েছে — দেখতে পেল সে। কাছে গেল। এক মানবী, সে হাতে জড়িয়ে ধরে আছে এক শিশু। মহিলার অনাবৃত শরীর।

একটু উবু হয়ে রামনাথ ডাকল, কে গো? রাত হয়েছে, টের পাওনি? কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আরও নিকটে এসে রামনাথ মহিলার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। শিশুটির নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল, একই ব্যাপার।

রামনাথ একটু পিছিয়ে এল। স্বগতোক্তির স্বরে বলল, মা-ছেলে দুটোই গেল! কোথাকার কে বা কে-জানে? এভাবে মরে মরে গ্রামখানি উজাড় হয়েই যাবে বুঝি! বেশ রাত হয়েছে। ওদিকে আমাদের গ্রামেই বা কার কী হয়েছে কে জানে! এভাবে এখানে পড়ে থাকলে, এদের তো শেয়াল-কুকুরে খাবে। এদের খোঁজখবর নেবার কি কেউ নেই?

এরপর জমীলা এবং তার কোলে লেপ্টে থাকা মৃত শিশুটির দিকে রামনাথ একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

দুজনই মরে শক্ত হয়ে আছে।

রামনাথ ব্যাগ থেকে সুতিকাপড়টা বের করল। জ্যোৎস্নার আলোয় সেটা চোখের সামনে মেলে ধরল। তারপর দুহাতে ভাঁজ খুলে ঢেকে দিল জমীলা এবং শিশুটির মৃতদেহ। এরপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। এবং খানিকটা থেমে, কাপড়খানিতে ঢেকে দেওয়া শবদেহ দুটোর দিকে আবারও তাকালো। এবং ধীরে ধীরে ওখান থেকে সরে এসে রাস্তায় উঠল। এখন রামনাথ নিজের ঘরের দিকে রওনা হল।

জ্যোৎস্নার আলো ফিকে হয়ে আসছিল। ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হচ্ছিল। ধর্মসভার মৌলানার ওজস্বী ভাষণ ভেসে আসছিল লাউডস্পিকারে।

মানুষ মরছিল।

রামনাথের দেওয়া কফনের কাপড়ের নিচে জমীলা শিশুপুত্র বুকে নিয়ে ঘাসের ওপর শুয়েছিল।

মধ্যরাতে, ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে ভেসে আসা অবিরত বায়ুপ্রবাহের মধ্যে ছিল শত-সহস্র জনতার বুকভাঙা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের বোবাকান্না।

ভাঙন চলছে।

।। অনুবাদ : প্রাণকৃষ্ণ কর ।।

বীভৎস বেদনা

সৈয়দ আব্দুল মালিক

একুশ দিন থাকার পরে হোটেলে চলে এলাম। আসাটাই হয়তো বা উচিত ছিল। কিন্তু সমস্ত উচিত কাজ সব সময়ে আমার দ্বারা করা হয়ে ওঠে না। টাঙ্গাওয়ালাটার আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে 'মহামায়া' হোটেলের উদ্দেশে গিয়েছিলাম। তখন রাত সাড়ে নয়টা। রেলস্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দেড় মাইল ভেতরে আর কোনো হোটেল ছিল না। দামি হোটেলে থাকা আমরা পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নগরটার প্রায় এক প্রান্তে বারটা মানুষ থাকতে পারা ছোট হোটেলটার দরজার মুখে ঘোড়ার গাড়িটাকে অপেক্ষা করতে বলে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু নিরাশ হতে হল। বর্তমানে হোটেলে সিট নেই। কয়েকদিন পরে খালি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শহরের পাশের এই হোটেলটিতে সাধারণত মাঝামাঝি আয়ের চাকরি করা বা ব্যবসা করা মানুষেরা থাকে। তারই দুজন আগামি দশ বার দিনের মধ্যে যাবার কথা আছে। তখন আমার পক্ষে সিট পাওয়া সম্ভব হতে পারে। আজ নেই। আমি বিপদে পড়েছি বলে মনে না করলেও একটু অসুবিধেতে পড়লাম। এখন এই রাত দশটার সময় আবার হোটেলের খোঁজে বেরুতে ক্লান্ত লাগছিল।

আমি বললাম — 'আমি একটা বিদেশি কোম্পানির এজেন্ট। প্রয়োজন হলে দুই তিন মাসও থাকতে হতে পারে। কিন্তু আপাতত থাকার সুবিধে না হলে —'

ম্যানেজার বুদ্ধিমান মানুষ। আমি যে অন্য দামি হোটেলে না গিয়ে এখানে কেন এসেছি তা সহজেই বুঝতে পারলেন। কিছু সময় ভেবে তিনি হোটেলের একজন সহকারিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন — 'উমাদের ওখানে এখন কোন গেস্ট রয়েছে কি?'

— 'নেই মনে হয়। আজকের চারদিকের খবর অবশ্য আমি জানি না' সহকারিটি বলল।

'এই ভদ্রলোককে সেখানে নিয়ে যা তো। আপনি এর সঙ্গে যান। এখান থেকে একটু দূরে একটি পরিবার থাকে। তাঁরা পেয়িং গেস্ট রাখেন। হয়তো আর কেউ না

থাকলে আপনি এই কয়দিন সেখানে থাকতে পারবেন। আমরা এখানে সিট খালি হলেই আমি আপনাকে আমার এখানে ডেকে নিয়ে আসব। পরিবারটা ভাল। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না।' তারপর ম্যানেজার টাঙ্গাওয়ালাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

থাকার ব্যবস্থা হল। একটা ছোট পুরনো দুমহলা বাড়ির ওপরের মহলের দক্ষিণ দিকের একটা ছোট রুমে আমি জিনিসপত্র রেখে বিছানা করলাম। এভাবে থাকার অভ্যাস আছে। আমার জীবনে যদি সবচেয়ে বেশি কোন কাজ করে থাকি, তাহলে তা হল গিয়ে হোল্ড-অল বাঁধা আর খোলা। ভ্রাম্যমান জীবনের গত সাত বছরে কতবার কত শহরে ঘুরেছি, কত অপরিচিত জায়গায় খেয়েছি, কত অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তার হিসেব ডায়েরিতে রয়েছে, মনে রাখা অসম্ভব।

বাড়িটা বেশ চুপচাপ। আমার সঙ্গে যে মহিলা কথা-বার্তা বললেন তার বাইরে আর কেউ নেই বলেই মনে হল। মাঝখানে একবার তিনি এসে বাথরুমটা দেখিয়ে গেলেন। সঙ্গে আমি কি খাব তাও জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, 'রাতে আমি রুটি খাই।' খাবার সময় তিনি মধ্যের ঘরে ডেকে নিলেন। টেবিলটাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে খাবার দিলেন — সাধারণ খাবার — চারটে রুটি, এক গ্লাস গরম দুধ, একটু শাকভাজা, ভাজা মটর, কুচি কুচি করে কেটে দেওয়া একটু পেঁয়াজ, একটা ছোট প্লেটে একটু কিসমিস, কাঁচা মুলোর টুকরো আর একটু ফুল কপি সিদ্ধ। খেতে খেতে একটু দূরে বসে মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথা থেকে এসেছি, কতদিন থাকব, মাছ মাংস খাই কি না, বাড়িতে কে কে আছে, আর কিছু লাগবে কি না।

সব প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলাম না। কেবল মাত্র সংক্ষেপে এতটুকু বললাম যে আমার ব্যবসা হল নগরে নগরে ঘুরে বেড়ানো, কোনো জায়গায় কতদিন থাকতে হবে আগে থেকে বলতে পারি না। মাছ, মাংস সব কিছুই খাই। মাঝখানে দুই-একদিন আমাকে অন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

মহিলাটি আমার সঙ্গে কথা বলতেই একটি মেয়ে একটা প্লেটে করে ডিমভাজা এনে রাখল। আমি মুখ তুলে তাকালাম। ছিট কাপড়ের কুর্তা পরা একটি চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে। দোপাট্টা নেয়নি, শরীর দেখলে ছোট্ট মেয়ে বলে মনে হয়। বিশেষ সৌজন্য না দেখিয়ে আমি মুখে একটু হাসি টেনে বললাম, 'যথেষ্ট হয়েছে, আমি আজ এর বেশি আর পারব না।' বিনয়ের সুরে মহিলাটি বললেন, 'আমরা সচরাচর যা খাই তাই দিয়েছি। আমাদের বাজার করার মতো এখন কেউ নেই, ঘরে যা ছিল তাই

দিয়েছি। কিছু মনে করবেন না।' পেয়িং গেস্ট রাখা প্রায় সমস্ত গৃহস্বামীরাই প্রথমে এই কথা বলে থাকে, তাই আমি এর মধ্যে কোনোরকম নতুনত্ব দেখতে পেলাম না। মহিলাটির মুখের দিকে তাকালাম। তার বয়স ৩৫/৩৬ হবে বলে মনে হল। মুখের গড়ন একরকম নয়। মেয়েটি মহিলাটিরই সন্তান নয় কি? তাঁদের মুখে মার্জিত উর্দু শুনে বুঝতে পারলাম, এরা কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ, হয়তো কোনো কারণে এখন আর্থিক অবস্থা পড়ে এসেছে।

বিছানায় পড়ার পর আমি আর তাদের কথা ভাবলাম না। হোটেলের ম্যানেজারটি ভাল বলে তাঁর প্রতি একটা অস্পষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করতে লাগলাম। আমার আবছা ঘুম আসছিল। আলতো করে ভেজানো দরজাটা ঠেলে মহিলাটি ভেতরে এলেন।

'কে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি' — মহিলাটি উত্তর দিলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, আপনি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবেন। খুলে রাখবেন না। রাতের বেলা নিচ থেকে যদি কোন গণ্ডগোল শোনেন তাহলে তাতে কান দেবেন না।'

'আচ্ছা' — বলে আমি বিছানায় বসলাম।

'আশেপাশে কিছু আজেবাজে লোক রয়েছে। খারাপ কিছু নয়, মদ খেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে। আপনি রাতে ভয় পাবেন বলে বলছি।' আমার মনে হল মহিলাটি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে আমি বসতে বললাম।

'না, ঠিক আছে। আপনার ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়ুন। আমি যাচ্ছি।' কিন্তু মহিলাটি চলে গেলেন না। তিনি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন — বাইরের দিকে।

'ঘরে কে কে আছে?' আমার কোনো দরকার নেই। তবু জিজ্ঞেস করে তার মুখের দিকে তাকালাম। 'কেউ নেই বলেই বলতে পারেন। মেয়েটি — পদ্মা — আছে, আর আমি, আর —'

'আর?'

'আর দীপক আছে। তার থাকা আর না থাকা সমান।' কিছুই বুঝতে না পেরে আমি মুখের দিকে তাকালাম। আমি অনুভব করলাম, মহিলাটির অনেক কথা বলার আছে, আর সে সব বলার জন্যই আমার মতো একেবারে অপরিচিত মানুষের ঘরে এই রাত বারোটার সময় চলে এসেছে।

'আপনি শুয়ে পড়ুন, বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। তার সম্পর্কে আপনি নিজেই জানতে পারবেন।' বলেই মহিলাটি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় পুনরায় বলে গেলেন আমি যেন ঘুমনোর আগে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে নিই।

তার কথামতোই আমি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে বিছানায় এলাম। ঘুমনোর আগে একবার ভাবলাম দরজাটা বন্ধ করায় কি এমন বিশেষত্ব থাকতে পারে। সেই আমার জন্য যে মেয়েটি ডিমভাজা করে এনেছিল তাকে যতই মারাত্মক মনে করা যাক না কেন, আজ প্রথম পরিচিত একজন অতিথিকে কিছু করতে সাহস করবে না। তাহলে আর কি? ঘুম এসে চোখ জুড়িয়ে দিল।

সকালবেলা দেখি, সব ঠিকই আছে। রাতে কেউ বিরক্ত করেছে বলে মনে পড়ল না। দিনের আলোতে ঘর বাড়িগুলি স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম। বড়িটা যথেষ্ট পুরনো। একটা সময়ে হয়তো বা কোন সৌখিন মানুষের বাড়ি ছিল। ঘরগুলি পুরনো যদিও পরিপাটি। মেরামতির অভাবে এখন কিছুটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। মাঝের ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ছবিগুলিতে মাকড়সার জাল, ঝুল ঘিরে রেখছে। মাঝে মধ্যে সিলিংগুলির চুন বালি খসে পড়েছে। কাঠের জিনিসগুলি নিশ্চিয় দামি ছিল, এখন রং উঠে গেছে।

সকালবেলা চা কাবার সময় মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত কোনো অসুবিধে হয়েছিল কি?'

'না তো, কোনো অসুবিধে হয়নি। আমার বেশ ভাল ঘুম হয়েছে।' ঠিক তখনই সঙ্গে আমাকে এক পেয়ালা কফি বা ওভালটিন দেবে কিনা জিজ্ঞেস করল। নমস্কার প্রত্যুত্তর দিয়ে আমি এক পেয়ালা গরম কফি আনতে বললাম। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে কাপড়ের একটা থলে নিয়ে বেরিয়ে মহিলাটি বলল 'বাজার করে আসছি। আপনি বসুন। আপনি কোথাও বেরোবেন নাকি? গেলে খেয়ে যাবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব।' মহিলাটি বেরিয়ে গেল। পদ্মা টেবিলের পাশে এমনিই দাঁড়িয়েছিল। পদ্মার মন মরা ভাব, চোখ দুটি বড় করুণ। মুখে একটা অবসাদ আর ক্লান্তির ভাব।

পিরিচ আর পেয়ালার ঠুং ঠাং শব্দের বাইরে আর কোনো শব্দ ছিল না। নীরবতাটা বড় অসহ্য হয়ে উঠছিল, দরজা জানালগুলি খোলা সত্ত্বেও সবই বন্ধ বলে মনে হচ্ছিল। পেয়ালা থেকে মুখ তুলে আমি পদ্মার মুখের দিকে তাকালাম — পদ্মা মুখ নিচু করল। তখনই আমি ডাকলাম, 'পদ্মা —'

'কি বলছেন?'

আমার বলার মতো কিছুই ছিল না।

'তোমাদের ঘরে কোন পুরুষ নেই নাকি?'

'দীপক রয়েছে —'

'দীপক কে?'

'দাদা —'

'দেখিনি তো, এখন কোথায় আছ?'

'কয়েকদিন ধরে বাড়িতে নেই, এলে দেখতে পাবেন।'

দীপক সম্পর্কে জানার খুব একটা কৌতূহল ছিল না। কোথাও দূরে হয়তো কাজ করে, মাঝে মধ্যে আসে। আমার জানার খুব একটা প্রয়োজন নেই। পদ্মার বাবা নেই, সে কথা আমাকে বলা না হলেও বুঝতে পেরেছি।

'তোমার মায়ের নাম কি?' অবাঞ্ছনীয় যদিও, কখনও প্রয়োজন হতে পারে ভেবে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'উমা —' আস্তে করে পদ্মা বলল।

'উমা, দীপক পদ্মা' — এমনিতেই নামগুলি মনে রাখার জন্য উচ্চারণ করলাম। হয়তো আমার অবস্থা দেখেই পদ্মা একবার শান্তভাবে মৃদু হাসল।

নগরের অন্য প্রান্তের একটা বড় দোকানে অর্ডার নিচ্ছিলাম। প্রথম দিনই প্রায় সতের শ টাকার অর্ডার পাওয়ায় মনে মনে বেশ আনন্দও উপভোগ করছিলাম। হয়তো এই নগরে ব্যবসা বেশ ভালেই হবে। দোকানের অন্য একটি শো কেসের পাশে কয়েকজন ভদ্রমহিলা কপড়-চোপড় আর প্রসাধনের জিনিসপত্র কিনছিলেন। দোকানের অন্যান্য মানুষের মতোই আমার চোখ সেদিকে বারবার ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। দুজন পায়জামা পরা পাঞ্জাবি ভদ্রমহিলা, দুজন ফ্রক-পরা ইউরোপীয় মহিলা আর কয়েকজন শাড়ি-পরা ভদ্রমহিলা। জিনিসপত্র দেখার অবকাশে তারা মাঝে মধ্যে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

আমি কোম্পানির মাল দেখাচ্ছিলাম — দোকানিকে। হঠাৎ দোকানের ভেতর হুলুস্থুল পড়ে গেল। ভদ্রমহিলা কয়জন ব্যতিব্যস্ত হয়ে এদিকে আশ্রয় নিল। একটা আকস্মিক কোলাহলে দোকানের মানুষগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চারপাশে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল, মুহূর্তের মধ্যেই বেশ কিছু লোকজন জমা হয়ে পড়ল। আমি আমার জিনিসগুলি গুছিয়ে নিলাম, আমার কাছে খুব একটা নতুন অভিজ্ঞতা নয়। পকেটমার অথবা চোর হবে, না হলে গুন্ডা।

একজন ইউরোপীয় মহিলা প্রায় মূর্ছিত; ক্রোধ, লজ্জা, ভয় আর অপমানে মানুষটা ক্ষেপে উঠেছেন। সঙ্গের ভদ্রমহিলারা ইস, ছিঃ ছিঃ, কি সাংঘাতিক, কি মারাত্মক এই সব বিস্ময়সূচক অব্যয়ের বন্যা বইয়ে দিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পরিস্থিতি শান্ত হল। ঘটনাটা কি ঘটেছিল জিজ্ঞেস করা হল। একজন পাঞ্জাবি ভদ্রমহিলা ক্রোধ আর সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'কোথাকার একটা গুন্ডা এসে এর কাপড় তুলে উলঙ্গ করে ফেলছিল।' আমরা মাথা নিচু করলাম, ইউরোপীয় ভদ্রমহিলাটি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন। 'মানুষটা গেল কোনদিকে?' ক্ষীণ লম্বা মানুষটা। একদম গুন্ডা। কোথা থেকে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল, আমাদের পেছনে দাঁড়াল। আমরা তো কিছুই মনে করিনি। ইস! কি হরিবল। চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল। আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

গুন্ডায় দেশটা ভরে গেছে। একটা স্বাধীন সভ্যদেশে এরকম অসভ্যতা — ইত্যাদি মন্তব্য করতে করতে মানুষগুলি চলে গেল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হলেও নিজেরে ব্যবসার চিন্তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটা ভুলে গেলাম।

বিকেলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এসেছিলাম, পদ্মাকে ডাকলাম, উমা বেরিয়ে এল। বলল, পদ্মা নেই, বেরিয়ে গেছে, একটু পরেই আসবে। আজ কত জায়গায় কত ঘুরে বেড়ালেন, নিশ্চয় আজ ব্যবসা ভাল হয়েছে। আপাতত এক গ্লাস ওভালটিনই খান — এক নাগাড়ে উমা অনেক কথা বলে ভেতরে গেল। আমার সত্যিই ক্লান্তি লাগছিল। আমি ওপর দিকে মুখ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

হয়তো পয়সার জন্য পদ্মারা এসব করছে। তবুও এর সঙ্গে হোটেলের একটা পার্থক্য রয়েছে। নারীর স্বভাবজাত সহৃদয়তা এখানে পেয়েছি। হোটেলের সমস্ত কথাই ব্যবসায়িক, এখানে ঘরোয়া। অনেকদিন পরে এরকম একটা পরিবেশ পেয়ে আমার খুব ভাল লাগল।

সেদিন রাতে কিন্তু উমা আমার সঙ্গে কথা বলতে এল না। আমিও খুশিই হলাম। ঘনিষ্ঠতা করে কোনো লাভ নেই। প্রায় এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। উমার বাড়িটা নিজেরই বাড়ি বলে মনে করতে শুরু করেছি। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধেবেলা যখন বাড়ি প্রবেশ করি উমা আর পদ্মা দুজনেই যথেষ্ট উদগ্রীব হয়ে ওঠে। খাওয়া, দাওয়াতেও বিশেষ বিরক্তি নেই। কেন জানি সব সময় উমা আর পদ্মাকেই দেখতে পাই। দীপক নেই। সত্যি সত্যিই তাদের ঘরে দীপক বলে কোনো জীবন্ত মানুষ আছে না নেই, না কি তা একটা কল্পনার সৃষ্টি তা সন্দেহ করতে ইচ্ছা করল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল বলে মনে হল। দীপক না থাকায় তো

ক্ষতি হচ্ছে না।

কিন্তু একটা কথা স্পষ্টভাবে আমার চোখে পড়ল যে —যুবতী আর সুন্দরী হলেও পদ্মা সব সময় মনমরা। কখনও ক্বচিৎ হাসলেও পদ্মার হাসিটা পৌষমাসের রোদের মতো নিস্তেজ। অন্যদিকে যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও উমা সব সময়ই প্রফুল্ল। উমা ভাল করে চুল আঁচড়ায়, লম্বা হাতের জামা পরে, সাধারণত ঘরের ভেতর যখন থাকে দোপাট্টা নেয় না। চলাফেরাও অনেকটা নিঃসঙ্কোচ। তা বলে প্রলোভন সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা করে না বলেই মনে হয়। মুখের রং শরীরের আঁটোসাটো গঠন, কথাবার্তার নিঃসঙ্কোচ সরলতা সব সময়ই উমাকে ঘরোয়া করে রাখে। পদ্মার যেন কিছু একটা রহস্য আছে, সে অত্যন্ত সংযত, সে-ও লম্বা হাতার জামা পরে, সযত্নে নিজের শরীরটা ঢেকে রাখে, কিন্তু অত্যন্ত কম কথা বলে, পেয়িং গেস্ট রাখা থেকেই বুঝতে পেরেছি ওঁদের অবস্থা সচ্ছল নয়। কিন্তু তা বলে সব সময় কেন বিষণ্ণ হয়ে থাকতে হবে তা বুঝতে পারলাম না।

বেশি বোঝার প্রয়োজন নেই। আমি দুদিনের অতিথি। সকালের দিকে খবরের কাগজটার চোখ বুলোই। খবরের কোনো বৈচিত্র্য নেই। নিরাসক্তভাবে সে সব পড়ি। উমা কখনও কখনও আমার জন্য সিনেমার পত্রিকা আনে। সে সবের ছবি দেখি। কোন বিশেষত্ব নেই, সব কিছুতেই ব্যবসায়িক চাতুরালি। অভিনয়ই যে পত্রিকার মূল কথা সেখানে সত্যের অন্বেষণ করা অবান্তর, তবু শিল্পীর কাহিনি সময় কাটানোয় সাহায্য করে।

কখনও বা উমা আমাকে জিজ্ঞেস করে, অভিনেত্রী হতে হলে কি করতে হবে। সেই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই এমনিতেই হেসে বললাম — 'অভিনেত্রী হতে হলে অভিনয় জানতে হয়।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে উমা বলল, 'তার মানে ফাঁকি দিতে হয়?' আমি থতমত খেয়ে যাই। অভিনয় করা মানে ফাঁকি দেওয়া নাকি? সে সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা খুব কম। উমাকে যথাযথ বলতে পারব না। তবুও এমনিতেই বলি — ফাঁকি দেওয়া নয়, কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার মতোই করতে হয় বোধহয়। আমি ভালভাবে জানি না।'

মনে মনে থাকার পরিবর্তে সময় কাটানোর জন্যই যে উমা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় — তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। পদ্মার নীরবতা, তার জীবন সম্পর্কে আমার মনে কৌতূহল জন্মায়। সুন্দর যুবতি মেয়েটি এত গভীর, এত নীরব হলেও তো ভাল দেখায় না। বিশেষ করে যে বাড়িতে অন্য কোনো পুরুষ নেই।

একদিন উমা কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিল। পদ্মা এসে জিজ্ঞস করেছিল আমি

কখন বেরিয়ে যাব আর কখন ফিরে আসব। আত্মীয়তা প্রকাশ করার স্পষ্ট চেষ্টায় পদ্মাকে বললাম 'বস তো পদ্মা, তুমি দেখছি আমার সামনে সব সময় নীরব হয়ে থাক।'

'বলার মতো কি-ই বা আছে?'

'এই বড়িটা কি তোমাদের নয়?'

'আমাদের? কে বলল আপোনাকে? আমরা তো এখানকার মানুষ নই।'

'এখানকার মানুষ নও? তাহলে কোথাকার?'

'পশ্চিম পাঞ্জাবের। আমরা রিফিউজি।'

'তোমরা রিফিউজি। এটা তো আমাকে আজ পর্যন্ত বলনি।'

'বললে কার লাভ হবে? আপনি তো আর রিফিউজি অফিসার নন যে আমাদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন।'

'কিন্তু তোমরা কি সাহায্য পাওনি?

'১৯৪৮ সনে এসেছি। ছয় বছর হয়েছে, পঁচিশ টাকা পেয়েছিলাম — তা দিয়েই তিনটে মানুষ আজ পর্যন্ত চলছি।' পদ্মার কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর। ওদের হয়ে বলার কেউ নেই। অসহায় রিফিউজি মহিলা সব, বেচারা।

'কিন্তু এটা তো ভাল ঘরই বলা যায়।'

'সরকার দেয়নি। উমার —'

'উমার —'

'মানে —' থতমত খেয়ে নিজেকে শোধরানোর জন্য পদ্মা বলল — মায়ের কি এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ি ছিল এটা। তাদের সবাই মারা গেছ। তখন আমরা এখানে এসে উঠেছি।

'এসব আমি জানতাম না পদ্মা, জিজ্ঞেস করেছি বলে যেন কিছু মনে কর না।' 'আপনিও আমাদের পরিচয় প্রকাশ করায় কিছু মনে করবেন না। পাকিস্তান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা হিন্দু রিফিউজি মহিলাকে কেউ পছন্দ করবে না।' আমি কিছু একটা বলতে চেয়েছিলাম। উমা এসে প্রবেশ করল। আমাদের কথা বন্ধ হল। বাজার থেকে আনা জিনিসগুলি উমা পদ্মাকে দিল। জিনিসগুলি নিয়ে পদ্মা ভেতরে চলে গেল।

'দীপক না থাকায় আপনাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে' — শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আসা উমাকে একটু সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে আমি বললাম। 'অসুবিধে কিছুটা হচ্ছে নিশ্চয়, কিন্তু কি করব, সে বাড়িতে থাকেই না। আর থাকলেও বাজার খুব কমই

করে। কিন্তু ভাবনেন না যে আপনি থাকার ফলে আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছে। আপনারই যদি আমাদের জন্য কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে...'

'আমার কোনো অসুবিধেই হয়নি। বরং এখানে হোটেল থেকে ভালই আছি।' হয়তো দীপক সাধারণ কোনো কাজ করে। জিজ্ঞেস করল উমা হয়তো অপ্রস্তুত হবে, তাই আমি দীপক সম্পর্কে কোনো বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল বলে মনে করলাম। আমি অতিথি মানুষ, দুদিন থেকে চলে যাব। মানুষের ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলানোর আমার কি প্রয়োজন।

উমারা রিফিউজি। ধর্মান্ধতার উৎপীড়নের বলি হয়ে নিজের সমস্ত কিছু হারিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের জন্য কষ্ট হয়। মনের জোরেই ওরা বেঁচে রয়েছে। কিন্তু যেখানে ওরা আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিল, সেখানে ওরা পেয়েছে অমানুষিক অবহেলা। ওদের ভাগেরটা কেড়ে অন্যোরা খেয়েছে কেউ বা আরাম করছে।

কি পরিহাস। হোটেলে যাবার কথা না ভাবলেও চলবে বলে মনে হল। আরও কিছুদিন এই শহরে থাকব। তারপর অন্য জায়গায় যাব। কিন্তু এখানে থেকে ব্যবসাটা আমার ভালই চলছে, ভাল অর্ডার পেয়েছি। কম খরচেই চলে যাচ্ছে। আর সত্যি কথা বলতে গেল পদ্মার প্রতি কেমন যেন এক মনের মধ্যে একটা কোমল অনুভূতিকে স্বীকার করা প্রয়োজন বলে অনুভব করলাম। নীরব পদ্মার মধ্যে কেমন যেন একটা অব্যক্ত মুখরতা আছে। তা নীরবে হৃদয়কে স্পর্শ করে। রিফিউজি হলেও নারী তো নারীই।

একদিন পদ্মাকে নিয়ে সিনেমা দেখত গেলাম, এই বিষয়ে পদ্মা বা উমা কারও কোনরকম সঙ্কোচ ছিল না। পদ্মা কেবল বলেছিল —'যেতে পারি, কিন্তু টিকিটের পয়সা আপনাকে দিতে হবে।'

সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারটা বেজে গেল, হুলুস্থুল নগরটাতে দুটো অপরিচিত যুবক-যুবতীকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখে কেউ কোনো মন্তব্য করলেও তা কারও কোনো ক্ষতি করে না। হাজার মন্তব্য জনকোলাহলে হারিয়ে যায়।

'এই পদ্মা —' হঠাৎ একটা কর্কশ স্বর কানে ভেসে এল। পদ্মা আর আমি উভয়েই চমকে ওঠালাম। লাইটের দুর্বল আলোতে দেখি শুকনো মুখের ক্ষীণ একটি যুবক। চুলগুলিতে জট পড়া, গায়ে একটা আধা ছেঁড়া শার্ট আর একটা পুরনো প্যান্ট।

'এত রাতে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস —?' তার স্বরটা আরো কর্কশ। তার কণ্ঠের রূঢ়তায় আমি আকস্মিক কর্তব্য সম্পর্কে একটা ক্ষিপ্ত চিন্তা করে নিলাম। তার হাতে যদি অস্ত্র না থাকে, তাহলে আমার একটা ঘুষিতে সে ছিটকে পড়বে।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে পদ্মা বলল, 'চলুন যাই।'

'হ্যাঁ, চল।' লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে আমি পদ্মাকে আড়াল করে নিয়ে এগিয়ে চললাম। যেন তার কথা শুনতেই পাই নি।

'রাতের বেলা ঘুরে বেড়াচ্ছিস। দুনিয়াকে এখনও চিনতে পারিসনি। কি আর চিনবি — সবই তো জানোয়ার।' আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। আর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মানুষের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেলাম। কিছুটা দূর চলে আসার পরে নির্ভয় হয়ে আমি পদ্মাকে বললাম, 'গুন্ডায় দেশ ভরে গেছে। রাস্তায় ভদ্রলোকদের পক্ষে বেরনো মুশকিল হয়ে পড়েছে। কি যে ডিগ্রেডেশন হয়েছে আমাদের।'

'হাতটা ছেড়ে দিন' — পদ্মা বলল। আমি যে সেই লোকটিকে দেখার পর থেকেই পদ্মার হাত ধরে রেখেছি তা ভুলেই গিয়েছিলাম। 'কিছু মনে কর না পদ্মা — আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' পদ্মার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আমি বললাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখি গুন্ডাটা কোনদিকে যেন চলে গেছে।

'পদ্মা —'

'কি?'

'কিন্তু গুন্ডাটা তোমার নাম কিভাবে জানল?'

'গুন্ডার অজানা কি আছে। হয়তো আপনর নামও জানে। এ নিয়ে ভাবতে হবে না চলুন এগিয়ে যাই।'

'কিন্তু গুন্ডাটাকে দেখে সত্যি সত্যিই আমার খুব ভয় হয়েছিল।'

'ভয়। আমি এর চেয়েও অনেক বড় গুন্ডা দেখেছি, ভয় কিসে, চলুন।' বাড়ি পৌছেও আমার মন থেকে একটা চিন্তা কিছুতেই যাচ্ছে না। সে পদ্মার নামটা কিভাবে জানল? পদ্মা তো খুব একটা বাইরে ঘোরা ফেরা করে না।

রাতে ভাত খেয়ে ওঠার পরে উমাকেও ঘটনাটার কথা বললাম। উমা কেবল একটা করুণ হাসি হাসল। কিছুটা লঘু সুরে বলল —'আমরা যে গুন্ডা দেখেছি তাদের তুলনায় — ছেড়ে দিন কার সঙ্গেই বা তুলনা দেব। রাতের বেলা পদ্মাক নিয়ে বেড়াতে যাবেন না।'

এই উপদেশ পাবার আগেই আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম যে পদ্মার সঙ্গে আমার বেরুনো এই শেষ। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার কোনো দুর্নাম হলে আমার কোম্পানির দুর্নাম হবে। চরিত্রই আমার মূলধন। আমি শুয়েছিলাম। উমা ভেতরে এল। রাতের বেলা একটু ঠান্ডা পড়েছিল। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। উমা প্রায়ই এভাবে ভেতরে এসে গল্প করে। আমি উমার মুখের দিকে তাকালাম।

দেখে মনে হল উমা যেন কিছু একটা জরুরি কথা বলতে এসেছে। আমার মাথার সামনের চেয়ারটা টেনে এনে তাতে বসে উমা ধীরে ধীরে বলল — 'আমরা রিফিউজিরা জানেন, সবার ওপরেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

'কিন্তু ভগবানকে তো বিশ্বাস করেন?'

'ভগবানকে? যে ভগবানের নামে এক মারামারি কাটাকাটি হল কত মেয়েরা অকাল বিধবা হল, কত মেয়ে ধর্ম হারাল, সেই ভগবানের ওপর বিশ্বাস করার মতো মূর্খামি আর কিছুই হতে পারে না। আমার বিশ্বাস ভগবান নেই।' অনেক বেদনা উমার ভেতরের শান্ত মনটাকে মেরে ফেলেছে। মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার শক্তি তার নেই। তাই অদৃশ্য ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

'দুঃখকষ্টে পড়লে আমাদের সেরকমই মনে হয়।'

'দুঃখকষ্টে পড়লে মানুষ ভগবানের খোঁজ করে, কিন্তু যখন মানুষ ভগবান, মানুষ, প্রকৃতি সবার কাছ থেকেই অন্যায় আচরণ পায়, অত্যাচার পায়, তখন মানুষ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আপনাকে আমি বলতে পারছি না, কত আশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম, আর কি দুর্গতিতে আমরা দিন কাটাচ্ছি।'

'সেটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না; কি ধৈর্যের বলে আপনি — আমি পদ্মার কথা বলছি না — আপনি এখনও হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন।'

উমা আমার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। 'তা ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি? যে পাপের জন্য আমি নিজে দায়ী নই, সেই পাপের জন্য অনুতাপ করা মূর্খামি মাত্র। আমি অনুতাপ করি না। একই কারণে দুঃখও করি না। আমরা রিফিউজি, মানুষ হিসেবে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। এই অবস্থাটিকে আমি সহজভাবে নিতে চাইছি। হয়তো আমি পেরেছি, পদ্মা ছোট মেয়ে — ও পারেনি।'

উমা যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। উমাকে আমি কোনোদিনই খারাপ ভাবিনি। খারাপ ভাবতেও চাই না। উমারা ভাগ্যের হাতে লাঞ্ছিতা। তার জন্য পৃথিবীর অন্য সবাই দায়ী হলেও উমা বা পদ্মা কিছুতেই দায়ী নয়।

হঠাৎ উমা শান্ত হল। বলল, 'ক্ষমা করবেন। দুঃখ হচ্ছে বলেই আপনার কাছে বলছি। জানি আপনি এসব জানতে চান না। পৃথিবীর কেউ জানতে চায় না। সবাই ভুলে যেতে চায়। কিন্তু সবাই ভুলে গেলেও আমরা ভুলে যেতে পারি না। শুয়ে পড়ুন, আপনার ঘুম পেয়েছে।' আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করে উমা আমার রুম থেকে বেরিয়ে গেল। উমা যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছুর ওপর আস্থা হারিয়ে

থাকে, আমার ওপরেও তো বিশ্বাস করতে পারবে না। সেটাই কি জানিয়ে গেল নাকি উমা?

উমা পদ্মাদের দুরবস্থার সুযোগ আমি নিতে চাই না। পদ্মার প্রতি আমার ভালবাসা কোনোরকম বিনিময় প্রত্যাশা করে না। কেবল পদ্মার বেদনা-ভরা মুখটি আর করুণ চোখ দুটি ভালবাসা আদায় করে নিতে চায়। তার জন্য উমা যদি আমাকে অবিশ্বাস করতে চায়, উমা তহলে আমাকে ভুল বুঝবে। তাদরে বাড়ির অতিথি হলেও মনের অতিথি আমি হতে চাই না।

সকালবেলা পদ্মাই চা নিয়ে এল। উমা কোথায় যেন বেরিয়েছে। আমার পদ্মাকে ভয় করছিল, বলার মতো কোনো কথাই খুঁজে পেলাম না। পদ্মা জিজ্ঞেস করল — 'রাতে ঘুম হয়েছিল কি?' প্রথম দিকে সত্যিই ঘুম আসছিল না। কালকের সেই গুন্ডাটির চেহারা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখছিলাম।'

'আপনি প্রথম দেখেছেন তো? মানুষের চেয়ে ভয়ানক জানোয়ার আর কিছু আছে কি?' আমি পদ্মার মুখের দিকে তাকালাম। পদ্মা শান্তভাবে কথাগুলি বলছে। হঠাৎ কথার সুর বদলে পদ্মা বলল — 'আজ বিকেলে আমি একটু দূরে যাব, আসতে একটু রাত হতে পারে, একা একা ফিরতে খারাপ লাগবে, আপনার যদি কষ্ট না হয় একটু এগিয়ে যাবেন কি?'

'আমি বিকেলের দিকে বেরিয়ে যাব। এখন আর বেরুচ্ছি না। কত রাত হবে?'

'বার, সাড়ে বারটা বাজতে পারে। এই যে ঠিকানাটা। আপনি এটার পাশেই চৌরাস্তাটায় একটু অপেক্ষা করবেন, আমি আপনার সঙ্গে এসে যোগ দেব।' আমি ঠিকানা লেখা কাগজটা রেখে দিলাম।

'আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আজ আমি সেদিকেই বেরোব। রিফিউজি মার্কেটে কোনো বিজনেস করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখব বলে ভাবছি।'

পদ্মা আর উমা হয়তো আমাকে বিশ্বাস করেছে। এটা তাদের দুর্বলতা। আমি গুন্ডা না হতে পারি, তবে আমিও তো একজন অপরিচিত পুরুষ। আমার থেকে কি ওদের কোনোরকম অপকার হতে পারে না?

দশটার সময় পদ্মা বেরিয়ে গেল। আমার দেখে বেশ খারাপ লাগল — আজও সে সেদিনের সেই লম্বা হাতা কুর্তাটা আর পুরনো পায়জামাটা পরেছে। হয়তো পদ্মার আর কোনো জামা কাপড় নেই। আমি মাত্র দুটো কাপড়ই তাকে সব সময় পরতে দেখছি। কুর্তা পরলে পদ্মা দোপাট্টা নেয় না। অথচ কেবল সেমিজ পরে থাকলে দোপাট্টা নেয়। পদ্মা আর উমা সব সময়ই কিন্তু নিজেদের শরীর সযতনে ঢেকে

রাখে। অনেক আধুনিক পাঞ্জাবি মহিলা কুর্তাকে ফ্রক করে পরে থাকে।

মনে মনে ভাবলাম, হয়তো আমি পয়সা দিলে পদ্মার নতুন কোনো জামা কাপড় কিনতে পারবে। কিন্তু ওদের হয়তো কত অভাব। আমার কাছ থেকে খুব বেশি পেলেও এক শ টাকা পাবে। এক মাসের থাকা খাওয়ার খরচ। পদ্মা আর উমার জন্য যদি দুটো জামার কাপড় নিয়ে আসি ওরা কি কিছু মনে করবে? আগের দিন বেতনের মানি অর্ডার পেয়েছি, আজ বা কালের ভেতর কমিশনের টাকাও হয়তো পেয়ে যাব। মনে মনে ঠিক করলাম আজ ফিরে আসার সময় ওদের দুজনের জন্য দুটো জামার কাপড় নিয়ে আসব। ওরা আমাকে জানে, আমাকে অবিশ্বাস করবে না। রাত সাড়ে বারটার সময় নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পদ্মাকে এগিয়ে আনলাম। আমার পোর্টফোলিও ব্যাগটায় ভরিয়ে আনা ওদের জামা কাপড়ের কথা বললাম না। আমরা অন্য কথা বললাম।

পদ্মা এখানে কেন এসেছিল, আর এত রাত পর্যন্ত এখানে কেন বা কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছিল যদিও, জিজ্ঞেস করলাম না। পদ্মার ব্যক্তিগত কথা। হয়তো বলতে গেলে পদ্মা দুঃখ পাবে। বাড়ি ফিরে আসতে রাত প্রায় দেড়টা বাজল। বাইরের দরজায় টোকা দিলাম। প্রথমে কারো কোনো উত্তর নেই। উমা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? হঠাৎ শুনলাম ভেতরে যেন কিসের গণ্ডগোল হচ্ছে। একটু জোরে ডাক দিলাম — 'উমা —'

উমা যেন জোর করে দূর থেকে জবাব দিল, — 'যাচ্ছি —'

ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল, কিন্তু ভেতরে গভীর অন্ধকার। আমার সামনেই উমা যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে বলে মনে হল।

'আলোটা নিয়ে এস তো উমা, — এত অন্ধকার।'

'আলো জ্বালাতে পারব না —।' উমা যেন কাঁদছিল। আমার একটু অস্বস্তি হতে লাগল। এরা এসব কি ইয়ার্কি শুরু করেছে।

'আমি আলো আনছি দাঁড়ান —' পদ্মা বলল।

'আলো আনিস না পদ্মা — আনিস না, দীপক আছে।' অনুনয়ের সুরে উমা বলল। আমার শীরের সমস্ত রক্ত যেন হঠাৎ জমে গেছে বলে মনে হল। কে আছে?' আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা চিৎকার করে উঠল — দীপক। সে কখন এসেছে?'

'আলো দরকার নেই, আপনি আসুন —' উমা বলল আর অন্ধকারের মধ্যে এসে আমার হাত ধরল। আমার মাথা ঘুরছিল। আমি উমার হাত ধরে অন্ধকারের মধ্যে

এগিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে পদ্মা অন্ধকারের মধ্যেই আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে আমার ঘরের আলোটা জ্বলছিল। সে আমার ঘরের ভেতর ঢুকে আলোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ আমি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যাওয়া উমা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গায়ে এক টুকরো সুতোও নেই। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আজ আমি কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু উমার লজ্জা নিবারণ করার কোনোরকম চেষ্টা না করে পদ্মা গর্জে উঠল — 'দীপক কোথায়?' হঠাৎ একটা ভূতের মতো ঘরের এক কোণ থেকে দাড়িওলা একটা ক্ষীণ যুবক বেরিয়ে এল। তার চোখে অদ্ভুত চাহনি। যুবকটিকে দেখে আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। এই সেদিন রাতের দেখা গুন্ডাটা। এখানে কিভাবে ঢুকল।

হঠাৎ আমি সজাগ হলাম। পুরুষ হিসেবে আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। গর্জে উঠলাম, 'নিকল যাও, গেট আউট।' সে অবুঝের মতো আমার দিকে তাকাল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'লক্ষ্মী ঠিক আছে, লক্ষ্মীর কেউ আছে, লক্ষ্মীকে কেউ স্পর্শ করবে তো তাকে শেষ করে ফেলব।'

পদ্মা চিৎকার উঠল, 'তুই এখন বাইরে যা দীপক ভাই, ভদ্রলোক আছে দেখতে পাচ্ছিস না?' গুন্ডাটা আমার চোখের দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে বলল, 'ও জেন্টেলম্যান। আচ্ছা, আমি যাই, গুড নাইট। পদ্মা আমি যাই, লক্ষ্মী যাই — লক্ষ্মী তুই ঠিক আছিস। তোকে কেউ ছুঁতে পারবে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল। পদ্মা সজোরে দরজা বন্ধা করে দিয়ে ভেতর থেকে হুক লাগিয়ে দিল। ঘুরে তাকিয়ে ল্যাম্পের আলোতে দেখি আমার সামনে উলঙ্গ উমা। ইতিমধ্যে যেন সে সহজ হয়ে উঠেছে। তার পরনে যেন অনেক কাপড় রয়েছে। লজ্জা আর অপমানে মাথা নিচু করে আমি কোনোভাবে আমার বিছানায় এসে বসে পড়লাম। খুব আস্তে আস্তে উমা বলল, 'আমাকে কিছু একটা এনে দে তো পদ্মা।

'তোমার কাপড়?'

'ও নিয়ে গেছে।' এক অবোধ্য পৃথিবী। পদ্মা পাশের অন্ধকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পরনের কুর্তাটা উমার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল — পদ্মার গায়ে এখন শুধু পাতলা দোপাট্টাটা। মাথা নিচু করা অবস্থাতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম 'এসব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না উমা। তোমাদের ঘরে এসব কি চলছে?

'আপনি বুঝতে পারবেন না। এ সব নরকের কাহিনি। আপনি আগে কখনও নরক দেখেননি, আজ দেখলেন।' উমা স্থির কণ্ঠে বলল। আমি উমার দিকে তাকালাম।

উমা ইতিমধ্যে পদ্মার জামাটা পরে শরীরটা ঢেকেছে। পদ্মার দিকে তাকালাম। পদ্মার পাতলা দোপাট্টাকে অস্বীকার করে তার দেহের ভাঁজগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'তুই একটু চা কর গিয়ে পদ্মা, আমি ওনাকে কথাগুলি বুঝিয়ে বলি।

'বুঝিয়ে —'

'হ্যাঁ, বুঝিয়ে, তা নাহলে তো উনি বুঝতে পারবেন না।'

'দরকার নেই, আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না। আমি কিছুই বুঝতে চাই না।' প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম।

'না, শুনুন, সামান্য কথা। আপনি বুঝতে পারবেন।' আমি চুপ করে রইলাম। উমা আমার সামনে এল, টিপয়ের সামনের চেয়ারটাতে বসল। তারপর উত্তেজিত ভাষায় ধীরে ধীরে বলতে লাগল — 'সব কিছু ছেড়ে এলাম, ঘর-বাড়ি, মাটি-জমি, বংশ-পরিবার, সমস্ত কিছুই হত্যাকারীর কাছে ছেড়ে এলাম। আর ছাড়তে হল লজ্জা। ভারত পাকিস্তান সীমান্তে লজ্জাও ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এলাম।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে প্রায় দুশ গুন্ডার চোখের সামনে আমরা তিন শ মেয়ে সাত দিন রইলাম। শীতের মধ্যেও তারা আমাদের গায়ে কোনো কাপড় নিতে দিত না। আমাদের সেই পশুরা চেয়েছিল, ছুঁয়েছিল — যা মন চায় তাই করছিল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা মানুষ। আমাদের মনে হচ্ছিল যে আমরা সবাই বন্য পশু। কাপড়ের ব্যবহার, লজ্জা, সরম আমরা জানি না। আমাদের ওরা পশু বানিয়ে ফেলেছিল।'

'সমস্ত শেষ করে কেবল আশায় বুক বেঁধে এখানে চলে এসেছিলাম। মরতে পারতাম, কিন্তু মরলাম না। আশা করে এসেছিলাম যে এখানে মানুষ আছে। মানুষের মাঝে আবার নতুন করে ঘর গড়ে তুলব। বেঁচে থাকব। কিন্তু মানুষ সহজে পশু হতে পারে। পশু সহজে মানুষ হতে পারে না।'

'কিন্তু এখানে — পথে দেখা হল পদ্মার সঙ্গে। সেও সমস্ত কিছু হারিয়েছে। দুজনেই এক সঙ্গে পালিয়েছিলাম।'

'পদ্মা আপনার মেয়ে নয়?'

'মেয়ে। আমার তো বিয়েই হয়নি। অত্যাচার আমাকে বুড়ি করেছে। আমার বয়স চব্বিশ বছর।' আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উমার দিকে তাকালাম। দেহে যৌবনের তীব্রতা আছে। কিন্তু মুখটা শুকনো, চোখের কোণে কালি পড়েছে।

'আর এই দীপক?'

'দীপক, সেও হতভাগ্য, সর্বহারা, সেও কোনখানের রিফিউজি। তার লক্ষ্মীকে

নিয়ে সে প্রাণটাকে হাতে করে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীকে সে রক্ষা করতে পারল না। দুর্বৃত্তরা তার বুক থেকে লক্ষ্মীকে কেড়ে নেয়, সে পাগল হয়ে গেল।'

'পাগল হয়ে গেছে?'

'পাগল না হয়ে আর কি হবে? সে ভারতে এল। পথে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল — 'আমার লক্ষ্মীকে দেখেছিলে? 'আমি বললাম 'কেন?' আমিও কি লক্ষ্মী নই? তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মাঝে মধ্যে ভাবে আমিই তার লক্ষ্মী।'

'কিন্তু সে যে গুন্ডা —?'

'পাগলকে আমাদের দেশে গুন্ডা বলে। এখানে আজ তাকে সবাই গুন্ডা বলে মনে করে। তাকে দূর ছাই দূর ছাই করে, পেছন পেছন তাড়া করে। কিন্তু সে গুন্ডা নয়। আমি ভাবি সে আমার ছেলে। সে ভাবে আমি তার লক্ষ্মী — আর সে জন্যই —

'ঠিক তখন পদ্মা দু পেয়ালা চা নিয়ে এল।

'চা খান।' বস্ পদ্মা, উনাকে সব কথা বলে দিয়েছি। হয়তো আপনি আমাদের পাগল বলেই ভাবছেন। হয়তো আমাদের মস্তিষ্কও পুরো সুস্থ নেই।'

'কিন্তু দীপক এখানে কি করছিল?' জিজ্ঞেস করা যায় না, তবু আমি জিজ্ঞেস করে ফেললাম। শেষ জেনে নেওয়াই ভাল। কথা বলতে বলতে উমার মুখটা উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। পদ্মা আমার সামানেই বসল। উমা বলল, 'অন্ধকারে দীপকের সঙ্গে আমাকে বিবস্ত্রা দেখে আপনি হয়তো অন্য কিছু ভেবে নিয়েছেন, কিন্তু না, দীপক আমাকে তার লক্ষ্মী বলে ভাবে আর ভাবে যে তার লক্ষ্মীকে অন্য মেয়েদের মতো কোনো অপমান করেনি। তাই প্রমাণ করার জন্য সে কখনও কখনও বাজারের ভিড়ে কোনো কোণে অপরিচিত মহিলাকে উলঙ্গ করার চেষ্টায় অনেক মারধোর খেয়েছে।

আমি নির্বোধের মতো উমা আর পদ্মার মুখের দিকে তাকলাম, ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোটা অসহ্য বলে মনে হতে লাগল। 'জানি, এত নির্লজ্জ, এত জঘন্য ঘটনা আপনি দেখেননি। কিন্তু দেখুন, আমাদের দেহে এই সমস্ত দুঃখের দাগ, আপমানের কালিমা — দেখা তো পদ্মা, উনি জানুক।' কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশে বসা সঙ্কুচিতা পদ্মার গায়ের দোপট্টাটা টান মেরে সরিয়ে দিলেন। তবে সুঠাম, কাঁচা শরীরটা বেরিয়ে পড়ল। আমি শিউরে ওঠলাম, উমা আলোটা কাছে নিয়ে এল — পদ্মার মুখের সামনে।

'মাথা নিচু করার দরকার নেই, এই যে দেখুন, এই সব লেখাগুলি পড়ে দেখুন। হ্যাঁ, কেবল পদ্মারই নয়, আমার শরীরেও রয়েছে এই অলঙ্কার। আপনি দেখুন — সভ্য জগতকে বলতে পারবেন।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে উমা পরে থাকা কুর্তাটা গা থেকে খসিয়ে ফেলল। আমার সামনে দুটি বিবস্ত্রা যুবতী — তাদের মাংসল দেহ। কিন্তু কাঁচা দেহের ওপরে কিছু কালো কালো দাগ। স্তনের ওপরে, দুজনেরই বুকের মধ্যে পেটে আর চির আবৃত করে রাখা দেহের সমস্ত জায়গায়।

নরদেহে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খোদাই করা কালো কালো কয়েকটি অক্ষর, এত বীভৎস। এত কদাকার। আমি মাথা নিচু করে রইলাম। পদ্মা শরীরটা ঢেকে নিল। উমা কিন্তু প্রায় পাগলি হয়ে উঠেছিল। সে বলতে থাকল, 'দীপক ভাবে তার লক্ষ্মী ভাল আছে, তার লক্ষ্মীর দেহে আমাদের মতো কালিমার রেখা পড়েনি। সে তাই পথে ঘাটে যাকেই লক্ষ্মী বলে ভাবে তারই কাপড় তুলে পরীক্ষা করে দেখত চায় তার লক্ষ্মীর শরীরটা অক্ষত আছে কি না।'

'আমাকেও সে কয়েকদিন বিবস্ত্র করে ফেলেছিল। কিন্তু আমার শরীরটা আমি আজও তাকে দেখতে দিই নি। সে যদি দেখতে পায় যে সে-লক্ষ্মী-বলে ভাবা আমিও দেহে কলঙ্কের লেখা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, তাহলে সে হয়তো কোথাও মাথা কুটে মরে পড়ে থাকবে। তাই তাকে আসতে দেখলেই আমি আলো নিভিয়ে দিই।'

'দেখুন, আরও একবার দেখে নিন, আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন, ভারত পেয়েছেন, পাকিস্তান পেয়েছেন। আমরা পেয়েছি এই —' একেবারে নির্লজ্জ ভাবে উমা নিজের বুকের কাছে আলোটা তুলে ধরল। আমার চোখে পড়ল উমার বুক দুটির ওপরে কালো অক্ষরে লেখা এক নতুন দেশের নাম — আর জিন্দাবাদ।

পৃথিবীটা তখন আর আমার পায়ের নিচে ছিল না পরের দিন সকালবেলা পৃথিবীটা শান্ত। আমি চায়ের অপেক্ষা না করেই হোটেলে বিছানাপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

উমাদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করার জন্য তাদের শোবার ঘরে গেলাম। দুজনেই মেঝেতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পদ্মার গায়ে কাপড় নেই, কোমরে আছে, উমার গায়ে জামাটা আছে, কোমরে কিছুই নেই। কিন্তু ঘরের ভেতরের সেই জীর্ণ আলোতেও আমি দেখতে পেলাম তাদের গায়ে একটা বড় ঘায়ের মতো মুখ মেলে থাকা সেই কালো অক্ষরের সারিগুলি — কোনো এক ঘাতকের ছুরি যেন খুঁচে তাদের শরীরে এঁকে দিয়েছে।

আমি দুজনকেই নীরবে আমার অন্তরের একটা প্রণাম জানিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম।

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

জানালার পাশে

ড° বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

শীতের মরশুম।

জাহানারার গায়ে জড়ানো গরম চাদর। নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মহিলা পুলিশটির যান্ত্রিক পরীক্ষায় ও বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল। সেটা আঁচ করতে পেরে মহিলাটি বলল, 'আপনি বোধহয় আজকেই প্রথম প্লেন চড়ছেন। কিছু মনে করবেন না। এটাই নিয়ম। যেভাবে সন্ত্রাস বাড়ছে। তাড়াতাড়ি করুন, প্লেন এখনই উড়বে।'

মহিলাটির এমন সহৃদয় আচরণ জাহানারাকে তৃপ্ত করল। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে রাখা নিজের বেগটি তুলে নিল। এবং দিল্লির প্লেনের দিকে ছুটল তড়িঘড়ি।

নিজের স্যুটকেসটা শনাক্ত করে জাহানারা প্লেনের তেরো নম্বর সারির জালানার পাশের আসনের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, এক ভদ্রলোক বসে আছেন ওই আসনে। বিষণ্ণমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

জাহানারা বিরক্ত হল। সুন্দরী বিমানসেবিকা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বিষণ্ণ যাত্রীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লোকটি জাহানারাকে আসনটি ছেড়ে দিল। সে তার নিজের আসনে বসল।

নিজের আসনে বসে লোকটি কোমড়ে বেল্ট বেঁধে নিল। জাহানারা জানালা দিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরের সবুজ গাছপালার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে উঠল। প্লেনও চলতে শুরু করল। আকস্মিক ঝাকুনিতে জাহানারা হুমড়ি ঘেয়ে পড়তে যাচ্ছিল। পাশের যাত্রীটি জাহানারার হাতটা ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বেল্টটা বেঁধে নিন।'

বিমান যাত্রায় অনভ্যস্ত জাহানারা বেল্ট বাঁধতে না-পেরে লজ্জিত এবং অসহায় বোধ করছিল। পাশের যাত্রীটি জাহানারার বেল্টটা বেঁধে দিয়ে সামনের দিকে নির্বিকারভাবে বসে থাকল।

উপযাচিত এমন সহযোগিতা জাহানারার পক্ষে সহজভাবে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

ভর্ৎসনা না কৃতজ্ঞতা কোনটা যে লোকটির প্রাপ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। জানালা দিয়ে নিচে সরে-সরে যাওয়া গুয়াহাটিকে দেখতে থাকল। ক্রমে পশ্চিমের বিস্তীর্ণ মাঠ আর গ্রামগুলো চোখে পড়ল। ওপর থেকে সবকিছুকে বড়ো মনোরম অথচ যেন দূরের বলে মনে হয়।

মেঘের বুক চিরে বিমানটি উড়ে চলেছে। মেঘের টুকরোগুলো কখনো বড়ো কখনো বা ছোট। কখনো বা জানালার ধারে, কখনো বা নিচে। অস্তগামী সূর্যের বিচিত্র কিরণ যেন কেউ মেঘের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। রঙিন মেঘের টুকরোগুলো যেন এক একটা স্বর্গের পরি।

ধীরে ধীরে টুকরোগুলো আঁধারে ঢাকা পড়ল। জানালার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

জাহানারা নিজের আসনে চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই এক গভীর যন্ত্রণাবোধ হল তার। রেজিয়ার আচরণ তার জীবনটাকে চুরমার করে দিয়েছে। করেছে অশান্ত। রেজিয়া টেলিগ্রাম করে মাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আসার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না জাহানারার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। পরিবারের কাউকে কথাটা বলেওনি। এমনকী তার নিরন্তর পরামর্শদাতা ওখরুদ্দিন মৌলভিকেও কিছু বলেনি। রেজিয়ার সামনে যে কী রূপ ধরবে তা-ও জানা নেই। কবর থেকে উঠে আসা এক শবরূপে দেখা দিলে সে হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

ভাবনাটা বিষমরূপ নিয়ে জাহানারার বুকে চাপা ব্যথার জন্ম দিল। সহযাত্রী লোকটি তার হাতের যে-জায়গা ধরে উঠিয়েছিল, কোমরের সে জায়গায় বেল্ট বেঁধে দিয়েছিল, সে সব জায়গাগুলো যেন ব্যথা করছে। এমন অনুভূতি জাহানারার অসহনীয় মনে হচ্ছিল।

চোখ খুলে জাহানারা সহযাত্রীটির দিকে একবার তাকাল। লোকটি গভীর নিদ্রায় ডুবে আছে। কিন্তু ওর মুখদর্শনমাত্র জাহানারার শরীররের প্রতিটি রোমকূপে ঘন শিহরন অনুভূত হল। ছি ছি, এযাবৎ সে লোকটির মুখদর্শন কেন যে করল না। যদিও-বা দেখেছিল এক ঝলক, ধরতে পারেনি।

সে-ও তো জাহানারাকে চিনতে পারল না। গত চল্লিশ বছরে জাহানারার চেহারা একেবারেই পাল্টে গেছে নাকি? নতুবা ও জাহানারাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে।

এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব। জাহানারা আরেকবার লোকটির দিকে তাকাল। চুলে পাক ধরেছে। মুখের গড়ন আজও সেই তরুণ বয়সের মতোই আছে। নাকের তিলটা

মোটেই ম্লান হয়নি। বয়সের চাপে গালে অল্প ভাঁজ ধরেছে। গাল দুটো কিন্তু এখনো কমলালেবুর খোসার মতো লালচে হলুদ আর উজ্জ্বল। ঠোঁট দুটো কালচে আর থুতনি আগের চেয়ে মেদবহুল। শুধুমাত্র পোশাক-আশাকে কিছুটা পরিবর্তন। স্যুট পরেছে যদিও আগের চাকচিক্য নেই। টাইবিহীন গলাটা খালিখালি লাগছে। ভাঙন-ধরা শরীরটা একটু যেন অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

জাহানারা ওর সঙ্গে কথা বলার সাহস গোটাতে পারল না। চার দশক আগের সম্পর্কের টান আজ আর নেই। গত তিরিশ বছর দুজনের দেখা সাক্ষাৎ নেই। কখনো-বা যদিও মনে পড়েছে, পাপের ভয়ে জাহানারা তাঁর কথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছে। এর ফলে উভয়ের দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গেছে। আজই বা হঠাৎ কোথা থেকে, কেনই-বা সহযাত্রী হয়ে পাশাপাশি বসে আছে! বোধহয় সেও জাহানারাকে বহু চেষ্টায় ভুলে থাকতে পেরেছে। নাকি জাহানারার স্মৃতি পুরোপুরি মন থেকে মুছে ফেলেছে।

জাহানারা আসন বদলাবার কথা ভাবছিল। বিমানটিতে গোটাকয়েক সিট খালি পড়ে ছিল। অথচ পাশের যাত্রীটিকে না-জাগিয়ে কোনোভাবেই অন্যত্র যাওয়া যাবে না। আর জাগাতে গেলেই ওর কাছে জাহানারা নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আসন বদল একেবারেই অসম্ভব।

'অচেনা হয়ে থাকাই ভালো', জাহানারা ভাবল। দুঘণ্টা পর দিল্লি পৌঁছলেই যে যার মতন গন্তব্যস্থানে চলে যাবে। এমনটা ভেবেই জাহানারা গরম চাদরের আড়ালে নিজের আসনেই আত্মগোপন করে ঘুমোতে চেষ্টা করল। এবার তার শরীরে, যাত্রালগ্নে লোকটির হাতের স্পর্শবিধূর অংশগুলোতে ব্যথার বদলে সুখস্পর্শ অনুভূত হল। মুহূর্তে চোখ লেগে গেল। ঠিক কতক্ষণ শুয়েছিল জাহানারা বুঝতে পারেনি। লোকটির কথা শুনে জেগে উঠল। দেখতে পেল সামনেই খাবার রাখা আছে। সহযাত্রীটির আসন সংযুক্ত টেবিলেও খাবারের প্যাকেট। ও খেতে শুরু করেনি। একান্তে একটি ফটো দেখছিল।

'আপনি শুয়েছিলেন। আমিই খাবারটা রেখে দিয়েছি।' লোকটি জাহানারাকে বলল। 'বিমানসেবিকা জিগ্যেস করছিল আপনি নিরামিষ না আমিষভোজী। আমি বললাম আমিষভোজী। ভুল হয়নি আশাকরি।'

'ধন্যবাদ। আমি আমিষভোজীই।' জাহানারা উত্তরে বলল। চোখে চোখ রেখে কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল।

প্লাস্টিকের চামুচ দিয়ে জাহানারা মুর্গির মাংস দিয়ে ভাত খেতে শুরু করল। শেষে

মিষ্টির বাটী থেকে রসগোল্লা টুকরো করে মুখে পুরতে লাগল।

লোকটিও খেতে শুরু করেছে। ওর হাতের ফটোতে কি আছে জাহানারা বুঝতে পারছিল না। লোকটি খুব তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছিল। এক সাথেই দুজনের খাওয়া শেষ হল। জাহানারার মনে হল লোকটি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান নয়। এটা জাহানারাকে পীড়িত করল। এ বয়সে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সতর্ক থাকা দরকার।

একটু পরেই বিমানসেবিকা কফি নিয়ে এল। দুজনেই কফি খেতে শুরু করল।

কফি শেষ হলে আরেকজন বিমানসেবিকা এসে খাবারের খালি প্যাকটগুলো নিয়ে গেল। জাহানারা কাঠের পাত্রটা তুলে সামনের আসনের পিছনে উঠিয়ে রাখল। এরপর শুতে চেষ্টা করল। হঠাৎই চোখে পড়ল তার পায়ের কাছে এক উজ্জ্বল শক্ত কাগজের টুকরো। তুলে এনে দেখল ওটা একটা ফটোগ্রাফ।

ফটোটা দেখে জাহানারা চোখ সরাতে পারছিল না। এই ফটো তো ভ্যানিটিবেগে ছিল। নীচে পড়ল কি করে? ভ্যানিটিব্যাগ খোলা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। হয়ত অজান্তে কিছু একটা হয়ে থাকবে। খানিক পরেই জাহানারা লক্ষ করল লোকটি উদ্বিগ্ন হয়ে নিচে কিছু একটা যেন খুঁজছে। আপন মনে ফটোটার দিকে তাকিয়ে জাহানারা রেজিয়ার পছন্দের তারিফ করছিল। পাত্র পছন্দ করতে রেজিয়া কোনো ভুল করেনি। ভুল করেছে দুটো — প্রথমত ছেলেটির ধর্ম হিন্দু। দ্বিতীয়ত মাকে অন্ধকারে রেখে 'সিভিল ম্যারেজ' করেছে। একদিকে প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ অপরদিকে মায়ের অবমাননা। এহেন আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। শুধু এইটে হলে সহ্য করা যেত। কিন্তু সব সীমা ছাড়িয়ে ও এক অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছে। এর পরিণাম ওর জানা নেই।

ছবিটি দেখতে-দেখতে জাহানারার মন অন্ধকারের শত আকাঙক্ষা চেপে ধরল এবং স্থানকাল ভুলিয়ে দিল।

'শুনছেন।'

চমকে উঠে জাহানারা পাশের যাত্রীর দিকে ফিরে তাকাল।

সহযাত্রীটির চোখ জাহানারার হাতের ফটোর দিকে। 'ওটা আমার। নিচে পড়ে গিয়েছিল। আপনি তোলেননি?'

লোকটির বিনয়ী এবং মার্জিত কথা শুনে জাহানারার মনে হল ওর সুন্দর মনটা এখনো অপরিবর্তিত আছে। মনে মনে তৃপ্ত হল। কিন্তু ফটোটা যে ওর বিশ্বাস হল না। বলল, 'ফটোটা আমারই ব্যাগ থেকে পড়েছিল। আমার পায়ের কাছে খুঁজে পেয়েছি।'

আপনার ব্যাগ থেকে কী-করে পড়বে? আপনার বোধহয় জানা নেই এটা আমার

ছেলে এবং তারই বিয়েকরা মেয়েটির ছবি। লোকটি বিব্রত হলেও তার কথায় কিন্তু বিরক্তি ছিল না।

জাহানারা খুব আশ্চর্য হল। বিস্ময় আর অবিশ্বাসের মাঝামাঝি তার হৃদয় উদ্বেলিত। এমন ঘটনাও এ সংসারে ঘটে। নিরুত্তর জাহানারা ভ্যানিটিব্যাগ খুলে দেখে নিল ছবিটি আছে কি না। আছে। হাতের ছবিটির সঙ্গে পাশাপাশি মিলিয়ে দেখল দুটো একই প্রিন্ট। লোকটিকে মিথ্যা বলায় লজ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দুটোর মিল দেখে সে অবাক হল।

সহযাত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুতপ্ত জাহানারা ছবিটি ফিরিয়ে দিল। ছবিতে চোখ রেখে কিছু বলতে যাবার আগেই আবেগে গলা জড়িয়ে এল তার। জলের ধারা বইতে থাকল দুচোখ থেকে।

হাতবাড়িয়ে ছবিটি নেওয়ার বদলে লোকটি জাহানারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। একটু পরেই জিগ্যেস করল, 'মেয়েটি আপনার কে হয়?'

'আপনি বোধহয় ভাবতেও পারছেন না আমিই মেয়েটির দুর্ভাগীনি মা। আবেগে জাহানারার গলার স্বর আটকে গেল।'

লোকটি অনেক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'আমি ছেলেটির বাবা। কথাটা জানতে পেরেছেন নিশ্চয়। আমি একটা ভালো ঘরের সুশিক্ষিতা মেয়েকে আংটি পরিয়ে তার বিয়ের দিন ঠিক করে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। প্রত্যুত্তরে এই ছবি আর একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আমারও তথৈবচ। ও ডেকে পাঠিয়েছিল। আসার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। কিন্তু অপত্য স্নেহের সামনে আমার রাগ, অভিমান কোনোটাই টিকল না। এ বিয়ের পরিণতি কী হবে?' জাহানারার গলার স্বর তখনো ভারাক্রান্ত।

স্তব্ধ সহযাত্রীটি নীরবে কথাগুলো শুনল। তারপর বলল, 'কে ভেবেছিল পৃথিবী থেকে দশহাজার ফুট উঁচুতে একটা হারানো ছবি খুঁজতে গিয়ে আমরা বর কনের মা বাবা সহযাত্রীরূপে পরিচিত হব। কী আজব ঘটনা। এ তো বিয়েরই এক আশ্চর্য পরিণতি। কী বলেন?'

'হ্যা, ঠিক তাই'। চোখের জল মুছে প্রকৃতিস্থ হয়ে জাহানারা উত্তর দিল। 'এর চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিণতি ওদের অপেক্ষায় রয়েছে। কী হবে ওদের ধর্ম? সন্তানসন্ততির নামকরণ কি করে করবে? আগামীতে কী ধরনের সমাজ হবে ওদের? বর্ণসংকর হয়ে ওরা কি সুখ পাবে? এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় শান্তিতে ঘর করতে পারবে তো?'

স্মৃতিরোমন্থন করে লোকটি বলে উঠল, 'চল্লিশ বছর আগে একইভাবে এক যুবতী ঠিক এ রকমকরেই কথাগুলো আমায় বলেছিল। এমনই এক পরিণতির আশঙ্কায় ভিন্নধর্মী প্রেমিকের সাথে বাঁধা পড়েনি। একই সংশয় যুবকটিকে তার প্রেমিকার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এরা, এ প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা পরিণতি নিয়ে ভাবে না। ভয়ও করে না। ওদের বিচারে অন্ধবিশ্বাসে কুঁরে-কুঁরে খাওয়া সমাজকে উপেক্ষা করতে পারাটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবধর্ম। আমার ছেলের কথাগুলি খোলাখুলিভাবে লিখেছে।

'একই কথা আমার মেয়েও লিখেছে। আমি শুধু বলতে এসেছি' — জাহানারা বলে চলল। সে রেজিয়াকে যে কথাগুলো বলতে এসেছে সে একপ্রকার কঠোর আত্মপীড়ন আর নির্মম বিচ্ছেদেরই পূর্বাভাস। এ মুহূর্তে কথাটা উচ্চারণ করতেও ভালো লাগছিল না।

লোকটি বলল, 'আপনি যে কি বলবেন সে আমি অনুমান করতে পারছি। আমারও ভাবনাটা এ রকম ছিল। কিন্তু আমিই ছেলেকে উৎসাহিত করেছিলাম। সর্বধর্ম সমন্বয় মেনে নিয়ে অন্ধবিশ্বাস ভাঙতে গিয়ে ও যা করেছে তাকে ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সত্যিটা না-জানলে আপনিও আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন না। যৌবনে আমিও ওর মতো ভালবেসেছিলাম —'

এবার জাহানারা মাথার কাপড় সরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন? কথাটা বলার আগে ভেবে দেখুন পুনরুক্তি করে কোনো লাভ আছে কি?'

সহযাত্রীটি জাহানারার অনাবৃত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বয়সের ভারে ওর চিরপরিচত মুখের আদল অনেকটাই বদলে গেছে। তবু একেবারে চিনতে না-পারাটা কিঞ্চিত হলেও দুঃখজনক। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলেছিলেন ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে। কালিদাসের এই ব্যাখ্যা সে মনে প্রাণে মানতে পারেনি। এমনেসিয়া একধরনের মানসিক রোগ। সম্ভবত দুষ্যন্তর বিস্মৃতি এমনই রোগের প্রকোপ থেকে উৎপন্ন।

জাহানারাকে দেখেও চিনতে না-পারার অনুতাপ লোকটিকে দগ্ধ করছিল। তা ঠিক, জাহানারা এখন আর আগের মতো নয়। চেহারায় বহু পরিবর্তন ঘটেছে। গোল মুখটা লম্বাটে হয়ে গেছে। শরীর ভেঙেছে, উজ্বল শ্যামলা বর্ণ অনেকটাই ফ্যাকাসে পড়েছে। চোখ দুটো বেশ খানিকটা বিবরে ঢুকে গেছে। তাই ওকে চিনতে দেরি হল। জাহানারার হাসিটা যেন ওকে চিনতে পারার কাজ অনেকটাই সহজ করে দিল। হাসিতেই ওর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সময় শুধু এ হাসিটাই কেড়ে নিতে পারেনি।

কিছু একটা বলতে গিয়েও জাহানারা থমকে গেল। কোথায় যেন কিছু আটকে

যাচ্ছে। 'কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি' লোকটি বলল, 'আমাকে আগের মতই নাম ধরে ডাকতে চাইছ তো? ভালো লাগবে।' একটু চুপ থেকে সুরেন বলল, 'জাহানারা, ইমরান — এলো না যে?'

'উনি গত হয়েছেন বারো বছর। জানো তো সুরেন, বর কষ্ট করে রেজিয়াকে মানুষ করেছি। ভালো ব্যবসায়ী হলেও ইমরান — ভীষণ খরুচে ছিল। কঠিন মেহনত করে ব্যাবসাকে ধরে রেখে রেজিয়াকে পড়াশোনা করিয়েছি। মেয়েটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। রেজিয়া আই.পি.এস পেয়ে দিল্লির এস.পি. হল। আজ এই ঘটনা।' জাহানারার গলা আবার যেন জড়িয়ে এল।

সুরেন নির্বাক বসে রইল। কোনো উত্তর দেয়া সহজ ছিল না। পুত্র-কন্যার বিদ্রোহ ওদের ভাবনার জগৎ টাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

জাহানারা — 'তোমার স্ত্রীর কী নাম? তোমার সঙ্গে এলো না সে?'

উত্তরে সুরেন বলল — 'শান্তি গত হয়েছে সাত বছর। কষ্ট দেয়নি। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুধাকরের পাত্রী ঠিক করে গিয়েছিল। ছেলে তো এই করল। ভেবেছিলাম ত্যাজ্য পুত্র করব। কিন্তু মনোগতভাবে আমিই ওকে নতুন ভাবনায় দীক্ষিত করে তুলেছিলাম। এখন শাস্তি দিলে নিজেকে কি বোঝাবো? কাজটা অনৈতিক হবে, না কি?

সুরেনের কথাগুলো জাহানারার মনে পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। সময়ের সঙ্গে অতলে তলিয়ে যাওয়া বিস্মৃত কথাগুলো হঠাৎই যেন সশরীরে ফিরে এল। চারদশক আগের কথা। তখন রেজিয়ার মতো সে নিজেও সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান উপেক্ষা করে সুরেনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সুরেনের মনেও এমনই ভাবনা জাগরুক ছিল। কিন্তু দুটো পরিবারের প্রবল বাধা ও আপত্তির বিরুদ্ধে সে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অসফল হলেও বিয়ের ভাব ওদের মনে রয়ে গেল। সুরেন নিশ্চয় এ মনোভাব সুধাকরের কাছে কখনো ইশারায় প্রকাশ করেছিল। এখন ভাবনা চিন্তাগুলো আজকাল গল্প, উপন্যাসে সিনেমায় আর খবরের কাগজে আকছার দেখতে পাওয়া যায়। সব ট্যাবুই যেন ভেঙে গেছে। আজকের জগতে অসম্ভবও সম্ভব হচ্ছে।

নতুবা রেজিয়া আর সুধাকর এত সহজে পরিবারকে উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল খুশি মতো কী-করে বিয়ে করল?

জাহানারা বলল — 'শুধু তোমার কাছ থেকে এমন ভাবনা ও পায়নি। আজকাল বই-পত্রেও এসব ধারণা পাওয়া যায়। অথচ এ বিয়ের পরিণামের কথা ওরা একবারও ভেবে দেখল না। রেজিয়া আমাকে মর্মাহত করেছে। ও ছিল আমার চোখের মণি।

সবই আল্লার ইচ্ছা।'

'যদি আল্লারই ইচ্ছা তাহলে পরিণাম নিয়ে ভেবে কী হবে জাহানারা? আমরা যা নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন ওদের কাছে এ হচ্ছে অতি নগণ্য সাংসারিক সমস্যা। সুধাকর লিখেছে ওরা দুজনে যে যার ধর্ম মেনে চলবে।'

'এও কি সম্ভব সুরেন?' জাহানারা জিজ্ঞেস করল।

'ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে। হয়ত মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। সুরেন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

জাহানারা উত্তর খুঁজে পেল না। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নীরবে বসে রইল। রেজিয়াকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারেনি। কিন্তু কেন? সুরেন কেন, কাউকেই এর সদুত্তর দেয়া সম্ভব নয়। দেখা হলে রেজিয়াকে এখনো ক্ষমা করতে না-পারার কোনো যুক্তি দর্শানো ওর পক্ষে অসম্ভব। মেয়েটি তো যুক্তিই খুঁজবে। আজকাল সবাই যুক্তির কথাই বলে। মাতৃত্বের দায়িত্ব কিংবা কর্তৃত্বের কথা নিয়ে কোনো মাথা ঘামায় না। ভিধর্মী বিবাহের মতো হঠকারিতার বিরুদ্ধাচরণ কেউ করে না। করতে পারে না। অথচ এমনই এক দোটানায় পড়ে জাহানারা তার মনের মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। রেজিয়ার বিবেচনায় এগুলো কোনো কারণই নয়। ও নিজে যখন মা হবে তখন নিজের সন্তানের অবাধ্যতা সহ্য করতে পারবে তো? হিন্দু স্বামীর ঘর করে ইসলামের নীতি নিয়মনিষ্ঠা মেনে আল্লার উপাসনা করতে পারবে কি? আল্লার করুণা কি ওর উপর বর্ষিত হবে? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নিজে খুঁজে পাচ্ছিল না।

ব্যাগ থেকে একটি বই বের করে সুরেন পড়তে শুরু করল। কৌতূহল ধরে রাখতে না-পেরে জাহানারা গলা বাড়িয়ে বইয়ের নামটা দেখে নিল।

বইয়ের নাম 'সৌভাগ্য পরশমণি'। মনটা তৃপ্ত হয়ে গেল। ও নিজেও বইটি পড়েছে। ইমাম মহম্মদ গজ্জালির এই বইটি জাহানারাকে আত্মন্বেষণ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। বইটিতে লিখা আছে — 'যতক্ষণ তুমি নিজের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যকে জানতে পারবে না ততক্ষণ নিজের সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।'

কিছুক্ষণ পড়ার পর সুরেন বইটি বন্ধ করে রাখল। বিমান নামতে শুরু করেছে। জানলা দিয়ে জাহানারা দেখছিল নিচে অসংখ্য বিজলি বাতি জ্বলছে।

'দিল্লি পৌঁছোলো নাকি'

'হ্যাঁ'।

জাহানারার বুকে কাঁপুনি অনুভূত হল। রেজিয়া নিশ্চয় ওর অপেক্ষায় আছে। কী

বলবে ওকে? মনের ভেতর আগুন জ্বলছে। তীব্র নরক যন্ত্রণার জ্বালা। এ হল রেজিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের জ্বালা। লজ্জা আর অনুতাপের দহন। অন্তঃধর্মীয় বিবাহের নিষ্ঠুর পরিণামের আশঙ্কা।

সহসা তার মনে হল, আল্লার সৌন্দর্যদর্শনে বঞ্চিত আত্মাকে দহন করা অনেক জ্বলনের ভিতর এগুলিও পড়ে।

সুরেন জাহানারার মনের অবস্থা লক্ষ করছিল। বলল, 'জাহানারা তুমি তো জানো আমি ব্যবসায়ী এবং সংসারীও। এই পৃথিবীকে গভীরভাবে আঁকড়ে আছি। তবু সংসারের মোহ আমার নেই। একই গতিতে সবই চলছে। সুতরাং যেমন চলছে, চলতে দাও। রেজিয়া আর সুধাকরদের আমরা শুধু জন্ম দিয়েছি। ওদের জীবন আমাদের নয়। ওরাও এই গতিরই দাস। আমাদের কালে আমরা যে মননের অধিকারী ছিলাম, ওরা তেমন নয়। আমরা যা করতে পারিনি ওরা তা করে দেখাল।'

সুরেনের প্রতিটি শব্দ জাহানারা মন দিয়ে শুনছিল। বলল, 'তোমার কথার সত্যতা অস্বীকার করছি না। কিন্তু যুক্তির বাইরেও কোনো এক মজ্জাগত সংস্কার আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।'

প্লেন থেকে নেমে দুজনে নিজেদের জিনিসপত্র আনতে মালখানার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎই জাহানারার চোখে পড়ল, এস.পি.র পোশাক পরা রেজিয়া আর এয়ারফোর্সের পোশাকে সুধাকর অনেকদূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা জাহানারাদের লক্ষ করেনি।

জাহানারা অসহায় লাগায় সুরেনকে বলল, 'পায়ের তলার মাটি খসে পড়লেই আমি রক্ষে পাই।'

সুরেন জাহানারাকে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত বেঞ্চে বসিয়ে মালপত্র আনতে গেল। মাল বহে আনা বেল্ট ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। বেগেজ কার্ড নিয়ে সুরেন দাঁড়িয়ে রইল।

মালপত্রসহ সুরেন জাহানারার কাছাকাছি আসামাত্র সুধাকর দৌড়ে এসে বাবাকে বলল, 'বেগগুলো আমাকে দাও। গাড়িতে উঠিয়ে নিচ্ছি।'

সুরেন বলল, 'অসম ভবনে আমার একটি রুম বুক করা আছে। তুই কি অন্য কোথাও আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিস?'

'কেন, আমাদের ওখানে থাকবে না?'

'ওহো, উনি আছেন না।'

'উনাকেও নিয়ে চল।' জাহানারা সুধাকরের দিকে একবার তাকালো। বলল, 'আমার

জন্যও অসমভবনে একটি রুম রাখা আছে।'

তখনই রেজিয়া এসে মার কাছে দাঁড়লো। ও মার কথা শুনে বলল, 'মা, অসম ভবনে থাকতে হবে না। আমরা ঘর ঠিক করেই রেখেছি। আলাদা আলাদা দুটো ঘর।

জাহানারা এবার রেজিয়ার দিকে তাকাল। বাবার মুখে উদাসীনতার ছাপ। অভিমান হলো রেজিয়ার। বলল, 'এই ভালো। অসম ভবন আমাদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূর নয়।'

হঠাৎই সুরেন বলে উঠল, 'সুধাকর উনাকে চিনতে পেরেছ তো?' সুধাকর জাহানারার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অপ্রস্তুত জাহানারা পা দুটো সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না। বলল, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। তোমাকে দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে।'

কথাগুলো সৌজন্যের খাতিরে বললেও সে ইচ্ছাকৃতভাবেই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল না।

মার কথায় আশ্চর্য হয়ে রেজিয়া সুরেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মার অনেক বন্ধুকেই আমি চিনি। কিন্তু জেনে ভাল লাগছে যে আপনি মার দীর্ঘদিনের চেনা। সে অর্থে আপনি আমারও খুব আপনজন।'

রেজিয়া সুরেনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। সুরেন যেন রেজিয়ার মধ্যে সেই চল্লিশ বছর আগের জাহানারাকে দেখতে পেল। 'তোমার মা-ও তোমার বয়সে তোমারই মতো ছিল।' কথা শেষ করে সুরেন জাহানারার দিকে তাকায়। লজ্জায় জাহানারার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

সেদিন গাড়ি চালাচ্ছিল রেজিয়া। পাশে সুধাকর। পেছনের আসনে বসেছিল সুরেন আর জাহানারা।

অসম ভবনে পৌঁছে সুধাকর অভ্যর্থনা কক্ষে খবর নিতে গেল। ফিরে এসে জানাল, 'হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী সদল বলে এসে পড়ায় জাহানারা এবং সুরেনের জন্যে রাখা ঘরগুলো মুখ্যমন্ত্রীর দুজন সেক্রেটারিকে দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

বিব্রত জাহানারা নিরুপায় হয়ে বলল, 'কী করা? হোটেলে যাওয়াটাই ভালো হবে।'

সুরেন প্রমাদ গুনলো। এতরাতে চট করে হোটেলে দুটো ঘর পাওয়া কঠিন হবে। তবু সুধাকরকে দু-একটা হোটেলের নাম বলে দেখল। সুধাকর দৃঢ়ভাবেই বলল, 'এখন কোনো হোটেলেই সিট পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া আপনি হয়ত থাকলেনই, মা কী-করে থাকবেন? তার চেয়ে বরং আমাদের ওখানেই চলুন। রাতটুকু থাকুন। কাল আশে পাশে কোনো একটা হোটেলে ব্যবস্থা করা যাবে। কী বল রেজিয়া?'

রেজিয়া বলল, 'সেই ভালো। কী বল মা?' 'যা ভাল বুঝিস কর, জাহানারা উত্তর দিল।

সুধাকর গাড়িতে বসতেই রেজিয়া লোধি স্ট্রিটের দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করল। ডিসেম্বর মাস। দিল্লিতে হাড়কাঁপানো শীত। জাহানারা নিজেকে আপাদমস্তক চাদরে মুড়ে কাচুমাচু হয়ে বসে রেজিয়ার গাড়ি চালানো দেখছিল। মনে মনে একটু গর্বিতও।

গাড়ি এক বিশাল বাড়ির নিচে এসে দাঁড়াল।

সুরেন আর জাহানারা রেজিয়াদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।

রেজিয়ারা এগিয়ে গেলে জাহানারা বলল, 'সুরেন তুমি যে গতির কথা বলেছিলে সে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। এ অবিরত।'

উত্তরে সুরেন বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় গতির ভেতরে যদি স্থির কিছু থাকত! ভালেই হতো। কিন্তু সে তো নেই।'

সুধাকর জাহানারাকে আর রেজিয়া সুরেনকে নিয়ে ভিতরে ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলো দেখিয়ে দিল। মুখোমুখি দুটো ঘর। মাঝখানে আসা যাওয়ার এক ছোট্ট করিডর।

ঘরে ঢুকে জাহানারা লক্ষ করল ফুলদানিতে একতোড়া রজনীগন্ধা। ধূপ জ্বলছে পাশেই। বিছানায় গোলাপি আতরের গন্ধ। ওর প্রকাণ্ড স্যুটকেসটা এক কোণায় রাখা আছে। সুধাকর বলল, 'মা আপনি কী খাবেন? এক কাপ হরলিক্স আর দুটো বিস্কুট।'

জাহানারা বলল, 'তোমাদের রান্নার লোক আছে তো?' 'আছে', বলেই সুধাকর বেরিয়ে গেল। জাহানারা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাথরুম ঢুকে গরমজলে চান সেরে সাদা কাপড় পরে নিল। লম্বা আয়নার সামনে দীর্ঘ চুল খুলে আঁচড়াতে শুরু করল।

আজ ক'দিন পর মুখে পাউডার মাখল জাহানারা। এরপর আরাম কেদারায় বসে আল্লার স্মরণ করল।

দরজায় টোকা পড়তেই খুলে দেখল হরলিক্স বিস্কুট নিয়ে রেজিয়া হাজির।

ট্রেখানা টেবিলে রেখে রেজিয়া বলল, 'মা তুমি এখানে পুরোপুরি নিজের মতো করে থাকো। জানি, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না। ঠিকই আছে। শুধু একটা কথা জেনে রেখো, আমরা যা করেছি, জেনে বুঝেই করেছি। তোমরা যে কারণে একে অন্যকে বিয়ে করতে পারনি সে বাধা আমাদের নেই। আমরা বাঁধনমুক্ত।

'মানে' জাহানারার গলায় শঙ্কার সুর। রেজিয়া বলল, সে সব কথা বলার প্রয়োজন নেই। মা, তোমার সবই জানা। খেয়ে শুয়ে পড়ো। সকালে দেখা হবে।'

রেজিয়া গেলে অনেকক্ষণ জাহানারা স্থির বসে রইল। হরলিক্স যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকল। তার জীবনের এক বন্ধ কুঠুরি যেন দমকা হাওয়ায় হঠাৎ খুলে গেল। ভেতর থেকে বাতাসে সুগন্ধ ভেসে আসছে। মনে হলো, এ ঘরটা যেন এক এরোপ্লেন। তার চেয়ারটা জানালার লাগোয়া। ও তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

রাতে শুতে গিয়ে বিছানার পাশের টেবিলে একটি চিঠি নজরে পড়ল। চিঠিটা উঠিয়ে নিল।

দুদিন পরই কোনো এক হোটেল রেজিয়া সুধাকরের বিয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছে। এ চিঠি তারই নিমন্ত্রণ।

।। অনুবাদ : অমিতাভ চৌধুরী।।

নরকে বসন্ত

হোমেন বরগোহাঞি

গলিটার মুখে ঢুকতে যেতেই পেছন থেকে কেউ ডাকছে শুনে হিমাদ্রি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে তার স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ সুরে বলে উঠল — 'আমাকে ডাকছ?'

মানুষটা নম্রভাবে উত্তর দিল — 'হ্যা, তোমাকেই ডেকেছি। একটা অনুরোধ রাখবে?' মুখটা সংকুচিত করে হিমাদ্রি কিছুক্ষণের জন্য কী যেন ভাবল। এ ধরনের মোলায়েম সুরের কথাবার্তা তার একেবারে ভালো লাগে না। তা ছাড়া মানুষটার সাজ-পোশাক, চেহারা সমস্ত কিছুই সন্দেহজনক। অর্থাৎ মানুষটাকে দেখতে একেবারে ভদ্রলোকের মতো। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হিমাদ্রির কী কথা থাকতে পারে?

হিমাদ্রিকে মানুষটা নিশ্চয় অন্য কেউ বলে ভুল করেছে। কিছুটা গভীর সুরে সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল — 'তুমি ঠিক আমাকেই ডেকেছ তো? আমি কে জান?

'নিশ্চয় জানি। তুমি হিমাদ্রি। এই মাত্র তুমি বেদী হোটেলে ভাত খেয়ে বেরিয়ে এসেছ। এখন বাড়ি যাবে। তোমার বাড়িটা অবশ্য আমি চিনি না।'

হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে অপরিচিত মানুষটা সুন্দর হাসি হাসল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটি সিগারেট হিমাদ্রির হাতে গুঁজে দিয়ে পুনরায় সে বলে উঠল — 'আমার নাম শঙ্কর। এই শহরে নতুন এসেছি। মাত্র দুদিন হয়েছে। হোটেলে রয়েছি।'

হিমাদ্রি অবাক হল। অবাক হল — এই শহরে নতুন করে আসা একটি মানুষ দুদিনের মধ্যে তার নাম পর্যন্ত জেনে গেছে দেখে — মানুষটার কথা বলার ধরনে, তার চেয়েও বেশি অবাক হল — তার সঙ্গে মানুষটার কী কথা থাকতে পারে সে-কথা ভেবে। কিন্তু কোনো ভাবাবেগর বাহ্য লক্ষণ তার মুখের অভিব্যক্তিতে সহজে ফুটে ওঠে না। আগের মতোই নির্বিকারভাবে সে পুনরায় প্রশ্ন করল — 'কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার কী কথা আছে?'

শঙ্কর হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে একটা লম্বা সুখটান দিল। তারপর হিমাদ্রির

কাঁধে একটা হাত রেখে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে বলে উঠল — 'চল আগে তোমাদের বাড়ি যাই। সেখানে বসে কথা বার্তা বলব। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা।'

বাড়ি? হিমাদ্রি যেন চমকে উঠল। সে যেখানে থাকে তাকে বাড়ি বললে অপমান করা হয়। এবার তার অজান্তেই তার মুখে একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। কিছু একটা অস্বস্তিকর জিনিস শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো করে সে কিছুটা বিরক্তভাবে বলে উঠল — 'আমাদের বাড়িতে বসার মতো জায়গা নেই। কী বলতে চাও এখানেই বলে ফেল।'

বসার দরকার নেই শোবার জায়গা দিতে হবে। তুমি আগে যাও তো দেখি।

শঙ্কর হিমাদ্রির হাতটা ধরে টান দিল।

আশ্চর্য মানুষটার মতলব? অন্ধকার গলিটা দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় একটা অস্পষ্ট সন্দেহ হিমাদ্রির মনে খেলা করতে লাগল। পেছন থেকে যদি মানুষটি তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়? সম্ভাব্য সমস্ত শত্রুর কথা সে ভাবতে চেষ্টা করল। হঠাৎ একটা মানুষের পড়ে যাবার মতো শব্দ শুনে হিমাদ্রি ভীষণভাবে চমকে উঠল। শঙ্করের পিঠেই কেউ ছুরি বসিয়ে দিল নাকি? সে পেছন ফিরে দেখে, অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোতে গিয়ে কাদায় পা পিছলে শঙ্কর মাটিতে পড়ে গেছে। জোরে হাতে ধরে টেনে সে শঙ্করকে দাঁড় করিয়ে দিল।

অবশেষে দুটো প্রকাণ্ড দোতালা ঘরের মাঝখানের দীর্ঘ গলিটা পার হয়ে তারা একটা বস্তির প্রবেশ মুখে উপস্থিত হল। সেখানে হিমাদ্রিকে থমকে দাঁড়াতে দেখে শঙ্করকেও দাঁড়াতে হল।

আপনার মতলব কী সোজাসুজি খুলে বলছেন না কেন?' — হঠাৎ শঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি প্রশ্ন করল — 'আমার কিন্তু দালালি করা ব্যবসা নয়।'

হিমাদ্রির ইঙ্গিতের অর্থ অনুধাবন করে শঙ্কর সেই কদর্য বস্তিটার জরাজীর্ণ ঝুপড়ি ঘরগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিল। আকাশে চাঁদ উঠেছিল। বাতাসে ভেসে আসছিল বস্তির কাঁচা পায়খানার উৎকট গন্ধ। মাটিতে বস্তা পেতে একজন বুড়ো মানুষ শুয়েছিল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল তার দেহের ব্যাধিগ্রস্ত বিকৃতি। মানুষটার দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে যেন বিষ নিঃসৃত হচ্ছিল। সেই বিষের জ্বালায় শঙ্করের হৃদপিণ্ড বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসিতে সে চকিত হয়ে উঠল। এ ধরনের হাসি সে জীবনেও শোনেনি। শতখণ্ডে খণ্ডিত সেই হাসির ধ্বনিতরঙ্গে ঘৃণ্যতম কোনো বেদনার ছদ্মরূপ যেন মুহূর্তের জন্য জ্বলজ্বল করে উঠল।

হিমাদ্রি — অনেকক্ষণ পরে শঙ্কর কথা বলল — 'কয়েকদিনের জন্য তোমার ঘরে আমি আশ্রয়ের খোঁজে এসেছি। বাকি পরিচয় তোমাকে ধীরে ধীরে দেব। আজকের রাতটা কেবল পার হতে দাও।'

হিমাদ্রির মুখে একটা দ্রুত ভাবান্তর দেখা গেল। চাঁদের আলোতে শঙ্করের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কিছুসময় চিন্তিত হয়ে রইল। একইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পরে সে ধীরে ধীরে বলল — 'তোমার মতলবটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যিই তুমি আমাকে খুব অবাক করেছ। — আচ্ছা দেখা যাক।'

বস্তির মাথায় তিনতলা বাড়ির একেবারে কোণের ঘরটিতে থাকে হিমাদ্রি। দরজাটা খুলে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সে শঙ্করকে ভেতরে ডেকে নিল। শরীরটা কুঁজো করে শঙ্কর কোনোক্রমে ভেতরে ঢুকে গেল। হিমাদ্রির বিছানা ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। বেড়ার কাছে রশিটাতে হিমাদ্রির কয়েকটি জামাকাপড় ঝোলানো রয়েছে। বিছানার দিকে ইঙ্গিত করে হিমাদ্রি শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল — 'বস'।

শঙ্কর বসে পড়ল। হিমাদ্রি তার নোংরা পেন্ট এবং শার্টটা খুলে রেখে একটা লুঙ্গি পরে নিল। তারপর শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল — 'তুমি ভাত খেয়েছ? আমি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করি, তুমি তো জান...।' সে আরও কিছু একটা বলতে চেয়েছিল।

শঙ্কর বলল — 'আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছি। তোমাকে আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। আমি তোমার সম্পর্কে সমস্ত কিছুই জানি।

'তুমি আমার সম্পর্কে কী জান? — হিমাদ্রির কণ্ঠস্বরে কিছুটা ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠল।

'তুমি সিনেমার পোস্টার লাগাও। হ্যান্ডবিল বিলি কর। সুবিধে পেলে জুয়া খেল। হোটেলে ভাত খাও। রাত হলে এখানেই শুয়ে থাক।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে — তোমার জোড়হাট থেকে আসার মাত্র দুদিন হয়েছে। এতসব কীভাবে জানলে?'.

'চাইলেই সমস্ত কথা জানা যায়। সেটা আর এমন কী বড় কথা।'

'কিন্তু এতগুলো মানুষের মধ্যে বেছে বেছে কেবল আমাকেই কেন তুমি বেছে নিলে?'

'তোমার মতো একটি মানুষেরই আমার প্রয়োজন ছিল, তাই। কিন্তু আজই তুমি আমাকে সমস্ত প্রশ্ন করে বস না। চল একটু বাইরে গিয়ে বসি। এখানে খুব গরম লাগছে।'

দুজনেই অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। এক টুকরো জায়গায় বস্তির দশ বারোটা ঘর কোনোক্রমে ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো একটিতে রুগ্ন, ক্ষুধিত শিশু দুর্বল কণ্ঠে কেঁদে উঠল। একজন হিন্দুস্তানি মহিলা কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে। কিছুটা দূরের অন্য একটি ঘর থেকে প্রণয়-কলহ-মত্ত একদল স্ত্রী পুরুষের ফিসফিসানির শব্দ শোনা গেল। বেশিরভাগ ঘরেরই প্রদীপ নিভে গেছে। মানুষগুলো বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

শঙ্কর একবার হিমাদ্রির মুখের দিকে মনে মনে তাকাল। একটা অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রের সন্ধানে যেন তার দৃষ্টি সুদূর শূন্যে সীমাবদ্ধ। উপযাচক হয়ে আলাপ না-করলে হিমাদ্রি মুখ খোলার কোনো আশা নেই। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে শঙ্করও আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাল। চাঁদটা প্রায় মাথার উপরে উঠে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো শহরের কোনো এক প্রাসাদের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নব যৌবনা কোনো যুবতি সেই চাঁদটার দিকে তাকিয়ে একটা গান গেয়ে উঠল — 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে, যেন সিন্ধু পারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে।' কোনো এক কিশোর ছাত্র হয়তো আসন্ন পরীক্ষার আতঙ্ক বিস্মৃত হয়ে কীটসের অমর নাইটিঙ্গেলের সুন্দর পঙক্তি একটা মনে করে ভাবাবেগে মত্ত হয়ে পড়ল। সুদূর কোনো গ্রামের নির্জন নদীর পারে করুণ সুরের বাঁশি বাজিয়ে চলেছে কোনো এক তরুণ, তার সুরে আপন শয্যাসঙ্গীর নিবিড় বাহু বন্ধনের মধ্যেও হাহাকার করে উঠল কোনো নববধূর হৃদয়। আর এই বস্তিতে মানুষের জীবন রোগীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, ক্ষুধিত শিশুর যন্ত্রণা কাতর গোঙানিতে, পায়খানার দুর্গন্ধে, গণিকার সঙ্গম-শ্রান্ত দেহের ঘামের দুর্গন্ধে, বেকার মাতালের রক্ত বমির দুর্গন্ধে, ঘৃণা, নৈরাশ্য এবং বেদনার কুৎসিত আর্তনাদে।

শঙ্কর একটা সিগারেট জ্বালাল।

'তোমার ঘুম আসছে না? হিমাদ্রি বলে উঠল।

হ্যাঁ ঘুম আসছে না। তোমার ঘুম পেয়েছে নাকি?'

'রাত অনেক হল কিন্তু।' হিমাদ্রি উত্তর দিল।

'আচ্ছা, তুমি এখানকার সমস্ত লোকজনকে জান?' শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'জানি। কিন্তু তোমার এইসব খবরে কী প্রয়োজন? তুমি পুলিশের সিআইডি নাকি?'

'প্রতিবেশীর খবর নিলেই সিআইডি হয়ে যায় নাকি? তুমি তো খুব সন্দেহ পরায়ণ মানুষ। কাউকে কখনও খুন-টুন করেছ নাকি?'

'তোমাকেই তো আমি সন্দেহ করছি। তা নাহলে লেখা-পড়া জানা ভদ্রলোক হয়ে তুমি এরকম জায়গায় কেন বসবাস করছ? হোটেলে থাকছ না কেন?'

শঙ্কর তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

'আমার বিষয়ে তুমি যা ভাব — ভাব। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই ঘরগুলোতে কারা কারা থাকে, মানুষগুলো কী করে — আমাকে পরপর বলে যাও তো।'

হিমাদ্রি বলতে শুরু করল — 'এখানে যে সমস্ত মানুষ প্রথম থেকে রয়েছে তাদের সম্পর্কে বলতে পারব। নতুন করে কিছু মানুষ এসেছে, তাদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ওই কোণের ঘরটাতে থাকে চিমুনি এবং তার পরিবার। ছেলে মেয়ে নেই। সে মুটের কাজ করে। চিমুনি খুব ভালো মানুষ, কিন্তু পরিবারটা বজ্জাৎ। তার পাশের ঘরে থাকে পাঁচু। দিন মজুরি করে খায়। পরিবার আর কয়েকজন ছেলেমেয়ে। পাশের ঘরে থাকে জুলি, বাজারে মেয়েছেলে। পাঁচুর বড় ছেলেটি তার হয়ে দালালি করে, এটা ওটা কাজ করে দেয়। তার পাশের ঘরটাতে দলবাহাদুর আর তার স্ত্রী লক্ষ্মী থাকে। দলবাহাদুর ব্যাঙ্কে চৌকিদারের কাজ করে, পরিবার মদ বিক্রি করে আর রাতের অন্ধকারে অতিরিক্ত রোজগার করে। তার পাশের ঘরে থাকে রহিম আর মনোহর। দুজনেই রিক্সা চালায়। এ পাশের এই ঘরটাতে আমি থাকি। আমি কী করি তা তুমি জেনেছ। ও ঘরে থাকে জয়। সে এখনও ফিরে আসেনি। জয়ের কী করে চলে কেউ জানে না। কিন্তু এই বস্তির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চেহারা জয়ের। সুন্দর পোশাক পরে। ওকে সবাই ভয় করে। মস্ত গুন্ডা। তার পাশের ধারে থাকে অসুস্থ লোকটি এবং তার ছেলে। ছেলেটি চুরি করে, ভিক্ষা করে, মানুষের বাড়িতে দুদিন চাকর থেকে কিছু হাত সাফাই করতে পারলেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বাকি লোকদের আমি এখনও ভালো করে জানি না।'

শঙ্কর কিছু একটা বলবে বলে আশা করে হিমাদ্রি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্করকে ডাকল — 'অনেক রাত হয়েছে, চল শুয়ে পড়িগে।'

দুজনেই ভেতরে চলে গেল। ইতিমধ্যে মোমটা গলে গলে নিভে এসেছে। 'জ্বালানোর মতো আর মোম নেই' — অন্ধকারে হিমাদ্রি বলে উঠল। 'একই বিছানায় দুজনকে শুতে হবে। তোমার বোধহয় খুব অসুবিধে হবে।'

'তোমার এখানে আমি সুবিধের খোঁজে আসিনি' — শঙ্কর উত্তর দিল। আরও কিছু বলার জন্য সে মুখ খুলেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে সে মুখ বন্ধ করল। দুজনেই একই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হিমাদ্রির নাক ডাকতে লাগল। খুব সহজেই তারা ঘুমিয়ে পড়তে

পারে, এটাই শঙ্করের খুব ভালো লাগে। তার কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। কখনও বা সারা রাত উজাগরে কাটায়। হাজার হাজার অদৃশ্য বিষাক্ত পোকা যেন তার মগজে বাসা বেঁধেছে, ওদের দংশনে ছটফট করতে করতে সারা রাত পার হয়ে যায়। হিমাদ্রির বিছানা থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছিল। প্রথমে শঙ্করের খুব অস্বস্তি হতে লাগল। অনেকদিন বোধহয় বিছানা পরিষ্কার করা হয়নি। হয়তো সাবানের অভাব। সুন্দর জীবন যাপনের প্রয়োজন অনুভব করার জন্য যে উন্নত মানসিক চেতনার প্রয়োজন, তারও অভাব থেকে থাকতে পারে হয়তো। ঘুমানের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে করে হঠাৎ একবার শঙ্কর ভাবল, তার মতো এই বস্তিতে আর কেউ উজাগরে আছে কি? যদি আছে, তার মনে এখন কী চিন্তা খেলা করছে? 'ঈশ্বরের দয়ায় আগামীকাল মুটেগিরি করে যদি দুপয়সা বেশি পাওয়া যায়' — ঠিক এই ধরনের চিন্তা নিশ্চয় চিমুনির মনে খেলা করছে। সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শেষে একবোতল মদ গিলে শ্রান্ত পশুর মতো শুয়ে থাকা রহিম অথবা মনোহর — ওদের অবচেতনে হয়তো উত্তাল হয়ে উঠেছে কল্পিতা কোনো শয্যাসঙ্গিনীর সঙ্গে স্থূলতম দেহ সম্ভোগের বিকৃত কল্পনা। তরুণ মনের যে বিষণ্ণ মধুর প্রেমের আবেগ অর্ধ সুপ্ত দেহ চেতনায় অতিন্দ্রীয় রহস্যের জোয়ার আনে, তার লেশমাত্র অনুভূতি রহিমের জীবনে কখনও ঘটে না। যৌবনের বিচিত্র বেদনাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে হাজার বছর ধরে কত কাব্য রচিত হয়েছে, কত ছবি আঁকা হয়েছে, কিন্তু মানবাত্মার সেই শাশ্বত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল রহিম-মনোহরের দল। কোনো এমিলি ভিভিয়ানির প্রতি কবির সেই অপরূপ মধুর আবেগ তাঁদের রক্তাক্ত হৃদয় রসাপ্লুত করে তোলে না। ওদের কল্পনার দৌড় জুলির উরুদেশ পর্যন্ত। জুলি কী ভাবছে? ফাল্গুনের এই আশ্চর্য রাতে ঘরে যখন প্রদীপ জ্বলে উঠেছে, সোনার খাঁচায় পোষা টিয়াপাখি এবং দরজার মুখে প্রহরী শুয়ে পড়েছে, ধূপের ধোঁয়ায় বাসর গৃহ ধূসর এবং অগুরুর গন্ধে সারা দেহ আকুল দূর্বা-শ্যামল আঁচলটা উন্নত বুকে টেনে নিয়ে কোনো এক সুন্দরী যুবতি রাতের বিজন রাজপথে তাকিয়ে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে রইল। জুলি হল না কেন সেই যুবতি? কার প্রতীক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে ঘাম এবং রক্তে ভেজা ঠান্ডা বিছানায় সে মৃতদেহের মতো পড়ে রয়েছে। পাঁচুর বারো বছরের ছেলেটির নিমীলীত চোখের পাতায় কৈশোরের কী সোনালি স্বপ্ন নীরবে শুয়ে রয়েছে?

(২)

রাতের নীরব শ্মশানে দুর্গন্ধ শবের মতো পড়ে থাকা বস্তিতেও সকাল হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের চাঞ্চল্য দেখা দেয়। মানুষগুলোকে দেখার জন্য শঙ্কর দরজার মুখে বেরিয়ে এল। হিমাদ্রি তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। বস্তির মাথার খোলা জায়গাটিতে কুৎসিত চেহারার আধ-বয়সি মহিলা একজন স্নান করছে, বোধহয় চিমুনির পরিবার। দলবাহাদুরের ঘরের বারান্দায় তার সুন্দর চেহারার পরিবার নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। কিছুক্ষণ পরে হাতে কিছু নোঙরা বাসন পত্র নিয়ে পাঁচুর পরিবার বেরিয়ে এল। মহিলাটির সমগ্র মুখে বসন্তের দাগ, চোখের দৃষ্টি কুটিল। চিমুনির পরিবার যেখানে স্নান করছিল, সেখানেই বসে সে বাসন মাজতে শুরু করল। পুরুষরা বোধহয় কাজে বেরিয়ে গেছে। জুলির ঘরের দরজা বন্ধ। দেরি করে ওঠাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কালকের দেখা অসুস্থ বুড়োটা আগের জায়গায় একইভাবে শুয়ে রয়েছে। তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের কুৎসিত চর্মরোগ। সকালের সোনালি রোদে তার দেহের বিকৃতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে ফুটে উঠেছে।

ধূসর নীল আকাশে সূর্য উঠেছিল। বসন্তকালের উজ্জ্বল প্রভাত। মাঝে মধ্যে এক ঝাঁক ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগছিল। দুর্গন্ধ ভারাতুর দক্ষিণের বাতাস। বস্তির বসন্ত। বস্তির গায়ে লেগে থাকা হোটেলে রেডিও বাজছে। রবীন্দ্র সংগীত — 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার' দরজাটা খুলে জুলি বেরিয়ে এসে বারান্দায় কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল। সে একটা হলদে রঙের শাড়ি পড়ে রয়েছে। গায়ে একটা হাতকাটা ব্লাউজ। অনেক রাত করে ঘুমোনোর ফলে গাল দুটো এবং চোখদুটো শুকনো বলে মনে হচ্ছে। খোঁপাটা খুলে গিয়ে পিঠের উপর খসে পড়েছে। অবিন্যস্ত শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ক্লান্তির জড়িমা। বুকের স্তন দুটো উদ্ধত নয়, ছেলে মেয়ের মা হওয়া মহিলার মতো কিছুটা ঝুলে থাকা। চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যাশাহীন শূন্যতা। দেখামাত্র প্রথমে মনে হয় এইমাত্র যেন সে স্বামীর শয্যা থেকে এসেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করা গৃহবধূর মতো তার নমনীয় দেহভঙ্গিতে একটা সুবাসিত কোমলতা ফুটে উঠেছে। সূর্যের আলো তার ভাঁজে ভাঁজে ছিটকে পড়ল। কিছু সময় উৎকর্ণ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। বোধহয় গান শুনছে — 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার'।

কোনোদিনই না-দেখা একটা জিনিসের মতো শঙ্কর জুলির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ একবার দুজনেরই চোখে চোখ পড়ল। জুলি বিস্মিত হয়ে শঙ্করের মুখের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইল। বস্তির নতুন আমদানি। কিন্তু মুখের চেহারা এবং পরনের সাজপোশাক বস্তিবাসীদের মতো নয়। জুলির সংকোচবিহীন দৃষ্টিতে বিস্ময়বোধটা গভীরতর হয়ে উঠল। অবশেষে শঙ্কর তার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে

নিতে বাধ্য হল।

তখনই হিমাদ্রি ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে এল। দীর্ঘ হাই তুলে চোখদুটো কচলাতে কচলাতে সে শঙ্করের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল — 'তুমি অনেক আগেই উঠেছ নাকি।' তার পর শঙ্করের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে পায়খানার দিকে এগিয়ে গেল।

শঙ্কর একটা সিগারেট জ্বালাল।

জুলি ভেতরে ঢুকে একটা কেটলি এনে বারান্দায় মুখ ধুতে থাকা অবস্থায়, মাঝপথে চিৎকার করে উঠল ঃ 'বল্টু, বল্টু।' পাঁচুর ঘরের ভেতর থেকে বারো চোদ্দ বছরের একটি ছেলে চোখদুটো কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল। কালো, ক্ষীণ চেহারার ছোট একটি ছেলে। একমাথা চুল। হঠাৎ শঙ্করকে চোখের সামনে দেখে সে মুখ তুলে তাকাল, তারপর আবার মাথা নিচু করে আঙুল দিয়ে চোখের পিঁচুটি সরাতে লাগল। প্রত্যেকটি নতুন জিনিসের প্রতি কিশোর মনের যে স্বাভাবিক নির্মল বিস্ময়বোধ, সেটা তার মধ্যে নেই। এই বয়সে জীবনের ব্যাপক কুৎসিত অভিজ্ঞতা তাকে বৃদ্ধ করে তুলেছে। সংসারের প্রত্যেকের প্রতি তার গভীর অবজ্ঞা, বেপেরোয়া তাচ্ছিল্য।

মুখ ধোয়া শেষ করে জুলি শাড়ির আঁচল খুলে এক টাকার একটা নোট বল্টুর হাতে দিল। সে নীরবে কেটলিটা হাতে নিয়ে গলিটার দিকে এগিয়ে যায়। বোধহয় দোকান থেকে চা আনার জন্য। লুঙ্গির সামনের দিকটা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে হিমাদ্রি ঘুরে এল। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে সে বলল — 'চল দোকান থেকে চা খেয়ে আসি গে।'

চা খেয়ে হিমাদ্রি বাইরে তার কাজে চলে গেল। সিনেমা হলে একটি নতুন ছবি আরম্ভ হয়েছে, তার কাজ বেড়ে গেছে। শঙ্কর বাড়ি ফিরে এল। ঘরের ভেতরে দিনের বেলাতেই অন্ধকার। বাইরে বসে থাকারও উপায় নেই। দুর্গন্ধে থাকা সম্ভব নয়। দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, সময়টা কীভাবে কাটানো যায় সে বিষয়ে সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ঠিক তখনই বল্টুর উপর তার চোখ পড়ল। জুলির বারান্দায় ডুবুরির মতো চুপ করে বসে রয়েছে। শঙ্কর তাকে হাতের ইশারা করে ডাকল।

বল্টু এক লাফে শঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা লোভাতুর হাসিতে তার চোখজোড়া চকচক করে উঠেছে। কানটা শঙ্করের দিকে তুলে ধরে সে পা দুটো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্থির হয়ে রইল।

তার কাণ্ড দেখে শঙ্কর মনে মনে হাসল। তারপর বল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল ঃ 'এই তোর নাম কি?'

'বল্টু।'

'তোর ঘর কোনটা?' বল্টু আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিল।

'তোর বাড়িতে কে কে রয়েছে?'

'মা, বাবা, পল্টু আর আমি।'

'তুই লোকের বারান্দায় বসে আছিস কেন?'

বল্টু এবার তীব্র দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকাল। শঙ্করকে যেন সে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে। এইরকম একটা দর্পিত ভঙ্গি তার মুখে ফুটে উঠল। কিছু সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে সে শঙ্করকে ফিসফিস করে বলল ঃ 'চল, ভেতরে গিয়ে কথা বলি।' মৃদু হেসে শঙ্করও তার সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

হিমাদ্রির বিছানায় বসেই বল্টু শঙ্করকে সোজাসুজ জিজ্ঞেস করল — 'তুমি আমাকে কত দেবে বল?' শঙ্কর কিছুই বুঝতে না-পারার ভান করে উল্টে প্রশ্ন করল — 'তোকে আবার কী দিতে হবে?'

পাকা ব্যবসায়ীর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বল্টু উত্তর দিল — 'কিছু না দিলে কিন্তু আমি তোমাকে জুলির ঘরে ঢুকতে দেব না।' খুব বিস্মিত হওয়ার মুখভঙ্গি করে শঙ্কর বলে উঠল — 'আমি তো তোকে জুলির ঘরে যাব বলে বলিনি। জুলি আবার কে?' মুখটা হাঁ করে বল্টু কিছু সময় অবাক হয়ে রইল। সে যেন শঙ্করের কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করল — 'তাহলে তুমি আমাকে কেন ডেকেছিলে?'

শঙ্কর তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কিছু সময় মনে মনে চিন্তা করল। জীবিকা নির্বাহের কী চমৎকার পথ বেছে নিয়েছে এই চোদ্দ বছরের ছোট্ট শিশুটি। তার ব্যবসায়ের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথায় আগ্রহ নেই। বল্টুর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে শঙ্কর পুনরায় তাকে প্রশ্ন করল — 'তুই স্কুলে পড়েছিলি?'

'না, পড়িনি। কী বলতে চাইছ তাড়াতাড়ি বল, আমাকে যেতে হবে।' ব্যবসায়ের চুক্তি মনোমত হবে না বুঝতে পেরে বল্টু যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে শঙ্কর দেড় টাকা বের করে বল্টুর হাতে দিয়ে বলল — 'এক টাকা পঁচিশ পয়সার এক প্যাকেট গোল্ড ফ্ল্যাক সিগারেট নিয়ে আয়। বাকি পঁচিশ পয়সা তোর।'

বল্টুর মুখটা চট করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গভীর আনন্দ এবং বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সে শঙ্করের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বাছুরের মতো দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। করার মতো কিছু না থাকায় শঙ্কর বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে

পড়ল। কিছুসময় সেভাবে পড়ে থেকে, অর্থহীন চিন্তার বেড়াজালে অতিষ্ঠ হয়ে তার ব্যাগ থেকে টান মেরে একটা বই বের করে আনল। দু-এক লাইন পড়েই বইটা বন্ধ করে রাখল। তখনই সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে বল্টু ফিরে এল। তার মুখে একটা অবদমিত উত্তেজনার আভাস।

বল্টুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শঙ্কর প্রশ্ন করল — 'তোর কী হল? কিছু বলতে চাস কি?'

'জুলি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল।' বল্টু একটা দুর্বোধ্য হাসি হেসে উত্তর দিল।

'কী জিজ্ঞেস করেছিল?'

'তুমি কোথাকার মানুষ, আমার সঙ্গে কী কথা বলছিলে এইসব।' শঙ্কর বল্টুকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল। ঠিক তখনই দরজার সামনে একজন মানুষকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বল্টুও দরজার দিকে ঘুরে তাকাল। হঠাৎ তার মুখটা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল। চোখের পলকে সে মানুষটার গা ঘেঁষে দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

শঙ্কর অপরিচিত মানুষটার দিকে ভালোভাবে তাকাল। মানুষটা লম্বায় ছয় ফুটের মতো হবে। অতিরিক্ত নেশাখোর মানুষদের মতো চোখদুটো লাল। মুখের গড়নটা সুন্দর। ছোট ছোট দাড়ি গাল দুটো ঢেকে রেখেছে। মানুষটা বোধহয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। ঠোঁট দুটোতে নিভন্ত সিগারেটটা চেপে ধরে শঙ্করের দিকে কিছুক্ষণ অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর এক পা দু পা করে ভেতরে ঢুকে এসে, তাচ্ছিল্যের সুরে শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল — তুমি কে হে?'

শঙ্কর শোয়া থেকে উঠে বসল। নিজের পরিচয় কীভাবে দেওয়া যায়, সে কথা চিন্তা করে সে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ল। বিছানায় একপাশে সরে গিয়ে সে মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল — 'বস'।

মানুষটা বসে পড়ল। 'দিয়াশলাই আছে কি?' সে শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল। 'আমি ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুইনি। হিমাদ্রির কাছে দিয়াশলাই চাইতে এসেছিলাম।' শঙ্কর দিয়াশলাইটা তার দিকে এগিয়ে দিল। সিগারেটটা জ্বালিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে পুনরায় শঙ্করকে জিজ্ঞেস করল — 'তোমাকে তো আগে কখনও এখানে দেখিনি। কোথা থেকে এসেছ তুমি?'

'আমি এখানে নতুন এসেছি। তুমিও এখানে থাক নাকি। শঙ্কর নিজের পরিচয় প্রসঙ্গ পরিহার করার উদ্দেশ্যে মানুষটাকে প্রশ্নটা ফিরিয়ে দিল।

'বেড়াটার ওপাশেই আমি থাকি। আমার নাম জয়, বুঝেছ? জয় বললে এখানে চেনে না এমন কেউ নেই।'

'এখানে এসেই আমি তোমার কথা শুনেছি। খুব ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। কী কর তুমি?'

'কিছুই করি না। সংসারে অনেক মানুষই নিজের হাতে কিছু না করে সুখে জীবন যাপন করে। আমিও তাই করায় কী আপত্তি থাকতে পারে? দাঁড়াও, আমি মুখ ধুয়ে আসছি। পরে কথা বলব।'

জয় বেরিয়ে গেল। জয়ের বেরিয়ে যাবার দিকে শঙ্কর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। এক একটি মানুষ যেন জীবনের একটি অজ্ঞাত রহস্যের প্রতীক। মানবাত্মার কত বিচিত্র আকৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে কত বিচিত্র ধরনে প্রকাশ পায়। এই অন্ধকার বস্তির পঙ্কিল আবর্জনার মধ্যে বসে পড়া বিশাল দেহ, শক্তিমান এই মানুষটি জীবনের চরম পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে নিজের 'গুন্ডা' পরিচয়ে। তাকে সবাই ভয় করে। প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, ভয়। ভয়ে তাকে হোটেলে বিনে পয়সায় ভাত খেতে দেয়। দোকানি সিগারেট ধারে দেয়, দেহোপজীবীনি দরজা খুলে দেয়। কিন্তু জীবনের সৌন্দর্যের যে মণিকূট, মানুষের সুন্দর হৃদয়, তার রুদ্ধ দরজার চাবি কাঠি তার হাতে নেই। কোনো একদল জালিয়াত প্রতারক জয়দের হাত থেকে সেই চাবিকাঠি আত্মসাৎ করে লুকিয়ে রেখেছে।

এই পর্যন্ত শঙ্কর মনে মনে ভাবল — এই নরকের বিচিত্র অধিবাসীদের জীবনের বাইরের রূপটা সে বোধহয় দেখে শেষ করেছে।

কিন্তু এহো বাহ্য।

(৩)

শঙ্কর সারাটা দিন ঘরের ভেতর বসে রইল। মণিমালার খবর সে পেয়েছে। এই বস্তির মাথায়, নিম্ন মধ্যবিত্তের ঠুনকো ভদ্রতা বাঁচিয়ে কিছুটা দূরে সরে থাকা ঘরটা মণিমালার। হিমাদ্রির হিসেব ওরা বস্তিবাসী নয়, সীমান্তের অধিবাসী। গত চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে সে একটি নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছে। সেই জগতে জীবনের চালিকা শক্তি প্রেম নয়, সৌন্দর্যবোধ নয়, মানবীয় সম্পর্কের পবিত্রতা নয়, তা হল ক্ষুধা, আদিম অরণ্যচারী মানব-পশুর ক্ষুধা। পেটের ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা। জীবিকার তাড়নায় সেখানে পিতা সন্তানকে দেহোপজীবীনির দালালের কাজে নিয়োগ করে, স্বামী-স্ত্রীর অতিরিক্ত উপার্জনের আশায় মুখ চেয়ে থাকে, বেশ্যা এবং গৃহবধূ পাশাপাশি বাস

করে।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। মণিমালাকে খুঁজতে এসে সে আবিষ্কার করেছে তার জীবনের পরিপার্শ্ব। মণিমালাকে সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল পাণ্ডুতে, তখন অসমে দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীর স্রোত বইছিল। সেই স্রোতে ভেসে এসেছিল মণিমালা, তার পিতা এবং ছোট ভাই। শঙ্কর তখন একটি দৈনিক সংবাদ পত্রের সহকারি সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। শঙ্করের বন্ধু, একজন রেলওয়ে কর্মচারীর ঘরে এসে মণিমালার আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সূত্রেই দুজনের চেনা-পরিচয়। দুদিনের মধ্যে সেই পরিচয় গভীর প্রণয়ে পরিণত হয়।

মণিমালার বাবা বৃদ্ধ হয়েছিলেন, দীর্ঘদিন অ্যাজমায় ভুগে ভুগে তিনি কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। ভাই একেবারেই ছোট। একমুঠো ভাত জোগাড়ের তাদের কোনো উপায় ছিল না। মানুষের বাড়িতে চিরকাল খাওয়াও সম্ভব নয়। মণিমালা শঙ্করের কাছে একটা উপায় চাইল।

কোনো উপায় নেই। শঙ্কর চিন্তা করে দেখল, কোনো উপায়ই নেই। সরকার থেকে তারা কিছু টাকা ধার হিসেবে পেতে পারে, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা কে করবে। বসে খেলে সে টাকায় কতদিন আর চলবে? মণিমালাকে যদি সে বিয়ে করে, তাহলে মণিমালার বাবা আর ভাইয়ের দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। তার বর্তমান অবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের সুদিনের অপেক্ষা করে থাকার বাইরে তার আর কিছু করার নেই।

অনেক ভেবে চিন্তে শঙ্কর মণিমালাকে বলল — 'আমার যা কিছু সামান্য সঞ্চয় রয়েছে, তার থেকেই কিছু টাকা তোমাদের দিচ্ছি। কিছুদিন তা দিয়েই চেষ্টা কর। ইতিমধ্যে আমি কী করতে পারি দেখছি।'

'তোমার দয়ার দানের উপর আমরা কতদিন নির্ভর করে থাকব শঙ্কারদা? এক অর্থহীন অভিমান গোপন করার চেষ্টা করে মণিমালা উত্তর দিল — 'তার চেয়ে কিছু বিষ জোগাড় করে এনে দিতে পার না?'

মণিমালার চাওয়া বিষভাণ্ড হাতে নিয়ে সেই সময় উপস্থিত হল নিরঞ্জন। তাদের আশ্রয়দাতা রেলওয়ে কর্মচারীর ছেলে। সেও মরিয়নিতে রেলে চাকরি করে। সমস্ত পরিস্থিতিটা ভালো করে বুঝে নিয়ে সে একদিন প্রস্তাব দিল — 'মণিমালারা যদি তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়, তাহলে সরকার থেকে প্রাপ্ত ধারের টাকায় সে জোড়হাটে তাদের জন্য একটা পান-সুপুরি এবং মুদির দোকান দিয়ে দিতে পারে। বুড়ো বসে বসে দোকানের দেখাশোনা করতে পারবে। গ্রাহককে জিনিস পত্র দেওয়ায় ছেলেটি সাহায্য

করতে পারবে। অনেক ভেবেচিন্তে মণিমালা নিরঞ্জনের প্রস্তাবে রাজি হল।

শঙ্কর যথাসময়ে কথাটা জানতে পারল। মণিমালার সঙ্গে দেখা করে সে বলল — 'অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা অস্বীকার করে তুমি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু জীবিকার জন্য মেয়েদের সবরকমের শ্রম সব সময় শ্রদ্ধেয় নয়, সে কথা মনে রেখ। কখনও যদি সেরকম কোনো অবস্থার সম্মুখিন হও, আমাকে জানিও। আমি নিশ্চয় তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব।'

নিরঞ্জনের সঙ্গে মণিমালারা চলে গেল। তারপর প্রায় একবছর পার হয়ে গেছে। এই একবছরের মধ্যে শঙ্কর মণিমালাকে কয়েকটি চিঠি লিখেও কোনো জবাব পায়নি। চিঠি অবশ্য নিরঞ্জনের মারফৎ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শঙ্করও বেকার। চট করে একটা নতুন চাকরি জোগাড় করাও বেশ কঠিন। সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করার মতো বয়সও আর নেই। সে চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে লাগল। কোনো উপায় নেই। হঠাৎ তার মণিমালার কথা মনে পড়ল। সে পুরুষ হয়েও এরকম দিশাহারা হয়ে পড়েছে। বেচারি মেয়ে হয়ে তাহলে কীভাবে দিন গুজরান করছে। নিরাশ্রয়া রূপসী যুবতির জন্য নিরঞ্জনের মনে হঠাৎ পরোপকারের ব্রত জেগে ওঠার মূলে যে প্রবৃত্তি কাজ করছিল তা শঙ্করের অজানা নয়। কিছু হোক বা না হোক, মনের কৌতূহল তো মিটবে — সে কথা ভেবেই শঙ্কর মণিমালাকে একবার দেখে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

মরিয়নিতে এসে সে প্রথম নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করল। নিরঞ্জন মণিমালার নাম শুনেই ঘৃণায় নাক কুঁচকে নিল। 'এইসমস্ত মেয়েদের আসল স্বরূপ বোঝা বেশ কঠিন, বুঝেছ শঙ্করদা? ওদের মঙ্গল চেয়ে পরিচিত বন্ধু একজনের বাড়িতে নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বন্ধুরই আশ্রয়ে একটা দোকান খুলে দিলাম। দুদিনের মধ্যেই দোকান একেবারে দেউলিয়া করে দিয়ে ও একেবারে সহজে পয়সা রোজগারের আসল ব্যবসায়ে নেমে পড়ল। আমি ঠিক করে দেওয়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন বিখ্যাত একটা গলিতে গিয়ে ঘর নিয়েছে। মাঝখানে একবার খবরাখবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। বেরিয়ে এসে একটা কথা পর্যন্ত বলতে চাইল না।'

মণিমালার ওপরে আরও অনেক বিষোদগার করে নিরঞ্জন ক্ষান্ত হল। কিন্তু এ কথাটা সে ভুলেও বলল না যে তার বন্ধুটি কীসের বিনিময়ে মণিমালাকে নামমাত্র ভাড়ায় ঘর ভাড়া দিতে রাজি হয়েছিল। উপকারি বন্ধুর ছদ্মবেশে সে নিজে কীভাবে মণিমালার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কিন্তু শঙ্কর সমস্ত কিছুই বুঝতে পারল।

নিরঞ্জনের কাছ থেকে মণিমালাদের ঠিকানা নিয়ে সে জোড়হাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

(৪)

জোড়হাটে শঙ্করের একজন বন্ধু ছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে নিরঞ্জনের বর্ণনা অনুসারে মণিমালাদের বস্তিটা খুঁজে বের করল। কিন্তু যখন সে বন্ধুকে নিয়ে নির্দিষ্ট গলির ভেতর প্রবেশ করল, বন্ধুটি রাস্তার দুপাশে বিব্রতভাবে তাকিয়ে তাকে বলল — 'আমাকে মাফ কর ভাই। তুমি জোড়হাটে নতুন এসেছ, তাই তুমি কিছুই জান না। কিন্তু এই দিন দুপুরে মানুষ আমাকে এই গলির ভেতর দিয়ে যেতে দেখলে অন্য কিছু ভেবে নেবে।'

শঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। মণিমালা এরকম একটি বস্তিতে বসবাস করে, যেখানে মুক্ত দিনের আলোয় কোনো ভদ্র মানুষ যেতে ইতস্তত করে। কী রয়েছে সেই বস্তিতে? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে একটা সংকল্প গ্রহণ করে নিল। সে একাই সেখানে যাবে। কেবল মাত্র যাওয়াই নয়, সেই নরকের অন্ধকার যবনিকা ভেঙে তার ভেতরটা সে ভালোভাবে দেখবে। মনে মনে সে একটা রহস্যময় অ্যাডভেঞ্চার আর উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। সেই বন্ধুর সাহয্যে সে হিমাদ্রিকে খুঁজে বের করল।

মণিমালাও আজ এই বস্তিরই একটা অংশ।

শঙ্কর জুলিকে দেখেছে, দলবাহাদুরের পরিবার লক্ষ্মীকে দেখেছে, পাঁচুর ছেলে বল্টুকে দেখেছে — আর জয়-রহিম-মনোহর, ওদেরকেও দেখেছে। মণিমালাও আজ জুলি হয়ে গেছে? তার প্রতি মনে মনে শঙ্কর একটা তীব্র বেদনামিশ্রিত ঘৃণা অনুভব করতে লাগল। সে তো তাকে এই পাপ আর পতন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার জন্য মণিমালা এখানে ছুটে এসেছিল। এখন সে নিজে পরিশ্রম করে পেটেরে ভাত জোগাড় করছে যেভাবে জুলি নিজের পরিশ্রমে বেঁচে রয়েছে। প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিরই নিজের কপালের ঘাম মাটিতে ফেলে রোজগার করা উচিত। শ্ব তো ঠিকই বলেছিলেন — 'মেয়েদের জন্য অন্য সমস্ত ব্যবসায়ের পথ বন্ধ বলেই তাদের অনেকেই বাধ্য হয়ে দেহের ব্যবসা করে। তাহলে আমরা তাঁদের ঘৃণা করি কেন?' অনেক চিন্তা করে শঙ্কর তার একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছে। আমরা তাদরে ঘৃণা করি, এই জন্য নয় যে তারা দেহোপজীবীনি। আমরা আসলে তাদের ভয় করি, যেভাবে একজন বিকলাঙ্গ কুৎসিত মুখের মানুষ আয়নার দিকে তাকাতে ভয় করে। ওরা আমাদের কাছে এক একটি আয়নার মতো। সেখানে

আমরা নিজেদের আত্মার কুৎসিত রূপ দেখতে পাই, বহু শতাব্দীর সভ্যতার পরেও আজ পরিমিত অসম্পূর্ণ হয়ে থাকা এবং জোড়াতালি দেওয়া যৌন নীতিবোধের দ্বারা সৃষ্ট সমাজ-মানসের ভীতি এবং সংশয়ের নগ্ন রূপ।

দিনের আলোতে তুমি ওদের কাছে আসতে ভয় করলে কেন বন্ধু? ওদের একমাত্র অপরাধ — দারিদ্র্য। বেঁচে থাকাটাই প্রথম কথা। এই ঘৃণ্য মানুষগুলো যা করছে বেঁচে থাকার জন্যই করছে। ঐশ্বর্য নামে জিনিসটা পালিশের মতো সমস্ত নৈতিক কদর্যতা ঢেকে দিতে পারে। হাজার হাজার বিত্তবান এবং সংস্কৃতিবান মানুষ যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অন্যান্য নৈতিক অপরাধের পাপকুণ্ডে সবসময় ডুবে থাকে, কিন্তু বাইরে ঐশ্বর্যের পালিশ থাকর জন্য তোমার চোখ সেসব দেখতে পায় না। কিন্তু এই হতভাগ্যদের পেটে যেমন ভাত নেই, গায়ে কাপড় নেই, জীবনের কোনো কাজে সেরকম আব্রু নেই।

হিমাদ্রি শঙ্করকে জুলির গল্প বলছিল। সে ছিল গোলাঘাটের কোনো এক মুসলমান গ্রামের মেয়ে। নাম জুলেখা। পিতৃ-মাতৃহীন মেয়ে, মামার বাড়িতে বড় হয়েছে। রহিম ছিল ওদের বাড়ির রাখাল। মৈমনসিঙের। যথাসময়ে তারা দুজনেই দুজনের প্রতি আসক্ত হল। জুলেখার প্রতি মামাদের কোনো স্নেহ ভালোবাসা ছিল না। মামি তার উপর দস্তুর মতো অত্যাচারই করত। কিন্তু তা বলে বাড়ির রাখালের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। একদিন রাতে রহিম জুলেখাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। কিছু দিন এখানে ওখানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াল। প্রথম কিছু দিন চেষ্টা করার পর মামারাও হাল ছেড়ে দিল। একদিন রহিম এসে এই বস্তিতে হাজির হল। রহিম একটা রিক্সা জোগাড় করে নিল। এখন জুলি থাকা ঘরটিতেই রহিম আরম্ভ করেছে তাদের নতুন জীবন।

বস্তিতে পা রেখেই জুলেখা ঘৃণা এবং আতঙ্কে শিউরে উঠল। রহিম তাকে এ কোন নরককুণ্ডে নিয়ে এসেছে। পরের বাড়িতে বড় হওয়া মা-মরা মেয়ে হলেও জুলেখা গ্রামের মেয়ে। পৃথিবী মানে সে জানে বিশাল নীল আকাশের নিচের সীমাহীন ব্যাপ্তি, অরণ্যের সবুজ বিস্তার, দৃষ্টির এবং কল্পনার অনন্ত মুক্তি। অহরহ বৃহতের সঙ্গে তার সহজাত যোগাযোগ। ভোরে আকাশে বিশাল সূর্য ওঠে, গোধূলি রক্ত সমুদ্রে সূর্য অস্ত যায়। চোখের আওতায় না-পড়া দূর থেকে বাতাস বয়ে আসে, বিকেলে, মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়ালে ওপাশের গ্রাম গঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু সেই অন্ধকার দীর্ঘ গলিটা পার হয়ে বস্তিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জুলেখার মনে হল — সে যেন বাইরের পৃথিবীটা দূরে কোথাও ফেলে এসেছে। চারপাশে লম্বা লম্বা ঘর এবং ইটের

দেওয়াল ঘিরে রাখা এই দুর্গন্ধময় বস্তি থেকে মাথা তুলে তাকালে আকাশটা কেমন যেন মনে হয়, চারপাশে যেদিকেই তাকানো যায় দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, গোটা বস্তিটা যেন একটা জেলখানা।

ধীরে ধীরে জুলেখা আরও অনেক বিপদের সম্মুখিন হল। দুপুরে খাবার সময়টুকু ছাড়া রহিম বাইরেই থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নড়াচড়া করতে না পারা ছোট ঘরটিতে তাকে ঘুপটি মেরে বসে থাকতে হয়। করার মতো কোনো কাজ নেই। প্রতিদিন ভিক্ষা করে প্রাণ রক্ষাই যার জীবন, তার আর করার কী থাকতে পারে? ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম সমষ্টিই মানুষের জীবন। কিন্তু যার সবগুলো ইন্দ্রিয়কে নিশ্চেষ্ট করে থাকতে হয় তার কাছে জীবনের মূল্য কী? এই বস্তিতে মানুষের চোখ আর কান সবসময় উপবাসী হয়ে থাকে। দুয়েকটা কথা বলে সময় কাটাতেও জুলেখার ভয় হয়। তা ছাড়া সে তাদের ভাষাও বুঝতে পারে না। করার মতো কোনো কাজ না থাকায় হাত দুটো, আর হেঁটে বেড়ানোর মতো বিন্দুমাত্র জায়গা না থাকায় পা দুটো ক্রমশ অচল হয়ে পড়তে চায়। অসহ্য বিরক্তিতে জুলেখার মন পাগল হয়ে যেতে চায়। যে কোনো মানসিক বা শারীরিক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ এক প্রকার মুক্তির চেতনা লাভ করে। সেই উপলব্ধির স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে মন যে-কোনো অন্ধকার পথ বেছে নেয়। সারাটা দিন অসীম আগ্রহে জুলেখা রহিমের আসার অপেক্ষা করে থাকে। সেই সম্ভোগের তীব্রতার মধ্যেই সে অবশেষে অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পায়।

ধীরে ধীরে সে মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। প্রথম অবস্থায় ভাবের আদান প্রদানে সে যথেষ্ট অসুবিধে অনুভব করছিল। হিন্দি বা বাংলা না জানাটা তার একমাত্র কারণ নয়। এখানকার পুরুষ-মহিলা, ছেলে-বুড়ো প্রত্যেকেই এরকম একটি বক্রোক্তি পূর্ণ বিশেষ অর্থজ্ঞাপক ভাষার কথা বলে যে ভাষায় কোনো শব্দই অনুচ্চারণীয় নয় — যে ভাষায় নিজেকে সব সময় ব্যক্ত করার জন্য ব্যক্তিত্বের আমূল সংস্কার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপে — পাঁচুর পরিবার প্রথম তাকে যখন বলেছিল 'ওই যে হোটেলটা দেখছিস, তার ম্যানেজার কুড়ি টাকা দেবে বলেছে। তুই যদি রাজি থাকিস আমি আজকেই খবর দেব। জুলেখা এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সাংকেতিক ভাষার একটি শব্দও বুঝতে না পেরে পাঁচুর পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনেক দিন পরে সে অবশ্যে বুঝতে পেরেছিল যে এই বস্তিতে এই ধরনের সাংকেতিক ভাষা একটি পাঁচ বছরের শিশুও বুঝতে পারে।

ধীরে ধীরে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বস্তির প্রতিটি ঘরে তার সম্পর্কে

আলোচনা হতে লাগল। তার রূপের প্রশংসা ধ্বনিত হল। প্রয়োজন অপ্রয়োজনে যুবকরা তার ঘরে উঁকি মারতে লাগল। কিন্তু জুলেখা প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, এ কথা সে নিজে একদিন আশ্চর্যজনকভাবে জানতে পারল। বিকেলের দিকে সে স্নান করছিল। বস্তিতে আসার পরে তার একটা শিক্ষা হয়েছে যে — এখানে মেয়েদের দেহের লজ্জা বা শালীনতাবোধ বলতে কিছুই নেই। গ্রামে মেয়েরা মুক্ত আকাশের নীচে মনোহর প্রকৃতির পর্দার আড়ালে স্নান করে। শহরে ধনীর ঘরের মেয়েদের স্নান করার জন্য সৌখিন স্নানগার আছে। কিন্তু বস্তির মেয়েদের — যার থাকার মতো ঘর নেই — তাদের প্রত্যেকের চোখের সামনে মান সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে স্নান করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। স্নান করার সময় জুলেখা পিঠের উপর কিছু একটা খসে পড়া অনুভব করল। জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখে একটা দশ টাকার নোট। সে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, হোটেলের উপর তলার জানালায় একটি মুখ। তাকে উপরের দিকে তাকাতে দেখে মানুষটা মুখে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করে জানালার সামনে থেকে সরে গেল।

জুলেখা স্পষ্ট অনুভব করল, তাকে কেন্দ্র করে চারপাশে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। তার মনুষ্যত্বের অধিকার পিষে গুড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সেই ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। তার একমাত্র কারণ এই নয় যে সে রূপবতী। তার কারণ দরিদ্রতা। ঐশ্বর্য যেন একটা অস্ত্র। তা যখন বর্বরের হাতে পড়ে, মানবতার সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন না-করা পর্যন্ত তা ক্ষান্ত হয় না। সেদিন রাতে রহিমের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জুলেখা তাকে সমস্ত কথা বলে। 'চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। কোনো এক গ্রামে কারও বাড়িতে হালের চাকর হয়ে থাকব। তাও বরং ভালো। এটা মানুষের বসবাস করার উপযুক্ত জায়গা নয়। তোমার কখন কী অঘটন ঘটে যায় বলে আমি ভয় করছি।' জুলেখা খুব আশা করছিল, আর কিছু না হলেও রহিম তাকে অন্তত কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে রহিম পাশ ফিরে গজগজ করে উঠল — 'শোবার সময় মিছামিছি কী বিড়বিড় করছিস। কাম কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি তোকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিলেই খাবার জুটবে নাকি? ভালোই তো হয়েছে। তোর নিজের রোজগার তুই নিজেই কর।'

এই আকস্মিক রূঢ় আঘাতে জুলেখার সমস্ত শরীর টনটন করে উঠল। রহিম প্রতিদিন রাতের বেলা মদ খেয়ে আসে। মদের নেশায় তার চরিত্রে সন্দেহ করে রহিম যদি তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করত, তাহলেও সে সুখি হতে পারত। কিন্তু এই নিরুত্তাপ, নিগ্রহ, ঔদাসীন্য এ যে তাদের দুজনের মধ্যে একটি অনতিক্রম্য দূরত্বের ইঙ্গিত। তার

জীবনের শেষ বন্ধনটাও আজ ছিঁড়ে গেল। তার পরিবার হয়েও সে যা খুশি তাই করতে পারে? এই বস্তিতে মানবীয় সম্পর্কের পবিত্রতারও কোনো মূল্য নেই? জুলেখার দুইচোখ দিয়ে গরম জলের প্রবাহ নেমে এল। সেটাই তার জীবনের শেষ চোখের জল।

অন্য অনেক কথা না জানার মতো জুলেখা এই কথাটাও জানত না যে রহিম এই বস্তিতে আসার পর থেকে কোনো দিন জুলেখাকে ঠিক পথে চলা বলে বিশ্বাস করেনি। জীবনের এই কাঠামোর মধ্যে ঠিক পথে চলাটাই অস্বাভাবিক। দলবাহাদুরের পরিবার লক্ষ্মীর কথা কে না জানে? দলবাহাদুর নিজেও জানে। কিন্তু নিজ চোখে না দেখতে পেলেই তারা সন্তুষ্ট। সর্বক্ষণ দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে এবং পেটের চিন্তায় ব্যস্ত থেকে ওদের অনুভূতিগুলো এত ভোঁতা হয়ে গেছে যে প্রেমের ক্ষেত্রেও ঈর্ষা করার জন্য ওদের অন্তর কোনো ধরনের উৎসাহ বোধ করে না।

রহিমের কাছে সেই রাতের স্বীকারোক্তি করার পরে, কয়েকটি দিন গতানুগতিকভাবে পার হয়ে গেছে। আজকাল স্নান করতে গেলেই নিজের অজ্ঞাতসারেই তার চোখ চলে যায় সেই জানালার পাশে, প্রতিদিনই দেখতে পায় অশ্লীল হাসির সেই পরিচিত মুখটা। পাঁচুর পরিবার প্রতিদিন এসে হোটেলের ম্যানেজারের সেই প্রস্তাবটা উত্থাপন করে। রহিমের অবর্তমানে সবসময় একটি যুবক ছেলে কাছে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, কাপড় টানাটানি করার চেষ্টা করে। তার নাম জয়। জুলেখা রহিমকে বলে দেবে বললেও ভয় করে না। চিৎকার করে আশেপাশের লোকদের সাহায্য চাওয়ারও কোনো উপায় নেই — আশেপাশের লোক বলতে তো পাঁচুর পরিবার, লক্ষ্মী আর সেই অসুস্থ বুড়ো মানুষটি।

একদিন বিকেলে জয় এভাবেই জুলেখার পাশে বসেছিল। কিছু সময় কথাবার্তা বলার পরে সে হঠাৎ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে জুলেখার হাতটা টান মেরে নিয়ে তার মধ্যে গুঁজে দিতে চেষ্টা করল। ঠিক তখনই দরজার মুখে এসে উপস্থিত হল রহিম। বাইরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, সে তার ছাতাটা নিতে এসেছিল। জয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জুলেখাকে দেখে রহিম কিছুসময় দরজার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জুলেখা কম্পমান হৃদয়ে আসন্ন প্রলয়ের মুহূর্ত গণতে শুরু করল। প্রলয় ঠিকই এল, কিন্তু একেবারে অভাবিতরূপে। নাটকীয় ভঙ্গিতে শরীরটা ঝাঁকিয়ে এক পা এগিয়ে এসে রহিম জয়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল — 'জয়, খুব মনে ধরেছে নাকি তোর? ইচ্ছা হলে তুই ওকে রাখতে পারিস। আমার বিরক্তি ধরে গেছে।' এ কথা বলে সে ছাতিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। জয় কিছুসময় নীরব হয়ে রইল। তারপর টাকা দশটা মাটিতে ফেলে রেখে, জুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দুর্বোধ্য হাসি হেসে সেও বেরিয়ে গেল।

জুলেখার মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ঘুরেছে বলে মনে হতে লাগল। তার চোখের সামনে সমস্ত জিনিসই যেন প্রবলভাবে ঘুরতে শুরু করেছে। চোখদুটো বুজে কিছুসময় সে চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলেই সে মাটিতে পড়ে থাকা দশ টাকার নোটটা দেখতে পেল। ছিঁড়ে ফেলবে বলে নোটটা থাবা মেরে নিয়েই হঠাৎ সে চুপ করে গেল। 'ইচ্ছা হলে তুই ওকে রাখতে পারিস। আমার বিরক্তি ধরে গেছে।' কাপুরুষ। নপুংসক। নিজের স্ত্রীর শরীরে অন্যকে হাত দিতে দেখেও চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। ওর মুখে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিতে পারল না। এরপরে আমাকে তোমার পরিবার বলার আর কী অধিকার আছে? নোটটা হাতের মুঠিতে পাকাতে পাকাতে জুলেখা এক জায়গাতেই বসে রইল।

সেদিন রাতে রহিম তাড়াতাড়ি ফিরে এল। ফিরে এসেই কোনো কথাবার্তা না বলে সে নিজের জিনিসপত্র গুলো পাশের মনোহরের ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। জুলেখা নীরবে তার কাজকর্ম দেখতে লাগল। জিনিসপত্র গুলো বয়ে নিয়ে যাবার পরে রহিম তার কাছে এসে বলল' — 'ঘরটা তোকে ছেড়ে দিয়ে গেলাম বুঝেছিস? তা বলে সম্পর্কটা পুরোপুরি মুছে ফেলিস না। মাঝে মধ্যে তোকে আমার দরকার হবে।'

সারাটা রাত জুলেখা এক জায়গাতেই বসে রইল। পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মানুষেরা দেখল, রহিম জুলেখাকে ছেড়ে দিয়ে মনোহরের ঘরে উঠে গেছে। একটি সংসার ভেঙে যাওয়ার মতো এরকম একটি মর্মন্তুদ ঘটনাতেও কাউকে বিচলিত হতে দেখা গেল না। এর চেয়ে স্বাভাবিক কথা যেন পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। প্রত্যেকেই কথাটা সে ভাবেই গ্রহণ করল। আসলে তাঁদের প্রত্যেকেই আপন অভিজ্ঞতা পুঞ্জ কল্পনার দ্বারা এই কথা ধরে নিয়েছিল যে রহিম জুলেখাকে কোনো কদর্য জায়গা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে পাঁচুর মা মন্তব্য করল — ঈশ্বর যা করেছে, ভালোই করেছে, জুলেখার যা রূপ, দুদিনেই সে টাকার পাহাড়ে বসবাস করতে পারবে। জুলেখা কারও কথায় কান না দিয়ে রাতের মতোই সারাটা দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে এক জায়গায় বসেই কাটিয়ে দিল। তার চিন্তাশক্তি একেবারে অসাড় হয়ে পড়ল। সেদিন রাতে দরজা খুলে তার ঘরে যে মানুষটা প্রবেশ করল, সে তার সমাজ বিহিত স্বামী নয়, তার সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য হলেও তার যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হল, তা কোনো মানবীয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

হাতের মুঠিতে ভিজে নষ্ট হতে চলা দশ টাকার নোটটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে

রেখে জুলেখায় বিছানায় উঠে গেল।

মণিমালা শঙ্করকে এক পেয়ালা চা এনে দিল। কপালের ঘাম মাটিতে ফেলে উপার্জন করা ধনে তুমি অতিথির মুখের সামনে এক কাপ চা তুলে ধরেছ। ঘাম নয়, রক্ত। যে রক্তে মানবাত্মার উত্তরাধিকারীর সৃষ্টি হয়। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ। খেতে না পেয়ে তুমি মরে যাওনি। তুমি বেঁচে আছ। বেঁচে থাকাটাই প্রথম কথা। পুরুষের মতো মহিলাদের জন্যও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র থাকলে, মহিলাকে কেবল মাত্র প্রজননের যন্ত্র বলে না ভেবে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই সম্মান এবং স্বাধীনতা দেওয়া হলে — তুমিও সৌন্দর্য প্রণোদিত পথে নিশ্চয় জীবন নির্বাহ করতে পারতে। না খেয়ে আত্মহত্যা করার চেয়ে বা কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট ভোজন করার চেয়ে নিজের দেহের শ্রমে বেঁচে থাকা অনেক ভালো মণিমালা।

মণিমালার প্রতি কিছুক্ষণ আগে জেগে ওঠা ঘৃণা এবং বিরক্তি মন থেকে দূর করে, শঙ্কর দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

মণিমালা এখনও আগের মতোই সুন্দর। দুঃখ কষ্ট সেই সৌন্দর্যকে খুব একটা মলিন করতে পারেনি। তার মুখের পুঞ্জিত বিষাদ বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের মতো তাকে আরও বেশি মদির করে তুলেছে। শঙ্কর কিছু সময় তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এবার সে দেখতে পেল, তার মসৃণ গাল দুটিতে অনেক পুরুষের নির্লজ্জ চুমোর দাগ, অনেক পশুর হিংস্র আঁচড়। সে স্পষ্ট দেখতে পেল, তার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এভাবেই তিলতিল করে তার যৌবন একদিন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে, জীবনের সৌন্দর্য, প্রেম আবেগ সমস্তই তার অজ্ঞাত থেকে যাবে। তার মতো কত হাজার রিফিউজি মেয়ে হয়তো জীবিকার তাড়নায় এভাবে নরকের পথে নেমে গেছে, আর সেই হাজার যুবতিকে বাজারের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে স্থাপিত হয়েছে একটি ধর্মরাষ্ট্র। মণিমালাদের দল যখন দশটা টাকার বিনিময়ে বর্বর কামুকের দেহভারে মথিত হয়ে আর্তনাদ করে উঠে, সেই আর্তনাদ পাকিস্তানের একটি মসজিদেরও আজানকে স্তব্ধ করে দেয় না কি? বখরিদের দিন বিনা বাধায় গরু বলি দেবার অধিকার পেয়েই একটি রাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষ একদিনেই ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র হয়ে উঠে কি? শঙ্করের চোখের সামনে হঠাৎ সভ্যতার ইতিহাসের করুণতম ট্র্যাজেডিটি মণিমালার মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হয়ে উঠে।

এত কী ভাবছ শঙ্করদা? আসার পর থেকেই দেখছি গুম মেরে বসে আছ। মণিমালা প্রথমে বলল।

শঙ্কর একটা উদাস হাসি হাসল। তাই তো, এই পর্যন্ত সে মণিমালাকে কুশলবার্তা

পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু কী ই বা জিজ্ঞেস করার আছে? 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' 'তোমাদের দেখতে এলাম মণি, ভালোই আছ দেখছি।' শেষপর্যন্ত সে জিজ্ঞেস করল।

'ভালোই আছি'। কথাটার প্রতিধ্বনি করল মণিমালা। 'নিশ্চয় ভালো আছি। তুমি কী দেখতে পাবে বলে আশা করে এতটা পথ দৌড়ে এসেছ? বোধহয় ভেবেছিলে, পথে পথে আমি ভিক্ষা করে ফিরছি।' শেষের কথায় কিছুটা শ্লেষ জুড়ে দিল মণিমালা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না। সেদিন একটি হোটেলে এভাবে ঘুরে বেড়ানো দুটি সিন্ধি শরণার্থী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একটা আবেদন পত্র হাতে নিয়ে তারা মানুষের কাছে পয়সা চেয়ে বেড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, তারই একজন ম্যানেজারের সঙ্গে তার শোবার ঘরে ঢুকে গেল। রাস্তার যুবতি ভিখারিণী ভদ্রলোকের শোবার ঘরে। তার উপর একেবারে দিনের আলোতে। ভিক্ষা বৃত্তিরও আজকাল অনেক সংস্কার হয়ে গেছে বোধহয়।'

'ছিঃ শঙ্করদা। এরকম জঘন্য কথা তুমি আমার সামনে উত্থাপন করার অর্থ কী? আমাদের দেখতে এসেছ ভালো করেছ। কিন্তু এভাবে আমাকে অপমান করার কারণ কী?'

মণিমালার মুখটা অপমানে লাল হয়ে উঠল। কথাটা এভাবে বলটা বোধহয় ঠিক হয়নি। শঙ্কর মনে মনে ভাবল। কিন্তু মণিমালাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কোনো চেষ্টা করল না। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল।

'তুমি যদি কোনো অধিকারের প্রশ্ন না তোল — অনেকক্ষণ পরে সে বলে উঠল — 'তাহলে তোমাকে আমি কিছু কথা বলতে চাই মণিমালা। তোমরা কীভাবে রোজগার করছ?'

'এ কথা জিজ্ঞেস করার অর্থ?' মণিমালা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল।

'অর্থ কিছুই নেই। সামান্য কৌতূহল মাত্র। ইচ্ছা না হলে উত্তর দিতে হবে না।' শঙ্কর নির্বিকার ভাবে বলল।

'উত্তর দেবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তুমি এসেই যে ধরনের কথা আরম্ভ করেছ, তারপরেও তোমার এই প্রশ্নের আমি কোনো উত্তর না দিলে, কিছু কুৎসিত সন্দেহ নিয়ে তুমি ফিরে যাবে। মনে আছে কি, পাণ্ডু থেকে চলে আসার সময় তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে — 'মেয়েদের জন্য সমস্ত রকম শ্রম শ্রদ্ধেয় নয়। আজ পর্যন্ত কোনো ধরনের অশ্রদ্ধেয় শ্রম আমি করিনি।'

'তোমার উত্তরটা একেবারে নেতিবাচক হয়েছে। আমি জানতে চাই তোমরা কী

উপায়ে রোজগার করছ?

'হাতে কিছু টাকা জমানো ছিল। সেটাই ভাঙিয়ে খাচ্ছি।' মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে মণিমালা উত্তর দিল।

মণিমালা বলার মতো আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। অন্যদিকে সে স্পষ্ট অনুভব করল, শঙ্করের প্রশ্নের উত্তরও ঠিকঠাক দেওয়া হল না। জমানো টাকা ওদের কতই বা ছিল যে আজ এক বছর ধরে সেটাই খাচ্ছে। অর্থাগমনের নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। ঘরে অসুস্থ বুড়ো বাবা আর নাবালক ভাই। একজন অসহায় যুবতি মেয়ে কীভাবে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করছে শঙ্করের মনে যদি সেই প্রশ্নের উদয় হয়, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? কিন্তু সেই প্রশ্নের যে কোনো সোজা উত্তর নেই। দিনের পর দিন যখন অনাহারে থাকতে হয়, একবেলা খাবার পরে পরের বারের জন্য কোনো নিশ্চয়তা থাকে না, তখন যদি একজন ভদ্রলোক এসে বলে, 'মণিমালা, এই কুড়িটা টাকা নিয়ে তার বিনিময়ে তোমাকে কিছুই করতে হবে না, মাত্র আধাঘণ্টা সময় আমার সঙ্গে শুতে হবে' — তখন মনে প্রথমে কী ভাব জাগে জান শঙ্করদা? মনে হয়, কুড়ি টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যায়। এক মণ চাল মানে তো আরও কুড়িদিন বেশি বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাটাই প্রথম কথা। তারপর আসে তোমার সততা এবং সৌন্দর্যের ধারণা। প্রথম অবস্থায় নৈতিকতার স্পর্ধায় কুড়িটা টাকা ভদ্রলোকের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পার। কিন্তু অভাবের অবিরাম তাড়নায় তোমার সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি একদিন ভেঙে পড়বে। তুমি হার মানবেই। আমি হার মেনেছি শঙ্করদা। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আমাকে পতিতা বল না। দারিদ্রই সবচেয়ে বড় পাপ? প্রত্যেক দরিদ্রই পতিত।

সমস্ত কথা মুখ খুলে বলে দিতে ইচ্ছা করল মণিমালার। তোমার সন্দেহই সত্যি, শঙ্করদা। আমি সুরুচি সম্মত উপায়ে জীবন নির্বাহ করতে পারিনি। দেহের ওপরে এক টুকরো কাপড়ের আবরণ রাখর জন্য আমাকে অনেক পুরুষের সামনে অনাবৃত হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, এক মুঠো লবণ ভাত খেয়ে দেহের রক্ত প্রবাহ সচল রাখার জন্য আমি অজস্র ঘাম এবং রক্ত ব্যয় করেছি। কিন্তু সে সমস্ত কথা বলে দিলে তো তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। আমাকে ঘৃণা করে তুমি দূরে সরে যাবে, তা আমি হতে দিতে পারি না। তুমি যখন নিজেই আমার কাছে চলে এসেছ, তোমার হাত ধরেই আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

'এত কী ভাবছ শঙ্করদা' — হঠাৎ সে প্রশ্ন করে শঙ্করের কাছে চলে এল।

'হুঁ। শঙ্কর যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল — 'ভাবছি একটি মেয়ের কথা। এই বস্তিতে থাকে। একটি মানুষকে ভালোবেসে বিশ্বাস করে, সে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে তার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। আজও তারা প্রায় একই ঘরে বাস করে, অথচ সে তার স্ত্রী নয়। এই সুন্দর শহরের সভ্যতা সংস্কৃতির পালিশের নিচে এরকম একটি রহস্যময় জগৎ রয়েছে, যেখানে মানবীয় সম্পর্কের পবিত্রতার কোনো মূল্য নেই, যেখানে মুখের কথাতেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে যায়, মা বাবা নিজে নাবালক সন্তানকে গণিকার দালালি করার জন্য উৎসাহ দেয়, কুষ্ঠ রোগী আপন সন্তানকে বুকে নিয়ে ঘুমোয়। একটি মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলম। কিন্তু নিজের জীবিকার কোনো স্থায়ী সংস্থান না থাকায় তাকে আমি বিয়ে করতে পারিনি। ভাবছি আমি যদি তাকে এভাবে হাতে ধরে নিয়ে আসতাম, আর এই বস্তির দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে এভাবে আমাদের বাস করতে হত, তাহলে সেই অবস্থায় তার প্রতি আমার হৃদয়াবেগ কী রূপ লাভ করত? প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, সততার ধারণা — এসব খুবই ভালো জিনিস। কিন্তু কেবল আইডিয়া হিসেবে সেসবের কোনো মূল্য নেই। যে পর্যন্ত ব্যবহারিক বৈষয়িক মানদণ্ডে তাকে ওজন করে নেওয়া না হয়।' শঙ্করের শেষের দিকের কথাগুলো প্রায় স্বগতোক্তির মতো হয়ে পড়ে। মণিমালা যে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ দরজার বাইরে সে কারও পায়ের শব্দ যেন অনুভব করে চমকে দাঁড়িয়ে গেল। মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটা অবর্ণনীয় আতঙ্কে তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। পা দিয়ে শব্দ করা মানুষটা তার বাবাও হতে পারে অথবা ভাই — কিন্তু সে এতটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণ কী? শঙ্কর দরজার দিকে তাকাল।

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। কিন্তু বাইরের মানুষটা ভেতরে ঢোকার আগেই মণিমালা দৌড়াদৌড়ি করে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। শঙ্কর কিছু সময় কিছু একটা ভেবে এক জায়গাতেই বসে রইল। তারপর একবার হঠাৎ তার মনে হল — এতটা দেখার পর এইটুকু আর বাকি থাকে কেন?

মণিমালার কণ্ঠকল্পিত কৈফিয়ৎ শুনে হাসি সামলানোর চেয়ে কিছুটা নিষ্ঠুর হওয়া বেশি সহজ। মণিমালার পেছন পেছন গিয়ে দরজাটা খুলে সে দেখল, বল্টুর মুখে একটা হাত দিয়ে চাপা মণিমালা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বল্টু মণিমালার হাত ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শঙ্করকে এভাবে আকস্মিকভাবে চোখের সামনে দেখে বল্টু তীব্র উৎসাহে মণিমালার হাতটা এক টানে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল — 'ও তুমি এখানেই রয়েছ। সেজন্যই ও আমাকে কথা বলতে দিচ্ছে না। জুলির কাছে তুমি কেন যাচ্ছ না, আমি এখন বুঝতে পেরেছি। হিঃহিঃহিঃ হিঃ হিঃ। সেই মানুষটাকে গিয়ে বলে

দিচ্ছি আজ আর হবে না।' কথাটা বলেই এক মুহূর্তের জন্যও সে না দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে রাস্তার উদ্দেশে দৌড় লাগাল।

শঙ্কর আর মণিমালা দুজনেই পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তুমি আর কিছু না বললেও হবে মণিমালা। আমি প্রথমেই সমস্ত কিছু জানতে পেরেছিলাম। এখন অবশ্য তুমি আর ফাঁকিও দিতে পারবে না। শঙ্করও মনে মনে ভাবল। বল্টুও তোমাকে জানে। আর জুলিও? মণিমালা অবাক হয়ে ভাবল। তাহলে তুমি কেন আমার কাছে এসেছ?

হঠাৎ অসহ্য ঈর্ষার আবেগে মণিমালা হিংস্র হয়ে উঠল। শঙ্করের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল — 'তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? পাঁচুর ঘরে গিয়ে বসে থাকগে। আমি যাচ্ছি।'

শঙ্করের ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির ঢেউ খেলে গেল। মণিমালাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে তার খুব আদর করতে ইচ্ছা করল। আমরা একজন আরেকজন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি? কিছুই জানি না। কিছুই জানি না। জীবনকে সুন্দর করার জন্য করা সংগ্রামই পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ কাজ। কিন্তু সংগ্রাম একা সম্ভব নয়। তার জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন। পরস্পরের সহায়তা প্রয়োজন। শঙ্করকে হাসতে দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়া মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে, একহাতে দরজা খুলে ডাকল, 'ভেতরে চলে এস মণি। বাইরে খুব ঠান্ডা পড়েছে। আমি তোমাকে আজ জুলির গল্প বলব।' যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো মণিমালা শঙ্করের পেছন পেছন ভেতরে ঢুকে গেল।

বল্টু তখনও রাস্তার একটি পান-দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে শঙ্করদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তারা ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কুৎসিত মুখভঙ্গি করে সে হিঃহিঃ করে হেসে উঠল। জন্মের পর থেকে সে হাসতে শেখেনি, যে হাসির উৎস মানুষের সুন্দর হৃদয়।

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

দহন

চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া

পীতাম্বর শইকিয়ার মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে দাহ করা হবে। খবরটুকু গাঁ-গঞ্জের ঘরে ঘরে দ্রুত ফাল্গুনের দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে মৃতদেহ কীভাবে দাহ করা হয়, এদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ কখনও চোখে দেখেনি। এইটুকু দেখার জন্য পীতম্বর শইকিয়ার গৃহকোণের চারপাশে মানুষের ঢল নেমেছে। শহর থেকে অনেক দূর, প্রায় শ্মশানের মতো নির্জন নিস্তব্ধ বন জঙ্গল ঘেরা এই অজ গ্রাম আর কাছাকাছি এরকমেরই গ্রামগুলোতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল।

রাজ্যের রাজধানী থেকে পুলিশের ওয়ারলেসে বার্তা এল, শ্মশানে মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে দাহ করার জন্য উচ্চ পদস্থ সিভিল এবং পুলিশ আধিকারিকগণ গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছে। সঙ্গে একদল পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে একটি মৌন শোভাযাত্রা পীতাম্বর শইকিয়ার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তিন বার কারাবাস খাটা, সর্বস্ব ত্যাগী, দেশমাতৃকার অক্লান্ত সৈনিক পীতাম্বর শইকিয়ার মৃত্যুতে রাজ্যবাসী শোকমগ্ন।

ইতিমধ্যে ওপরওলার নির্দেশ পেয়ে ছয় মাইল দূরের থানা থেকে কয়েকজন পুলিশ আগেই পীতাম্বরের ঘরে এসেছে। গাঁয়ের মানুষজনের সাহায্যে শ্মশানে সৎকারের সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক মাইল দূর থেকে বৈদ্যুতিক তার এনে পীতাম্বরের বাসস্থান শুধু নয়, শ্মশানভূমি আলোকিত করার আয়োজন সম্পূর্ণ।

শ্মশানের চারপাশের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে সরকারি অফিসার এবং পুলিশদের দাঁড়াবার জায়গা সমান করা হয়েছে।

রাজধানী থেকে বিকেলের আগে মাখন রঙের গাড়িটা যাত্রা করেছে। গাড়িতে রয়েছেন দুজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ঠিক পেছনেই স্টেশন ওয়াগন, সেখানে দুজন পুলিশ অফিসার, একজন ফটোগ্রাফার। সবার শেষে পুলিশের ট্রাক।

দুজন আধিকারিকের মধ্যে যিনি সিনিয়র, তাঁর নাম সুশান্ত চৌধুরী। তামাক ভরা

পাইপ ফুঁকছেন তিনি। অন্যজন ভগীরথ শইকিয়া। কারুর মুখে কথা নেই। এক সময় নীরবতা ভেঙে পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে ভগীরথের দিকে তাকালেন সুশান্ত চৌধুরী — 'পীতাম্বর শইকিয়ার নাম আপনি কখনো শুনেছেন?'

ছেলেমেয়েরা যে-তৃপ্তি আর উৎসাহে চকোলেট আর আইসক্রিম খেয়ে থাকে, ভগীরথ শইকিয়া অনুরূপ আনন্দে তাম্বুল পান খেতে ভালবাসেন। স্বভাববশত চকোলেটের খালি কৌটয় রাখা তাম্বুল বের করে পান পাতায় চুন দিচ্ছিলেন ভগীরথ। সুশান্তর প্রশ্ন শুনে তাঁর হাসি পেল। হাসি থামতেই চায় না। কেউ কিছু প্রশ্ন করলে ভগীরথ প্রথমে এক চোট হেসে নেন — উত্তর দেবার আগে সব সময় হাসি পায় তাঁর — ভোজসভা, হাসপাতাল বা শ্মশানঘাট যাই হোক।

'পীতাম্বর শইকিয়ার নাম এই প্রথম শুনলাম। সেও আপনার মুখ থেকে। দুপুরে অফিস থেকে ভাত খেতে বাড়ি যাই। মেয়ে বলল, রেডিওর খবর — একজন দেশপ্রেমিক মারা গিয়েছেন। অফিসে এসে শুনলাম, আপনার সঙ্গে গ্রামে যেতে হবে। এই পীতাম্বর শইকিয়ার সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে, বলুন তো।'

বাইরে চোখ, সিনিয়র নিশ্চিন্তে, পাইপ টানছিলেন। ভগীরথের শেষের কথাটাই অবাক করল তাঁকে। তিনি প্রশ্ন করছিলেন একটু আগে, সেটা সম্ভবত মনে নেই।

'মনে পড়ে, একবার কি দুবার পীতাম্বর শইকিয়ার নাম খবর কাগজে দেখেছিলাম। মিটিঙে লেকচার দেবার খবর। পুরনো যুগের মানুষ। বার তিনেক জেল খেটেছেন। এরকম কাউকে ন্যাশনাল অনার দেওয়াটা বাড়াবাড়ি বলে আপনার মনে হয় না, না কি?'

প্রশ্ন ছুড়েই সুশান্ত যথারীতি পাইপ ধরিয়ে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। যেন প্রশ্ন করটা তাঁর দায়িত্ব, উত্তর শোনো নয়।

ভগীরথ হেসে ওঠে। হাসির দমকে ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকায়। মুখ থেকে পান-তাম্বুলের কুচি হাসির তোড়ে ছিটকে পড়েছিল প্যান্ট শার্টে, সেসব ঝেড়ে ফেলে ভগীরথ বললে, 'ইতিহাসের ছাত্র বলেই বলছি, বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে সামান্য চেষ্টাতে স্বাধীনতা অর্জন শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব। এই দেশপ্রেমিকরা স্বদেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, শুনলে হাসি পায়।'

কথাটা বলেই হাসতে শুরু করলেন ভগীরথ। মুখ লাল হয়ে ওঠে তাঁর। সেই সঙ্গে কাশি। নিজের হাতে গলটা চেপে ধরে ত্রাণ পেতে চান তিনি।

বিতৃষ্ণার দৃষ্টি হেনে ভগীরথকে দেখলেন সুশান্ত চৌধুরী। পদমর্যাদায় অধস্তন ভগীরথকে নতুন প্রশ্ন না-করে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। শুষ্ক গাছ গাছালি, সাধারণ

ঘরবাড়ি, চতুর্দিক খোলা নামঘর, বর্ষায় গরু ঢোকার শিবির, পাঠশালা, স্কুলগুলো পেরিয়ে ছুটছে দুই সাহেবের গাড়ি। দূরত্ব রেখে একটু পিছনেই স্টেশন ওয়াগন আর পুলিশের ট্রাক।

অনেকটা যাবার পর, বড় রাস্তার ওপাশ থেকে একটি উৎসবের দৃশ্য চোখে পড়ল। সেই উৎসবকে ছাড়িয়ে হৈচৈ শোনা যাচ্ছিল। পাইপ ফুঁকতে থাকা আধিকারিক ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন। দেখে আসতে বললেন, কী হচ্ছে ওখানে।

সুশান্ত পিছন দিকে তাকালেন। দেখলেন একটু দূরে অনুসরণকারী গাড়ি দুটো দাড়িয়ে আছে। ড্রাইভার জানাল, ওখানে বসন্ত আগমন উৎসব পালিত হচ্ছে।

সুশান্ত তামাক ধরানো পাইপ ভগীরথের মুখের সামনে বার দুয়েক ঘুরিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'এই জেলার ডেপুটি কমিশনার যখন ছিলাম, এদের বার্ষিক উৎসব একবার উদ্বোধন করেছিলাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে এই উৎসব পালন করে।

এইটুকু বলে আবার মনের সুখে পাইপ ফুঁকতে থাকলেন। যেন অনেকক্ষণ একটি কথাও না-বলে তিনি চুপচাপ পাইপ টেনে যাচ্ছেন, ভাবখানা এমন।

খনিকক্ষণ চুপ থেকে সুশান্ত বলে ওঠেন, — 'চলুন, রিলাক্সড হয়ে আসা যাক। ফাইল ফাইল আর ফাইল — ঘেঁটে ঘেঁটে জীবন বরবাদ। ঘরেও শান্তি নেই, হয় মিনিস্টার এম.এল.এ.-র টেলিফোন নয়তো বেঁধে আনা একগাদা ফাইলে ডুবে থাকো। ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছুই থাকল না।'

কথাটুকু বলে ভগীরথের দিকে তাকালেন তিনি, মুখে বালসুলভ হাসি। ভগীরথ ভেবে পায় না, ওরকম গুরুগম্ভীর চেহারায় নির্মল হাসি ফুটে বোরায় কী করে। তার কথার সুরে যে আক্ষেপ, তার সঙ্গে হাসির ধরনটুকুর মিল ছিল না।

সুশান্ত বললে, — 'চলুন শ্মশানে ঢোকার আগে অনুষ্ঠানটা দেখে আসি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই উৎসব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসন নিয়েই। আপনি কি বলতে পারবেন, কটা সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন?'

সশব্দে গাড়ির দরজা খুলে সুশান্ত বেরিয়ে এলেন। তখনই অন্য দরজা দিয়ে ভগীরথ বেরিয়ে এসেছে, হাতে পান-তাম্বুলের কৌটা।

স্টেশন ওয়াগনে বসে ছিল ফটোগ্রাফার। হাতের ইশারায় সুশান্তর নির্দেশ পেয়ে নেমে এল।

এর মধ্যেই দুজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে সুশান্তর পাশে দাঁড়িয়েছে। হাত ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে সুশান্ত বললে — 'আপনারা কিছুক্ষণ রেস্ট নিন। আমরা উৎসব দেখে আসছি।'

বড় রাস্তা পেরলেই সরু খাল। জল আছে, তবে কম। কাদা রয়েছে। ঝাঁপ দিয়ে ফটোগ্রাফার ওপারে চলে যায়। সে সুশান্তর লাফ মারার দৃশ্যটা তুলবে। সাবধানে ও সভয়ে সে প্রস্তুত। খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে সুশান্তর নানা প্রশ্ন। এই সংকীর্ণ জল ধারার শুরু কোথায়, শেষ কোথায় গিয়ে, লম্ফ না-দিয়ে পার হওয়া যাবে কি? চারদিক ভাল করে দেখে সুশান্ত লাফায়। ওপারে উঠে সুশান্ত হাত বাড়াল, এবার ভগীরথ আসুক।

ভগীরথ লাফাবে কি, তার হাসি পাইল। হাসির মাত্রা বাড়ছিল। সুশান্ত কতক্ষণ ধৈর্য রাখবে, তার বাড়ানো হাত। অন্য কেউ না-শোনার মতো নিচু গলায় — 'অপদার্থ! বেআক্কেলে লোক আমার ভাগ্যে জুটেছে।'

'জাম্প, জাম্প।' বিরক্ত সুশান্ত।

ভগীরথ লাফাল। লাফ মেরে পার হরার সময় পান-তাম্বুলের কৌটো কাদায় গিয়ে পড়ল। একটু কাদা লাগল ডান পায়ে। সুশান্ত দুই হাতের নাগালে ভগীরথকে ধরে নেয়। ফটোগ্রাফার পান-তাম্বুলের কৌটো কাদা থেকে তুলে আনে।

পা থেকে জল-কাদা ভগীরথ মুছতে যাবে, তখনই সুশান্ত বললে — 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসনের বড় কাজে এলে স্বদেশের কাদা মাটি গায়ে লাগতেই পারে। ডোণ্ট ওরি, কাম।'

উৎসব রীতিমত বড়।

চারদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য। একটি ছোট নদীর পারে রাশি রাশি গাছ। গাছগাছালির তলায় অনুষ্ঠান। বসন্ত আগমন উৎসব।

চতুর্দিক বর্ণময়। কাছাকাছি চা বাগানের শ্রমজীবী নারী পুরুষ, এমনকী বুড়ো বুড়ির পোষশাকেও বিচিত্র বাহার। নারী পুরুষ দুইভাগে মাদলের তালে তালে নৃত্য রত, সঙ্গে গান। একটু দূরে মহিলারা পালা করে গান গাইছে। যুবক যুবতীর মুখগুলো আবির মাখা। অনুষ্ঠান দেখছে অসংখ্য নারী পুরুষ।

বাইরে পান-তাম্বুল আর খেলনার দোকান।

একদিকে উৎসব মঞ্চ।

অনুষ্ঠান স্থলে সুশান্ত ও ভগীরথকে দেখে কয়েকজন কর্মকর্তা এগিয়ে এল। এই সেদিনও সুশান্ত চৌধুরী এই জিলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তিনি সবার পরিচিত এখানে।

'স্যর, আপনাকে এখানে পেয়ে আময়া নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি।'

অনুষ্ঠান সভাপতি নমস্কার জানিয়ে দুজনকে অর্ভ্যথনা করল। সুশান্ত ফটোগ্রাফারের দিকে তাকল। ক্লিক ক্লিক।

সুশান্ত বলে ওঠেন — 'হাতে সময় বেশি নেই। বিশেষ কাজে এসেছি। ভাবলাম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উৎসব খনিকক্ষণ দেখে যাই। ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসনের প্রকৃত কাজ এই ধরনের উৎসব পালন।

'আজ্ঞে সার। সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন। জাতীয় সমন্বয় অটুট রাখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

পরম সমাদরে ওঁদের মঞ্চে বসানো হল। মঞ্চে উপবিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

ঘূর্ণ্যমান উঁচু আরামদায়ক চেয়ারে শরীর এলিয়ে সুশান্ত তামাক ভরলেন পাইপে। দেশলাই জ্বালিয়ে অগ্নি সংযোগ করে মনের সুখে পাইপ ফুঁকলেন। কৌটা থেকে ভগীরথ পান-তাম্বুল বের করল।

দুটি মেয়ে মঞ্চে উঠে সম্মানপূর্বক চা আর তাম্বুল দিয়ে যায়।

আরামদায়ক ব্যবস্থায় খানিকক্ষণ অনুষ্ঠান উপভোগ করার পর ভগীরথ কটা বাজে হাত ঘড়িতে দেখে নিয়ে সুশান্তর দিকে তাকালেন। এবার ওঁরা উঠলেন। সুশান্ত কর্মকর্তাদের নমস্কার জানালেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি কাঠের ব্যবসায়ে প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেছে। সুশান্ত যখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সভাপতির ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুশান্তর ডান হাত নিজের দুহাতে জড়িয়ে ধরে সভাপতি বলল, 'সবে আমাদের বার্ষিক উৎসবে এসেছেন, জলযোগ না-করিয়ে যেতে দেব না। আর যদি এমনি চলে যান, সেটা রাষ্ট্রীয় সমন্বয় বিরোধী হবে।'

'রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে একজন দেশপ্রেমিকের মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার কাজটুকু যে রয়ে গেল।' বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সুশান্ত ভগীরথের দিকে তাকালেন। ভগীরথ বলল —'আমাদের এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে।' এই বলে ভগীরথ হাসতে শুরু করলেন। সুশান্তর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খেয়াল করে সে এক রকম জোর করেই হাসি থামালেন।

সভাপতি বলল — 'এখনে এসে মোটেই ভুল করেননি স্যর। চলুন।'

সুশান্ত ও ভগীরথ মঞ্চ থেকে নেমে সভাপতির ঘরের দিকে এগোতে থাকেন। সভাপতি ও আরো দুজন সঙ্গে। যেতে যেতে সুশান্ত বললেন — 'আমরা কিন্তু এসেছি দায়িত্ব পালন করতে। উই হ্যাভ গট টু বি রেসপনসিবল।'

'ঠিক ঠিক। চলুন, স্যর। কাজ নিয়ে শ্মশানে আসা, হাসপাতালে যাওয়া, অসুস্থ রোগীর জন্য ওষুধ কেনা — এর বাইরেও তো জীবন আছে, নাকি?

সভাপতির কথা শুনে ভাগীরথের হাসি পেল।

খানিকটা এগিয়ে ওঁরা সভাপতির বাড়ি পৌঁছুল সন্ধের মুখে। জলযোগের এলাহি আয়োজন। লুচি, আলুর দম, পায়েস। কয়েক রকমের মিষ্টি। চা। সুশান্ত কিছু স্পর্শ করলেন না। অনেক দিনের চেনা সভাপতি খারাপ পেতে পারে, এই ভেবে একখানা মিষ্টির আধটুকরো মুখে পুরে চায়ের কাপ হাতে নিলেন।

সুশান্তর কাছে চেপে সভাপতি কথাটা বলল — 'স্টক কিন্তু রেডি আছে, স্যর। তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারেন।'

সভাপতিকে খুব কাছে আসতে দেখে, সুশান্ত আন্দাজ করেছিলেন, সভাপতি কী বলবে। তিনি যখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, সভাপতি এভাবেই কানের কাছে এসে দাঁড়াত।

এইসব ব্যাপারে সাধারণত সুশান্ত শুরুতে কী বলে থাকেন, সভাপতির বিলক্ষণ জানা। নিচু গলায় সভাপতি বলে যায় — 'সরকার দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছে, ঠিক। কিন্তু কাজ সম্পন্ন হতে এক-আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক হতেই পারে। আসুন স্যর, সব রেডি।'

'নো, নো। এবসলিউটলি ইমপসিবল। কী বলছেন? লোকে শুনলে, কী ভাববে।'

ভগীরথ সুশান্তর মুখ দেখে লক্ষ করলেন, সুশান্ত যাই বলুক, হাসির রুপোলি রেখা দৃশ্যমান। গাড়ি থেকে নামার সময় এরকম হাসি সুশান্তর মুখে।

'কী ব্যাপার?' ভগীরথ জিগ্যেস করলেন।

'কী আর। কুইক ড্রিংকস নিতে বলছে।'

হাসি পেল ভগীরথের। জোরে হেসে উঠলেন।

'স্যর আসুন।' সভাপতি বললে।

'উচিত কী।' সুশান্ত জানতে চায়।

'এত করে যখন বলছে, চলুন। একটু খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

ওঁরা উঠে পাশের কামরায় গেলেন।

দুটো বোতল রাখা — একটা হুইস্কির, একটা ব্রাণ্ডির। প্লেটে রয়েছে মাছ ভাজা, আলু ভাজা, ডালমুট।

সবুর সইল না, ভগীরথ বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললে। বললেন, আমার ব্যাগে একটা আছে।

সুশান্ত বলে উঠলেন — 'গুড ফুড, গুড বুক, গুড ড্রিংক - কী শইকিয়া?' মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিলেন সুশান্ত।

চিয়ার্স, চিয়ার্স।

ভগীরথ বলে ওঠেন — 'গুড ওয়াইফ, কিন্তু ডাউটফুল।'

'তা কেন?' ভগীরথের দিকে চোখে তুলে তাকালেন সুশান্ত।

'যেমন আমার স্ত্রী। বাইরে মদ্যপানে আপত্তি নেই। ঘরে নেশা করলেই কালী মূর্তি। ছেলেমেয়েরা গোল্লায় যাবে। একদিন তো বোতলটা রাখা মাত্র, ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমিও বলতে ছাড়িনি, মুখ বন্ধ করে বোতলটা ছোঁড়া যেত না?'

'আমাদের গিন্নিরা জানেই না, গুড ড্রিংকস্ কী? মদ খেলেই মনে করে নর্দমার কীট। ছেলেমেয়েদের কথা? ওরা জিনিয়াস হলে, কিছুই কি নষ্ট করতে পারবে ওদের?'

হাসি পেল ভগীরথের। ক'টা বাজল ঘড়ি দেখে সুশান্ত বলে ওঠেন — 'কুইক কুইক। উই গট টুবি রেসপনসিবল। উই আর অন স্টেট ডিউটি।' সময় বয়ে যায়। গান বাজানার সুর ভেসে আসছে। পানীয়ের পরিমাণ বোতলে কমে এসেছে। ভগীরথ বললেন — 'আমাদের পৌঁছতে দেরি হলে গাঁয়ের মানুষ কি অপেক্ষা করবে! দাহের কাজটা ওরা সেরে ফেলে যদি, আমরা না-পৌঁছতে। গ্রামের লোকজন আজকাল আগের মতো নেই।'

'হোয়াট?' সুশান্তর চিৎকারে ভগীরথ চমকে উঠলেন। — 'ন্যাশনাল অনার অবজ্ঞা করার সাহস আছে গাঁয়ের লোকজনের? আমরা না-যাওয়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। আমরা না-পৌছুনো পর্যন্ত ওরা ...।'

ধীরে ধীরে সুশান্তর চোখ বুজে আসে। পাশের সোফায় অতি কষ্টে লম্বা হয় শুয়ে পড়লেন। ভগীরথ চেয়ারে গা এলিয়ে দেন।

এদিকে, সেই সকালে প্রয়াত পীতাম্বর শইকিয়ার মরদেহ ঘিরে অজস্র মানুষ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কখন দাহ কাজ সম্পন্ন হবে।

ঘরের ভিতর উঠোনে, বারান্দায়, রাস্তায় — চারদিকে শুধু মানুষ। এখনও মানুষ আসছে। একটা দল — অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই বেশি — বড় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, কখন পুলিশের গাড়ি আসবে। ওরা ফিরে গিয়ে জানাল, পুলিশের গাড়ি আসেনি। ওরা আবার বড় রাস্তায় চলে এসেছে।

এদিকে শ্মশানে অপেক্ষারত প্রচুর মানুষ। ধুপ-ধুনো থেকে কাঠের চিতা, যা যা প্রয়োজন সাজিয়ে রাখা।

থানা থেকে খবর এল, আধিকারিক এবং পুলিশের দল বিকেলে রাজধানী থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। সে কোন মুহূর্তে এসে পৌঁছুবে।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধে, সন্ধেও পেরিয়ে যাচ্ছে। গাছে গাছে চড়ুই পাখির কিচির মিচির।

শোক সন্তপ্ত মানুষ পীতাম্বরের গুণাবলি বলাবলি করে ক্লান্ত। অনেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছে। প্রবচন সাধু কথা, কিংবদন্তীর সাত সতেরো তো আছে, গ্রামে কবে কী কেলেঙ্কারি হয়েছিল, খবর কাগজের চাঞ্চল্যকর কাহিনি, এসব নিয়েও আলোচনা অপেক্ষারত লোকজনের মুখে। দু'একজন আবার পীতাম্বরের দু'চারটে দোষ ত্রুটির প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

মৃত ব্যক্তি ছেড়ে অন্য কিছু আলোচনা শ্মশানের প্রচলিত দস্তুর। সন্ধে পেরিয়ে গেলে শ্মশানে সমাগত লোকজন কিছু ভয়াবহ, অবিশ্বাস্য আর হাস্যরস সম্পর্কীয় ঘটনার খেই ধরল। একজন শোনাল, রাত্তিরে সে যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরছিল, জ্যোৎস্নার আলোয় দেখল, এক যুবক আত্মহত্যা করবে বলে গাছে দড়ি বেঁধেছে। সে তখন আর্জি জানাল, অন্তত আজ এই কীর্তি করিস না, গ্রামের মানুষ আমাকেই দোষারোপ করবে। আরেকজন বর্ণনা দিচ্ছিল, সাহস ছিল আমার বাবার। নিখোঁজ গরুর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে রাত্তিরে এই ঝোপজঙ্গলে বাঘের সঙ্গে দেখা। বাঘ বাবার দিকে এগিয়ে আসছে। বাবা এক জায়গায় স্থির। দুম করে মন্ত্র উচ্চারণ করতেই বাঘ ভেড়া হয়ে গেল। একজন দাদুর কাছ থেকে শোনা গল্পের অবতারণা করল। ভাওনার অভিনয় চলছিল নামঘরে। যে দুঃশাসন, সে ভীষ্মের পুরনো শত্রু। ভাওনা চলাকালীন ভীম গদা দিয়ে আঘাতে করল দুঃশাসনকে। পালিয়ে এসে দুঃশাসন জঙ্গলে লুকিয়েছিল। ভীম খুঁজে পেতে তাকে বধ করেই সোজা থানায়।

রাত অনেক হল।

ছোট ছেলেমেয়েরা অনেকেই যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। মহিলারা সবাই ফিরে গিয়েছে। কিছু লোকজন ভাত খেতে গিয়ে ফিরে আসেনি। শ্মশানে এখন লোক কমে চার ভাগের এক ভাগ।

মধ্যরাত, বারোটা।

গ্রামের মুখিয়া আর দূর থেকে আগত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ধীরে ধীরে পীতাম্বরের ঘরের উঠোনে এসে সমবেত হল। ওদের চোখে মুখে শঙ্কা, ক্রোধ আর উদ্বিগ্নতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। একজন বললে, 'বারোটার পর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করব না। মরদেহ এভাবে ফেলে রাখা যায় না।'

'কিন্তু ওরা এল বলে।' একজন বললে।

'ওরা আসবে। এই ভেবে নিয়ে মরদেহ কি আরো বাসি হবে।'

'কোন্ শাস্ত্রে আছে এটা।'

'তবুও সরকারের নির্দেশ।'

'নির্দেশ কী হে? কীসের নির্দেশ? ওদের কথা মেনে অপেক্ষা করে পুরো দিন, পুরো রাত কেটে গেল। আমাদেরও দায়িত্ব আছে। নেই কি! শবদেহ সৎকার না-করে তুমি কী করতে চাও বলো।'

খানিকক্ষণ সবাই নীরব। একজন আরেক জনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বয়স্কদের মধ্যে একজন গাড়ির শব্দ বা আলোর উৎস খোঁজার চেষ্টায় এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটা বাদুড় উড়ে যেতে যেতে ডেকে ওঠে।

'তাহলে, তোলো।'

পীতাম্বর শইকিয়ার ক্ষীণ দুর্বল শরীর চিতার আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। প্রায় শেষ।

হঠাৎ গাড়ির শব্দ আর আলো।

গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে এসে পুলিশগুলো চিতার একটু দূরে হাতের বন্দুকগুলো উল্টে মাটিতে নামিয়ে সার দিয়ে আনত মুখে দাঁড়াল। সুশান্ত একবার ভগীরথের দিকে ভয়ংকর চোখে তাকালেন, উনি যেন হেসে না ওঠেন।

চিতার পাশে গ্রামের যে-কজন লোক ছিল, পুলিশগুলোর কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত। যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ নড়ল না, অবাক চোখে পুলিশগুলোকে দেখছিল।

রাত শেষের অরণ্যে, নিভে আসা চিতার আগুন আর অস্থায়ী বৈদ্যুতিক লাইটের আলোয় সমস্ত দৃশ্যটাই যেন উদ্ভট এক নাটকে অভিনয়।

সেই উদ্ভট দৃশ্যটার বার বার ছবি তুলছিল প্রাণবন্ত ফটোগ্রাফার।

।। অনুবাদ : মৃদুলকান্তি দে।।

ক্লান্তি

রোহিণী কুমার কাকতি

মানিক বরুয়া আজ সারা দিন ঘরের উপরে নিজের অদিপত্য ক্রমশ কমে আসার কথা ভেবে ভেবে প্রায় হতাশ ও অবশ হয়ে পড়েছেন। সংসারে তাঁর অধিপত্য কমে এসেছে, কারণ নিজে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তা ছাড়া ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। তার উপর তিনি আজ চার বছর ধরে শয্যাশায়ী।

তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবলেন — এই ছেলেমেয়েগুলির একটু হাসি-স্ফূর্তি করে বলা কথাগুলি তিনি কেন সহ্য করতে পারেন না? এই বয়সে ওরা হাসি ঠাট্টা না-করলে আর কখন করবে? এই ছেলে-মেয়েগুলির মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য কত কষ্ট করেছেন জীবনে! অথচ যখন ওরা হাসতে শিখেছে সেই হাসি বরুয়ার অসহ্য হল। বরুয়াও জানেন ছেলে-মেয়েরা বা তাঁর স্ত্রী আজকাল তাঁর সঙ্গে কম কথা বলে। তিনি সামনে এলে ছেলে-মেয়েরা গম্ভীর হয়ে যায়। তাঁর থাকা ঘরটিতে কেউ জোরে কথা বলে না। তা ছাড়া তাঁর উপদেশ এখন সবাই কমই নেয় অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাকে ঘরের 'মুরব্বিয়ানা থেকে সরাতে আরম্ভ করেছে। সরানো মানে, নিজের প্রাধান্য কমা, আর একদিন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাওয়া।

জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে জোৎস্না নেমে এসেছে। কত স্নিগ্ধ জ্যোস্না! তাঁর কথা অমান্য করা এবং প্রাধান্য ক্রমে কমে আসার ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রকাশ্যে এল আজ কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা থেকে।

বিকাল বেলা বরুয়া বাইরে বসে ছিলেন। বাইরে মলয় বাতাস বইছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এমন সময় দেখলেন একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বড়ো ছেলে নরেন ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। বরুয়ার নাকে একটি তীব্র সেন্টের গন্ধ লাগল।

একদিন তাঁর স্ত্রী নরেন সম্পর্কে তাঁকে বলেছিল, নরেন নাকি কোন একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, দুজনের মনের মিল আছে। হয়তো সেই মেয়েটিই এই মেয়ে। কিন্তু নরেন এত সাহস কোথা থেকে পেল? তা ছাড়া মেয়েটিই বা অসঙ্কোচে তাঁর

সমানে দিয়ে গেল কী করে?

অথচ এই নরেন তাঁর সমানে কোনো দিন মুখ তুলে কথা বলেছে বলে বরুয়ার মনে পড়ে না। অবশ্য সেটা তাঁর সুস্থ অবস্থায়। এ-কান সে-কান হয়ে বরুয়ার কানে এসেছিল, যে ব্যাঘ্ররূপী বরুয়া ছেলে-মেয়েগুলিকে শাসনে রেখে মানুষ করেছেন — বড়ো গাছের মতো ঘরের প্রত্যেককে আগলে রেখেছেন।

অথচ এই ঘরের ছেলে কোথাকার এক নামগোত্রহীন মেয়ে একটিকে নিয়ে বিনা সংকোচে তাঁর সামনে দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। তাঁর স্ত্রী বরুয়াকে বলেছে মেয়েটি নাকি খুব ভালো। কিন্তু নীচু বংশের। তার বাইরে ওরা ভালো মানুষ। নরেনের খুবই ইচ্ছার জন্যই ওর মা নরেনকে বাধা দিতে পারেনি। মানুষ যখন ভালো তখন জাত বিচার করে কী হবে? আজকাল ভালো ছেলে-মেয়ে পাওয়া কঠিন। বরুয়া কোনো উত্তর দেননি। কিন্তু ধিক্কার লেগেছিল একটি কথায়। নিজের অগোচরে বা অমতে ঘরটি এতদূর কি ভাবে এগিয়ে গেল! এই মেয়েটি নাকি ভালো শিক্ষিত ঘরের মেয়ে। চাঁদ সদাগর চালচলনে বেহুলাকে চিনতে পেরেছিল। অথচ মেয়েটি গেল তো গেল একেবারে নাকের সমানে দিয়ে গন্ধ ছড়িয়ে গেল। এইটি ভালো মেয়ে — ভালো ঘরের মেয়েরা কি এমন হয় ভেবে-ভেবে বরুয়ার মাথা গরম হয়ে গেল। এমনিতেই নিদ্রাহীনতার অসুখ। একটু মন দিয়ে বরুয়া ভেতরের কথায় কান পাতল, কয়েকজন যেন হেসে চলেছে। চাপারাগে বরুয়া হঠাৎ জ্বলে উঠল। বসেছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে যখন তিনি ঘরে ঢুকলেন তখন মনে হল ঘরটি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। নরেনরা বোধ হয় অনেক আগেই চলে গেছে।

নিজের স্ত্রীকে শুধু বললেন — নরেন এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে নিজের রাগ কমানোর জন্য গীতার শ্লোক আওড়াতে লাগলেন। সেই আওড়ানোর শব্দ সামনের কোনো ছোটো ছেলের নামতা আওড়ানোর শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

কিছুক্ষণ পর তিনি ঘরের মধ্যে কারও পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, নরেন ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

নরেন জিজ্ঞেস করে — 'আমাকে ডেকেছিলেন বাবা!

কোনো ভূমিকা না করেই বরুয়া বললেন, 'তুই সেদিন কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলি?'

নরেন প্রথমে চুপ করে রইল। তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না। বরুয়া

ভাবছিলেন নরেন ভয়ে হয়তো কোনো উত্তর দিতে পারছে না।

সেজন্য তিনি আরও জোরে জিজ্ঞেস করলেন; 'আমার কথা শুনিসনি না কি? ওই মেয়েটি কে আর তোর সঙ্গে কোথায় এসেছিল?'

এভাবে বাবার মুখোমুখি হবে বলে নরেন ভাবেনি। কিন্তু ঘরে ঢুকে যখন বারান্দায় এল, তখন তার ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ওই সময় বাবার বাইরে বসে থাকার কথা নয়। ধীরে ধীরে নরেন উত্তর দিল, 'মা ওকে চেনে এবং জানেও।' 'মা-জানলেই আমার জানা হল না কি? আমিও জানতে চাই।' গর্জে উঠল বরুয়া।

নরেন কিন্তু এবার নির্ভীক ভাবে উত্তর দিল, — 'আমি এ মেয়েটিকে বিয়ে করব।'

'কী!'

বরুয়া আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কীভাবেই বা এত বড়ো কথাটি নরেন তাঁর সামনে বলতে সাহস করল! নরেন বাবার পরিচয় একদম ভুলে গেল না কি? বিয়ের কথা ঠিক করবে অভিভাবক। ছেলে-মেয়েরা অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও যদি নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করে, তাহলে সে তো কেলেঙ্কারি। সেই কেলেঙ্কারির কথাই নরেন তাঁর সামনে মাথা তুলে মুখোমুখি বলে ফেলল।

ভাবতে ভাবতে বরুয়া নরেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দরজার বাইরের বারান্দায় কার ছায়া দেখা গেল। কেউ একজন ফিসফিসিয়ে যেন কিছু বলছে।

উত্তর শুনে প্রথমে বিমর্ষ হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে সেভাব চলে গেল বরুয়ার। গুরু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন — 'কিছু বলবি না কি?'

নিরুত্তর হয়ে রইল নরেন।

তারপর বরুয়া বললেন, 'বিয়ে তোর ইচ্ছা মতো হবে না আমার ইচ্ছামতো হবে? বর্তমানে আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা কী? আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছি বলে তুই সব বিষয়ে প্রভুত্ব খাটাতে চাইছিস? আমি এখনও জীবিত আছি। আমি ঘরের ভালো মন্দ, তোদের কথা এখনও ভাবতে পারি। আমার ইচ্ছা অনুসারে যদি তোরা চলতে না পারিস, তাহলে তোরা এখান থেকে যেতে পারিস। আমি তোদেরকে শিক্ষা দিয়েছি, লালন-পালন করেছি। আমার ইচ্ছা আমি তোদের সম্পূর্ণরূপে সংসারী করে তুলি। আমাদের প্রতি তোরও বেশ বড়ো রকমের কর্তব্য আছে। তুই এখনই সংসার জীবন শুরু করলে বোন দুটোকে উপযুক্ত করা যাবে না। ওদের বিয়ে আগে না হলে আইবুড়ো বলে লোকে ঠাট্টা করবে। তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে দেখা শোনা করব প্রথমে আমি; তারপর তোর মতামত নেব।'

এতগুলি কথা বলে বরুয়া যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিছানার পিছন দিকে গিয়ে

বেড়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। বরুয়ার আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি ছিল। নরেন দাম্ভিক ভাবে বলে উঠল, 'কিন্তু কথাটি মা-ওরা আগেই জানে।'

'জানতে পারে। কিন্তু সেই মেয়েটি আমার অপছন্দ। যে ঘরের মেয়ে বিয়ের আগে এভাবে অবাধে মেলামেশা করতে পারে, সেই ঘরের মেয়েকে আমি বউমা হিসাবে মেনে নিতে অসম্মত।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।'

'এ বিয়ে হতে পারে না'

'এখন তা আর সম্ভব নয়।'

'মানে!'

'তুমি যদি তোমার বাড়িতে থাকতে দিতে অসম্মত হও তাহলে আমি অন্য কোথাও চলে যাব।'

বরুয়া স্পষ্ট এবং নির্ভীক ভাবে বলল, 'বেশ তা-ই কর আর আমিও তুই ঘর ছেড়ে যাবার দিন থেকে ভেবে নেব আমার বড়ো উপার্জনশীল ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে।' নরেন আর দাঁড়িয়ে রইল না — দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল। বরুয়া বেড়া থেকে পিঠ তুলে এনে নরেনের যাওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এগিয়ে এসে ঝুকে দেখার চেষ্টা করলেন — নরেন বের হয়ে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে। এই নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা কীভাবে কার থেকে পেল নরেন! না, বয়স বেড়ে গেলে এবং রোজগার করতে আরম্ভ করলে এমনই হয়।

দরজার সামনে যে মানুষটির ছায়া ছিল সেই ছায়া এখন আর নেই। বহু অভিনয় শেষ হওয়ার পর দর্শকবৃন্দ চলে গেছে। রাতে বরুয়ার ঘুম কোনো মতেই আসছিল না। সামনের জানালা খোলাই ছিল। বন্ধ করতে এসেছিল স্ত্রী, বরুয়া দেননি। মাথা টিপে দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে চাইছিল। বরুয়া দেননি।

ঘরের প্রতিটি মানুষের উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল বরুয়ার। বরুয়ার মনে হল ঘরের প্রত্যেকেই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। প্রত্যেকই বরুয়ার প্রতিপত্তি ঘর থেকে শেষ করার জন্য নরেনকে সাহায্য করছে। নইলে নরেন যে এত নির্ভীক ও দাম্ভিক হয়ে পড়েছে। সে কথা কেউ কোনোদিনও তাঁকে জানায়নি কেন?

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন, 'তুমি আমার অর্ধাঙ্গিণী কি না? তাহলে আমি অসমর্থ হয়ে পড়ায় তুমি সংসারটি চালাতে পারনি কেন? নরেনের কথাগুলি তুমি এতদিন খুলে বলনি কেন? তোমার মনে পতিপ্রেম থেকে পুত্রস্নেহ বেশি হল! না আমি আর বেশি দিন জীবিত থাকব না — বাকি দিনগুলি তুমি নরেনের সঙ্গে কাটাবে

বলে তুমি নরেনের পক্ষ নিয়েছ। আমি তো কোনো দিনই কোনো কথা তোমার কাছে লুকাইনি।

কিন্তু এসব কিছুই না বলে বরুয়া স্ত্রীকে মাত্র চলে যেতে বলেছেন। তিনি সেই খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলেন — এই পুরনো আকাশ দিয়ে নতুন নতুন মেঘগুলি নতুন ভাবনায় আর কত যাতায়াত করবে, 'চাঁদের মুখটি ঢেকে জ্যোৎস্নাকে আর মিথ্যা কত বাধা দেবে! পাখিদের ডাক নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিছনায় শুয়ে শুয়ে বরুয়া অনেক কথা ভাবতে লাগলেন — কত আশা নিয়ে বরুয়া নরেনদের কোনো কষ্ট না দিয়ে মানুষ করেছেন। নিজের সুখ শান্তি কত বিসর্জন দিয়ে নরেনদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেগুলি সব যেন আজ ধুলিসাৎ হয়ে গেল — সন্তানের লালন-পালন করার প্রতিদান হয়তো কোনো মা-বাবাই পাওয়ার আশা করে না। তথাপি সন্তানের প্রতি যে আশা তা যদি চুরমার হয়ে যায় তাহলে কোন মা-বাবার মন ভেঙে পরবে না? কত আশা ছিল বরুয়ার। নিজে দেখে শুনে বউকে নিয়ে আসবেন — নিজের ছেলের বউয়ের হাতে সংসারের ভার বুঝিয়ে দেবেন! বরুয়া জানেন, নরেনদের বয়সে যে কোনো যুবতি মেয়েকেই ভালো লাগে। এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা মোহান্ধ হয়। কিন্তু বয়স্ক মানুষের চোখে ছেলে-মেয়েদের বাহির-ভিতর সব ধরা পড়ে।

এমন ভাবেই একদিন বরুয়া ঘরে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। বিয়ের আগে নরেনের মা-কে দেখেছেন বলে বরুয়ার মনে পড়ে না। তাকানোটাও অপরাধ। কিন্তু মা-বাবার বেছে দেওয়া মেয়েটির সঙ্গে তো সুখেই সংসার করেছেন — অসুখী হওয়ার বহু সম্ভাবনা আছে বলে বর্তমানে যে কথাটি চলছে তা মানতে বরুয়ার মন চাইছে না, অসুখী হতে হলে দেখে করলেও হবে না করলেও হবে। নিজের স্বভাবের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। বিয়ের গোপনীয়তা, বিয়ের পরের রহস্যের কথা যত মুক্ত হয়ে পড়েছে, ততই ছেলে-মেয়ের মেলা মেশা বেশি হয়ে পড়েছে এবং সমাজটিও কলুষিত হয়ে পড়েছে। অবশ্যে বরুয়া স্বীকার না করে পারলেন না যে আগেও সমাজে কলুষতা ছিল। ছিল কিন্তু গোপনে। আর তা প্রকাশিত হলে পাপ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু আজকাল হয় প্রকাশ্যে। পাপ একটি মুক্ত বিষয় হয়ে পড়েছে। কলুষতা খারাপ। কিন্তু গোপনে হওয়ার চাইতে প্রকাশ্যে হওয়া আরও খারাপ।

দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার রেখা ঢলে পড়েছে। জানালার রডের ছায়া মশারির ওপর থেকে সরে গিয়ে মাথার বালিশের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর

তন্দ্রায় বরুয়ার চোখ বুজে এল। যখন টের পেলেন, দেখলেন, ঘরের জানালাগুলি কেউ খুলে দিয়ে গেছে। বাতাসে মশারিটি কাঁপছে।

গত রাতের দুশ্চিন্তা হালকা মনে হল বরুয়ার। বিছানা থেকে নেমে আসতে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বলল, 'নরেন চলে যাচ্ছে।'

ঘুমচোখে অস্পষ্টভাবে দেখা স্ত্রীর মুখের দিকে অল্প সময় তাকিয়ে থেকে কিছু একটা ভেবে বরুয়া বললেন, 'চলে যাক।' 'যাক' বলতে বেশি সময় লাগল না। নরেন ভিতরে এসে বলল — 'আমি চলে যাচ্ছি।' বরুয়া দৃঢ়কণ্ঠে বললেন — 'বেশ ভাল কথা— যাও।' তারপর নরেন দপ্‌দপিয়ে বেরিয়ে গেল।

বের হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ও বরুয়া দু-জন তাকিয়ে রইলেন। পুবের জানালা দিয়ে দেখল — একটি রিকশা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দেখলেন, নরেন ওঠার পর রিকশা ছেড়ে দিল। স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে জানালার রড ধরে রিকশাটি চলে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলে। বরুয়া স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে একবার বলবেন ভেবেছিলেন — 'এই মোহগুলি বড্ড ভুল মনোরমা।'

কিন্তু তা না বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মনে হল আজ দিনটি খারপই যাবে। তা ছাড়া অন্তর শূন্য হয়ে পড়ল। এ ঘরের মালিক, এ ঘরের হর্তাকর্তা নিরুপায় হয়ে পড়লেন।

হয়তো দুর্দশার আরও বাকি ছিল। সময়ে দৃঢ়চিত্ত মানুষেরেও মন উথাল-পাতাল হয়, চারদিকের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিজের মনোবল এক পা এক পা করে হারিয়ে যেতে থাকে।

নরেন বিয়ের সময় বলতে এসেছিল। তারও আগে মেয়ের বাবা বরুয়াকে সম্মত হওয়ার জন্য অনেকবার অনুরোধ করতে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে। নিজের স্ত্রী পর্যন্ত হার মেনে গেছে। আজও শেষবারের মতো মেয়ের বাবা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করার জন্য বলতে এসেও বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। তারপর এসেছিল বরুয়ার স্ত্রী, ছেলে মেয়েরা। সবাইকে একই কথা বলে দিয়েছেন, 'কেউ যদি বিয়েতে যায় যেতে পারে। কিন্তু ফিরে এসে দেখবে সে এ ঘরের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে আর আমি ভাবব যে আমি কয়েকটি মনুষ্যরূপী পশুকে জন্ম দিয়েছি এবং সেগুলির মা আমার স্ত্রী স্বয়ং।

তারপর শেষবারের মতো আজ নিজের স্ত্রী এই সন্ধ্যাবেলায় যখন এসে একবার মাত্র গিয়ে আসার জন্য অনুমতি চেয়েছিল তখনও বরুয়া সেই একই কথা বলেছেন। কিন্তু বলার মধ্যে আগের সেই দৃঢ় মনোভাব ছিল না। তারপর নিঃশব্দে কেঁদে ওঠা,

তাঁর বাধ্য স্ত্রীর দিকে মন খারাপ করে চেয়ে থাকলেন কিছু সময়।

বরুয়ার মনে হল — নিজের মতের মানুষ এ-বাড়ি থেকে ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে — এই সন্তানগুলি, নিজের স্ত্রী তাঁর কথা বিপদে পড়ে অসহায় হয়ে শুনছে। নিজের ছেলের বিয়ে দেখতে কোন মা-র মন চায় না! নিজের দাদার বিয়েতে ভাই বোনদের স্ফূর্তি করবার ইচ্ছা কি হয় না?

এই যে ঘরের নিয়ম-শৃঙ্খলা শিথিল হয়ে পড়ল, এই যে একজন একজন করে নিজের সন্তানগুলি নিজেদের মতামত তাঁর সামনে ব্যক্ত করতে পারছে, ওরাও যদি বিদ্রোহ করে তাঁর অমতে চলে যায়, তাহলে বরুয়া কি একা থাকতে পারবে! সন্তানেরাও নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে। ওরাও একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাঁর মতো ভাবতে শিখবে একদিন।

ভেবে ভেবে বরুয়া দুর্বল শরীরটি নিয়ে বহুবার ঘর-বাহির করলেন। অল্প দূরের মাইকে বাজতে থাকা সানাইয়ের সুর লুকিয়ে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলেন। এই মাইক কোথায় বাজছে বরুয়া জানেন। কেন বাজছে তা-ও জানেন এবং এ-ও তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন — নিজের আশা পূর্ণ না হয়েই চুরমার হয়ে গেল, তেমনই এই বৃদ্ধ বয়সে কেমন এক শূন্যতা অনুভব করলেন। সংসার যেন কোনো কালেই করেননি — তিনি যেন নিস্বঃ নিসঙ্গ একাকী। বরুয়া ধীরে ধীরে নিজের স্ত্রীর ঘরে চলে এলেন। স্ত্রী বিছানায় বসে ছিল। বেশি সময় না দাঁড়িয়ে বরুয়া বলল, 'তেমরা নরেনের ওখান থেকে একবার ঘুরে এসো।'

তাঁর স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। বরুয়া আবার বললেন — 'দেরি হলে ছেলে হয়তো বেরিয়ে যাবে।'

আবার অল্প সময় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার বাক্স থেকে ভালো ধুতিটি নিয়ে যেও, ও পাত্রীর বাড়ি রওয়ানা হবার সময় দিও।'

তারপর বরুয়া বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, বরুয়া বুঝতে পারলেন — কলপারে জল তোলার শব্দ, বালটি টানাটানির শব্দ, বাক্স খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। আবার কিছুক্ষণ পর পোষাক পরা হয়ে গেল পায়ের জুতোর শব্দ; সেন্টের গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

তার পর ঘরটি একসময় নিঃশব্দ হয়ে গেল।

নরেনকে বের হতে দেখা সেই পুবের জানালা দিয়ে বরুয়া দেখল, কয়েকজন লোক বের হয়ে গেল।

ঘরটি যেন বড্ড শূন্য হয়ে পড়ল।

বন্ধ ঘরটিতে বসে থাকতে বরুয়ার ইচ্ছা করল না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন — জ্যোৎস্না আগের মতোই ছড়িয়ে আছে। মাইকের শব্দ আগের মতোই ভেসে আসছে।

বাইরের মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, চারদিকে তাকিয়ে বরুয়া ভাবলেন — কোথায় যেন তাঁর বিরাট পরাজয় ঘটল, কোথায় যেন তাঁর কর্তৃত্ব ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল।

তথাপি যেন তাঁর মন খারাপ লাগছে না।

হাতের লাঠির ডাঁটি দিয়ে সামনের বন-জঙ্গল কুপিয়ে কুপিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বারান্দায় এসে বসে মাইক বাজতে থাকা সানাইয়ের সুর একমনে শুনতে শুনতে বরুয়া ভাবলেন, ও থাকলে আজ এই সুর এ বাড়ি থেকে অন্যদিকে ভেসে যেতে পারত।

।। অনুবাদ : তিমির দে ।।

বৃষ্টি

নিরুপমা বরগোহাঞি

বৃষ্টি শুরু হলো সাড়ে আটটায় — হঠাৎই মুষলধারায় পড়তে লাগল। সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা ছিল, তবুও বন্দনা ভাবতেই পারেনি যে এত শিগগিরই এমন জোরে বৃষ্টি নামবে। আকাশে কালো মেঘ জমলেও বৃষ্টি নিয়ে আসার আবহাওয়াটা অন্যরকম হয়, এবং সেই লক্ষণ দেখেই বন্দনা ভেবেছিল এখনই বৃষ্টি আসবে না। আর এলেও এমন প্রবলভাবে ঝরবে না। হয়তো ঝিরঝির বৃষ্টিই হবে। কিন্তু সব হিসাবকেই ভ্রান্তপ্রমাণিত করে হঠাৎই প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

সকাল সাড়ে আটটার সময় বন্দনা ছাড়া ঘরের অন্য কেউই চান সারে না। স্বামী অনিল অফিস যাবার আগে প্রায় সাড়ে ন'টার সময় তাড়াহুড়ো করে গা-টা ভিজিয়ে নেয়। ভন্ আর লুকু তো পারলে শুধু শীতের সময়ই নয়, জুন জুলাইয়ের প্রচণ্ড গরমেও চান না-করে থাকতে চায়। তবে এই ব্যাপারে বন্দনা ভীষণ কড়া — কোনো ঋতুতেই ছেলেমেয়েদের চান না-করে থাকতে দেয় না। বন্ধের দিন হলে একটু দেরি করে এবং স্কুল থাকলে সকাল ন'টায় ভন ও লুকুকে নাইতে যেতেই হবে।

সুতরাং এখন সাড়ে আটটায় শুধু বন্দনাই কাপড় মেলে দিচ্ছিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনে তখনি কেরোসিনের স্টোভটার আগুন কমিয়ে আলুভাজার কড়াইটা তার উপর রেখে বাইরে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়গুলো তুলে আনতে গেল। কিন্তু বৃষ্টি অ্যাতো জোরে দিচ্ছিল যে তাড়াহুড়ো করা সত্ত্বেও তার আর্ধেক শুকনো কাপড় এবং সঙ্গে সে নিজেও অনেকটা ভিজে গেল।

বারান্দার মোড়াটার উপর কাপড়গুলো রেখে বন্দনা এবার ঘরের দিকে ছুটল। শুধু তো বৃষ্টিই নয়, সাথে বাতাসও আছে আর তাতে খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে যে খাট, চেয়ার, মেঝে সব ভিজিয়ে দেবে, এতো জানা কথাই। একটু আগে আসা কাগজটাতে অনিল এতোটাই মগ্ন থাকবে যে বৃষ্টি এসে তার ঘর কেন, তার শরীরটাও যদি ভিজিয়ে দিয়ে যায়, সে বোধহয় জানবে না। আর ভন-লুকুর তো এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। তারা তো সাংসারিক সব ব্যাপারে মায়ের উপর নির্ভর

করেই বেঁচে আছে।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ঘরে ঢুকে বন্দনা দেখল, বাতাসে জানলার পর্দাগুলো উড়ছে আর তার সাথে বৃষ্টির ছাট এসে বিছানায় পড়ছে, মেঝেতে পড়ছে কিন্তু সেই ঘরেই পাঠরত ভন্-লুকুর কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। একটু রাগ দেখিয়ে বন্দনা যখন সশব্দে জানালাগুলো বন্ধ করল তখনই যেন তাদের হুঁশ হল যে বৃষ্টি পড়ছে।

'মা, এতো জোরে বৃষ্টি পড়ছে, কী স্কুলে যাব?' দুই ছেলেমেয়ে একসাথে চিৎকার করে উঠল।

অন্য ঘরটাতে যেতে যেতে বন্দনা উত্তর দিল, 'তোরা স্কুলে যাবার আগে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। এতো জোর বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না।

অন্য ঘরে তখন অনিল বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে ট্রিবিউন পড়ায় মগ্ন। জানলার উড়তে থাকা পর্দা বুঝিয়ে দিল যে ছেলেমেয়েদের মতো তাদের বাবার পৃথিবীতেও তখন পর্যন্ত বৃষ্টির অস্তিত্বই নেই।

বন্দনা খিঁচিয়ে উঠল — 'কী রস যে পাও এই খবরের কাগজে কে জানে! ঝড় বজ্রপাত হয়ে জগৎ সংসার ভেসে গেলেও কোনো খবর থাকে না!'

'ওহো', — অনিল প্রথমে একটু চমকে উঠল, তারপর বন্দনাকে দেখে বলল — 'কিছু বলছিলে?'

বন্দনা এবার আরো গরম হয়ে উত্তর দিল — 'না কিছুই বলিনি। শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে হাতে কাগজ থাকলে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প কিছুই তোমাকে টলাতে পারে না। আর জানলা দিয়ে এসে বৃষ্টির সামান্য ছাট বিছানাটা যদি ভিজিয়েই দেয়, তো কি এমন সাঙঘাতিক ব্যাপার হল, তাই-না?'

'বৃষ্টি পড়ছে নাকি? সত্যি আমি বুঝতেই পারিনি। মানে, আজকের কাগজের পলিটিক্যাল কমেন্টারিটা এমন এবসর্বিং হয়েছে, আমি তাতেই ডুবে গেছিলাম। ছিঃ এমন ভীষণ বৃষ্টি এসে গেল। বিছানাটা কি জানি ভিজেই গেছে।'

'ভিজলো তো ভিজলো — কী ই বা হলো তাতে! রাত্রিবেলা সেই কাগজের লেখাগুলো পড়তে পড়তে ঘুমিয়ো, ভেজা না শুকনো টেরই পাবে না।'

'আঃ, এতো রাগ করছো কেন? আমি কি ইচ্ছা করে জানলা বন্ধ করিনি? কিন্তু তোমাকেই বা জানলা বন্ধ করতে আসতে হল কেন? যোগকে পাঠাতে পারলে না?'

'যোগ গেছে বাজারে আর তাই আমাকেই ভাত রান্না করা এবং দৌড়ে এসে জানলা বন্ধ করা সবই করতে হচ্ছে। সত্যি, ঘরের সব ব্যাপারেই বাপ-ছেলে-মেয়ে একেবারে এক — সম্পূর্ণ উদাসীন।'

'এই বৃষ্টিতে যোগকেই বা বাজারে পাঠাতে গেলে কেন?'

'তাই তো, কেন পাঠালাম! এদিকে তো মাছ মাংস একটা কিছু না হলে নিজের এবং দুই ছেলেমেয়ের মুখে ভাত ঢুকতে চায় না। সেই জন্যই তো তাকে মাছ আনতে পাঠালাম। তা ছাড়া ওকে যখন পাঠাই তখন বৃষ্টির নামগন্ধই ছিল না।'

'আমি কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা না-থাকলেও তাকে আজ পাঠাতাম না, কেননা কাল আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলেছিল আজ বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি হবে।'

বন্দনা এবার ফিক করে হেসে উঠল — 'এই বোধহয় প্রথমবার পৃথিবীর ইতিহাসে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সত্য বলে প্রমাণিত হল।'

অনিলও হাসল। বন্দনা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু অনিল হঠাৎ খপ করে তার একটা হাত ধরে বলল — 'দাঁড়াও, দাঁড়াও বন্দনা, কোথায় যাও? এমন মুষলধারে বৃষ্টিপড়া দেখার সুযোগ তো বেশি আসে না। চলো না দুজনে মিলে সামনের বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখি গে। নিশ্চয়ই নারকেল গাছগুলো এখন খুব জোরে মাথা নাড়ছে, সামনের পাহাড়টা বোধহয় বৃষ্টিতে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, কাকটা হয়তো জড়োসড়ো হয়ে গাছের ডালে বসে আছে...।'

বন্দনা এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। কী একটা লোভ তাকে যেন একটু সময়ের জন্য সাংসারিক কর্তব্যভ্রষ্ট করে তুলতে চাইল। কিন্তু আবার পর মুহূর্তেই তার সামনে সংসারটা প্রাচীরের মতো এসে খাড়া হল — যোগ বাজারে, স্টোভের উপর অল্প আঁচে বসানো আলুভাজা, ভন্-লুকুর স্কুল, অনিলের অফিস — আর ওদিকে ঘড়ির কাটা নয় ছুঁই ছুঁই করছে।

'বাঃ বৃষ্টির রূপের দিকে চেয়ে থাকলেই সংসার চলবে? যোগ নেই, রান্না হয়েছে অর্ধেক, ভন্-লুকুর স্কুল, তোমার অফিস— সব কিছু ছেড়ে এই মুহূর্তে বাইরে গিয়ে বসার কি জো আছে? দেখি, হাতটা ছাড় —'

রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভের আগুন বাড়িয়ে দিয়ে আলুগুলো হাতা দিয়ে নাড়তে নাড়তে বন্দনার মনটা কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অল্পক্ষণ পরেই অনিল ভাত খেয়ে অফিসে চলে যাবে। বৃষ্টি না-ছাড়লে ছাতা নিয়ে রিক্সা করে হলেও যাবে এবং রিক্সার ভেতরে বসে আধভেজা হয়ে অসময়ে আসা বৃষ্টির না-কমে যাবার উপর বিরক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু এমন দিনও জীবনে এসেছিল যখন অফিসে যাবার সময় এমনি বাঁধন ছাড়া বৃষ্টিকে অনিল আশীর্বাদ বলে ভাবতো, বন্দনাও তাই। তখন তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র। এমন অবিরাম বৃষ্টি থাকলে অনিল তখন পারতপক্ষে অফিসে যেত না। এভাবে তার কত যে কেজ্যুয়েল লিভ সে খরচ করত তার হিসেব থাকত না। বন্দনা এমন

একটা বাড়ি থেকে এসেছিল যেটা সবসময় লোকে গম্‌গম্ করত। নিজেরা সাত ভাই-বোন ছাড়াও বিধবা পিসি ও তার মেয়ে — সবাই মিলে বাড়িটা পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। কিন্তু অনিলের সাথে বিয়ে হবার পর তাকে শুধুমাত্র অনিলকে নিয়েই সংসার করতে হল। অনিলের মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই থাকত তাদের নিজেদের আসল বাড়িতে এবং চাকুরে অনিলকে থাকতে হত সবাইকে ছেড়ে অন্যত্র। অনিলের অনুপস্থিতির সময়টা বন্দনার ভীষণ নিঃসঙ্গ একা একা লাগত, কী যেন এক অসীম শূন্যতার মধ্যে সে ডুবে যেত — যে-শূন্যতার তল সে খুঁজে পেত না। সেলাই করে আর বই পড়ে কতটা সময়ই বা কাটান যায়, মনটা ছটফট করে উঠত। তেমন অবস্থায় যখনই অনিল বাড়িতে থাকত, বন্দনার দিনটা হত সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ আনন্দময়, আবেগে উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। শুধুমাত্র বিয়ের পরে প্রথম প্রেমের নতুন স্বাদের আনন্দই নয়, তার শূন্যতা দূর করার পূর্ণতার আনন্দও তাতে মিশে থাকত। তাই সেইসব দিনে বিরামহীন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে বন্দনার কী যে ভালো লাগত! সেই দিনগুলোতে বৃষ্টি ছিল তার কাছে বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ।

কিন্তু তেমন দিন জীবনে কদিনই বা ছিল। বিয়ের পর বছর পেরোতে না পেরোতেই ভন্ এলো তার কোলে আর বন্দনার নিঃসঙ্গ দুপুরের সুদীর্ঘ শূন্যতা সেই ছোট্ট ভন্ পূর্ণ করে তুলল। তখন বৃষ্টির দিনে অনিল আর অফিস কামাই করত না আর বন্দনাও বৃষ্টিকে আশীর্বাদ না-ভেবে অভিশাপ বলে ভাবতে লাগল, কারণ বৃষ্টি দিলেই বাচ্চার কাপড়চোপড় শুকোনো এক বিরাট বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে উঠত।

'দিদিমণি, এই নিন মাছ। আমি একেবারে ভিজে গেছি। কাপড় না-বদলে রান্নাঘরে ঢুকতে পারব না।'

এতক্ষণ বন্দনা এতোটাই তন্ময় হয়ে ছিল যে যোগের কথায় হঠাৎ চমকে উঠল।

'ইস্ যোগ, তুই দেখছি ভিজে নেয়ে একশা হয়ে এসেছিস। এত বৃষ্টির মধ্যে চলে আসার কি দরকার ছিল? কোনো দোকান-টোকানে তো ঢুকে থাকতে পারতিস।

'দিদিমণি, আমি তো বাজারে গিয়েই মাছ কিনে নিয়েছিলাম। বৃষ্টি তো এলো তার পর। তখন বাজারের চালের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু বেশ কিছু সময় থাকার পরও যখন দেখলাম বৃষ্টি ছাড়ার কোনো লক্ষণই নেই তখন আর ভেজা-টেজাকে কেয়ার না-করে চলে এলাম। না হলে যে বাবু ও ভনেরা মাছ খেতে পাবে না।... মাছ কয়টা ধরুণ দেখি দিদিমণি, আমি ঝটপট কাপড় বদ্‌লে মাছ কেটে-বেছে দিচ্ছি। তবেই না বাবুদের একটু মাছ অন্তত ভেজে দিতে পারবেন।'

যোগ ছেলেটি বেশ ভাল, দায়িত্বশীল এবং সহানুভূতিশীল। বন্দনা মনে করে তার

মতো ভৃত্যভাগ্য বোধহয় গুয়াহাটির কম মহিলারই আছে।

এদিকে বৃষ্টি কিন্তু পড়ছেই এবং সেই একই মুষলধারায়। চান-টান সেরে এসে অনিল ভাতের জন্য উপস্থিত হল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিপূর্ণ মুখে বিড়বিড় করতে লাগল — 'এতো মেঘ যে কোথা থেকে এসে জমা হয়েছে কে জানে! এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণের পরও থামবার কোনো লক্ষণই নেই।'

বন্দনাও তার কথায় সায় দেয়। অল্পক্ষণ পরে বলে — 'ভন্-লুকুকে বলে এলাম তাড়াতাড়ি চান করে স্কুলের জন্য তৈরি হতে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে পাঠাবোই বা কি করে! ছাতা নিলেও তো ভিজে যাবে।'

'আজ ওদের স্কুলে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। ঘরে যেন পড়াশুনা করে সেদিকে একটু নজর দিয়ো।'

'ইস্, বৃষ্টিটার জন্যেই ছেলেমেয়ে দুটোর স্কুলের ক্ষতি হয়ে গেল। কী যে বিচ্ছিরি বৃষ্টি এসে উপস্থিত হলো।'

মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও বন্দনা তার মনের ভেতর এক ধরনের আনন্দ যেন অনুভব করতে লাগল। ভন্-লুকু আজ ঘরে থাকবে — গ্রীষ্মকালের একটি সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ দিন ওদের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে থাকবে। ঠিক বিয়ের পরের সেই নিঃসঙ্গতাই যেন আজ বিয়ের চৌদ্দ বছর পর আবার তাকে গ্রাস করে ফেলল। এটা ঠিক যে ভন্-লুকুর জন্ম, তাদের শৈশব সাময়িকভাবে তার নিঃসঙ্গতা দূর করেছিল, কিন্তু এখন তারা বড়ো হয়ে ওঠার পর আবার যেন আগের মতোই তাকে একা ফেলে অনিলের অফিসে চলে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে। ফলে তার দুপুরগুলো আবার হয়ে পড়েছে আগের মতোই নির্জন, গভীর, বিষণ্ণ। সময় কাটানোর জন্য ওদের আর সন্তানও জন্মায়নি — জন্মায়নি মানে তারা জন্মাতে দেয়নি। একটা ছেলে ও একটা মেয়ে হবার পর ওরা জানে আর সন্তান কামনা করা উচিত নয়। তাই বন্দনা আর কোনোদিন সন্তান এসে তার কোল ভরে দেবে বা নিঃসঙ্গতা দূর করে দেবে — এমন আশা করে না। কিন্তু দিনগুলো যে তার নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। যোগ কাজের ছেলে, ভালো ছেলে এবং তাই ঘরোয়া কাজের জঞ্জালও বেশি নেই বন্দনার। তাই দিনগুলো হয়ে পড়েছে আবার সেই বিবাহোত্তর দিনগুলোরই মতো — সেলাই করা আর বই পড়া। কিন্তু এর কোনোটোতেই তার নেশা নেই। আর তাই সারাদিন ছটফট করা, বিরক্তিতে হাই তোলা, ঘরের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে এটা সেটা করে সময় কাটাবার প্রচেষ্টা — এ-ই তার বর্তমান জীবন। সত্যি, মানুষের জীবনে সময় যে কতটা দুঃসহ হতে পারে, তার বোঝা যে কতটা ভারী হতে পারে, বন্দনা এখন

বুঝতে পারছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিলের মতোই বন্দনাও বিরক্তি প্রকাশ করল, ছেলেমেয়ে দুটোর অনর্থক স্কুল ক্ষতি হল বলে উদ্বেগ প্রকাশ করল, কিন্তু মনের একটা কোণ আসন্ন দুপুর বেলাটোর শূন্যতা ও দীর্ঘতা কমে যাবার আশায় কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বৃষ্টি মুষলধারে পড়তেই থাকল।

।। অনুবাদ : ড. পরাগ দাশগুপ্ত।।

তৃতীয় নেত্র

নিরোদ চৌধুরী

লোকটা একটু ছোট-খাটো ধরনের। বয়সের ভারে আরও একটু কুঁজোও হয়ে গেছে। হাতে একটা বেতের লাঠি।

পানবাজার কলেজ হোস্টেল রোডের পার্শ্ববর্তী প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীদের সেই জায়গাটা প্রায় সকলেরই চেনা। আমরা ছোটবেলা থেকেই গুয়াহাটির সেই জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত। এখন অবশ্য মহানগরীতে রূপান্তরিত হওয়ায় গুয়াহাটিতে এইধরনের দেব-দেবীর মূর্তি গড়া কারিগরদের সংখ্যাও প্রচুর হয়েছে। আগে ততটা ছিল না। তখনই দেখেছিলাম লোকটাকে।

কখনও বা মাটির প্রলেপ লাগাতে, কখনও বা খড়ের মুঠি বাঁধতে। কখনও কখনও রঙের তুলি নিয়ে মুখে রঙ লাগাতেও দেখেছি লোকটাকে। আবার, কখনও বা দেখা গেছে মূর্তিগুলোতে বিভিন্ন রূপে রঙ-বেরঙের কাপড় জড়াতে।

গুয়াহাটিতে সাধারণত প্রতিমাগুলো স্থানীয় মৃৎশিল্পীরাই সাজাত। অবশ্য তার মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল উজান বাজারের স্বর্গীয় বরদা বিষয়ার সরস্বতীর মূর্তি। উনি সেটা কলকাতার শিল্পীকে দিয়ে গড়িয়েছিলেন। ঠিক তেমন ভাবেই ব্যতিক্রম ছিল তখনকার গুয়াহাটির নদীর পারে প্রতিষ্ঠিত পুরনো খুব সুন্দর মনোহর আকৃতির ওরিয়েন্টেল বিল্ডিঙের দুর্গা পুজোর প্রতিমা। সেটাও মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আসা মৃৎশিল্পীর বানানো। তখনকার গুয়াহাটিতে সেটাও ছিল এক অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সেটা দেখার জন্য মানুষের ভিড় উপ্‌চে পড়ত।

আজ সেগুলো অতীত হয়ে গেছে, এখন নতুন নতুন আকৃতির দেব-দেবী দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতাতে তা নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না করা হচ্ছে। একবার তো একটা দুর্গা প্রতিমা মসুর ডাল দিয়ে বানানো হয়েছিল। আবার, একবার শুধু-মাত্র শোলা দিয়ে।

কলেজ হোস্টেলের সেই জায়গাটা সব সময়ই উৎসবমুখর হয়ে থাকে। স্কুলে যাওয়ার সময়, আমার ছেলেটা একবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এবার কী পুজো?'

প্লাস্টিক বা ত্রিপলের অস্থায়ী চালের নিচে প্রত্যেক মাসেই কোনো না কোনো দেব-দেবীর মূর্তি থাকে, আর যে মাসে থাকে না বা দেখতে পাওয়া যায় না, সম্ভবত তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন আকৃতির মূর্তি দেখে স্বভাবতই তার মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

আজকাল সেই বুড়ো লোকটা কিছু করে না, হয়তো তার অধীনে বিদ্যাটা রপ্ত করা কম বয়সী শিল্পীরাই সেই কাজটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

লোকটাকে কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়। কখনও বা দূর থেকে দাঁড়িয়ে নির্মীয়মান প্রতিমূর্তিগুলো নিরীক্ষণ করতে, কখনও বা রঙ না-করা খড়ের আকৃতিগুলোকে ছুঁয়ে দেখা, আবার কখনও বা প্রতিমূর্তির চোখ দুটোর ওপর হাত বোলাতে। ঠিক যেন নিজের ক্ষীণ হয়ে আসা চোখের জ্যোতির বিফল শক্তি দিয়ে দেব-দেবীর চোখের জ্যোতিকে অনুধাবন করার খানিকটা চেষ্টা।

আবার কখনও দেখি, কটন হোস্টেল চৌহদের গেটের সামনে বসে অবাক দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে। কেউই তাকে লক্ষ করে না। শীতকালের রৌদ্রের দিকে অথবা এমনি বসে থাকা মানুষগুলোকে দূর থেকে নীরবে চেয়ে থাকে। কেউ বা ট্রাকে, কেউ কেউ বা ঠেলা গাড়িতে, রিক্সাতে এক একটা প্রতিমা নিয়ে যায়। অনেক ভক্ত সমস্বরে সহর্ষ ধ্বনি তুলে চিৎকার করে, দেব-দেবীর জয় ঘোষণা করে, কেউ বা হয়তো চলতি হিন্দি সিনেমার গানের কলি ভাজে।

লোকটা চুপচাপ সব দেখতে থাকে। নিজে কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় গড়া মূর্তির যে সজীবতা সেই সময় হয়তো যা দেখতে পেয়েছিলেন, তার স্রোতের ভাটা বা কিছুটা ক্ষীণতা আজ যেন চোখে পড়ে। তথাপি আনন্দ, সহস্রজন সেইসব মূর্তিকেই ভক্তিসহকারে সেবা করবে। আর সেগুলোই তো জীবন্ত ভগবান হয়ে দেখা দিবে। বিশুদ্ধ এক আনন্দে মন ভরে ওঠে।

কতদিন আগে থেকেই লোকটাকে শুধু লক্ষই করে আসছি। কোনো দিনই কথা বলিনি। প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু শৈশব থেকে দেখে আসা মানুষটার প্রতি একটা মোহ মনের ভেতরটায় পালন করে আসছিলাম।

একদিন সুযোগ এল।

আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম যে সবসময় গেটের মুখে বসে মানুষটা একটা ছোটো প্লাস্টিকের আয়না নিয়ে নিজের মুখটা দেখতে থাকে, খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার যেন একটা চেষ্টা। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা পাত্তা দিইনি।

একদিন দেখলাম খুব যত্ন করে আয়নাটা পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে। হাসি

পাচ্ছিল। এই বুড়ো বয়সে নিজের মুখ দেখার এমন অস্বাভাবিক প্রয়াস।

তারপর থেকে আমার এক নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস হয়ে গেল ছেলেটাকে স্কুলে দিতে যাওয়ার সময় বুড়ো মানুষটাকে দেখা। আসতে বা যেতে সবসময়ই প্রায়ই তাকে বসে থাকতে দেখা যায়। কখনও বা আয়নাটা হাতে থাকে, আবার কখনও বা থাকেও না।

একদিন লক্ষ করলাম, লোকটা মূর্তি গড়ার মাটি হাত দিয়ে গোলাচ্ছে। ভাবলাম, দেব-দেবীর কোনো বিশেষ অঙ্গ হয়তো তিনি গড়ছেন। এতদিনের সাধনা অভ্যাস এত সহজে নিঃশেষ হয়ে যায় কীভাবে?

তারপর কিছুদিন লোকটাকে আবার নির্বিকার অবস্থায় দেখলাম। মুখে বিমর্ষতার প্রকাশ। দৃষ্টিতে অবাক হওয়ার অজস্র প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

তখন পুজোর সময়। ঘরের সামনে রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র দুর্গার প্রতিমূর্তি। কোনো জায়গায় অগ্নিশর্মা অসুরের রুদ্র মূর্তি। কোথাও বা রোদে শুকোতে দেওয়া লক্ষ্মী প্যাঁচা আর ইদুঁর।

উঁচু উঁচু প্রতিমূর্তিগুলোর মাঝখানে ছোটো-খাটো মানুষটা চোখেই পড়ে না।

একদিন সেদিক দিয়ে আসার সময় রাস্তার ধারে রাখা একটা প্রতিমার কাছে লাঠি হাতে মানুষটাকে দেখে রিক্সো থেকে নেমে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। মানুষটা মূর্তির একদম সামনে গিয়ে কিছু যেন একটা খোঁজার চেষ্টা করছিল।

লোকটা ঘুরে দেখলো। চারচোখের মিলন হল।

আমি নমস্কার জানিয়ে বললাম — 'আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

ভাবলেশহীন ফ্যাকাসে চোখদুটো। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল। অন-অসমিয়া লোকটাকে অসমিয়াতে বললাম — 'আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে জানি, আমি ছোটবেলা থেকেই আপনাকে দেখে আসছি।'

লোকটা সম্ভবত নাটকীয় পরিবেশটাকে ঠিক হজম করতে পারছিল না। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য আমিই তখন বললাম — 'চলুন, ওখানে বসে কথা বলি।'

আমি গেটের দিকে ইশারা করে তাঁর পিঠে হাত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

রঙচটা হাওয়াই স্যান্ডলটার অবস্থা নেই। লোকটা লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুন্দর অসমিয়া ভাষাতে উনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তর

দিয়েছিলাম, এরপর আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলাম — 'আমি কয়েকদিন ধরেই লক্ষ করছি আপনি একটা আয়না নিয়ে নিজের মুখটাকে দেখতে থাকেন, তারপর আবার কাদা-মাটি দিয়ে কিছু একটা যেন গড়তে থাকেন। কিসের জন্যে?'

পরীক্ষাগৃহে নকল করে ধরা-পড়া পরীক্ষার্থীর মতো লোকটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে কিছু না-জানার ভান জুড়ে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তখন সমগ্র ঘটনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলাম। অর্থাৎ আমি যে পুরো ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবগত সে সম্পর্কে তাঁকে একটা স্পষ্ট ধারণা দিলাম।

কিছুক্ষণ মৌনী থাকার পর উনি মুখ খুললেন। বললেন — 'যেই প্রশ্নটা কেউ কোনোদিনও করেনি, সেটাই তুমি জিজ্ঞাসা করলে। আমি তোমাকে কথাটা বলছি। কিন্তু কাউকে বলবে না।'

সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকটা একবার দেখে নিলেন লোকটা। রাস্তার ধারে শুকোতে দেওয়া রং না দেওয়া দুর্গার মূর্তির দীর্ঘ ছায়াটা আমার গায়ে এসে পড়েছিল।

আমার হাতের উপর তাঁর শীর্ণ একটা হাত রেখে বললেন — 'আমি আসলে আমর মুখটা বানানোর চেষ্টা করছিলাম। জীবনে বহু মূর্তি বানিয়েছি। অনেক মুখের আকৃতি দিয়েছি। এই বয়সে এসে ভাবলাম আমি কত দক্ষ শিল্পী এবার একটু যাচাই করি।'

সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা করলাম — 'কি হলো?'

একটু থেমে বুকে হাত দিয়ে দুবার কেশে বললেন — 'হলো না, বাবা, হল না!'

'কি হল না?'

রোগী যেমন ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তেমন একটা সকরুণ দৃষ্টি হেনে মানুষটা বলল — 'আমার মুখখানা হল না। যতই গড়ি তাতে করে শুধু একটা মুখই হয়। সেটা ত্রিনয়নী দেবী দুর্গার।'

আমি আর কিছু প্রশ্ন করলাম না। লোকটাও আর কিছুই বলল না। উঠে আসার সময় এখানে-ওখানে সাজিয়ে রাখ দুর্গা প্রতিমার মুখগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি একটা মুখই দেখতে পেলাম।

লোকটার মুখ। যে নাকি নিজের মুখখানা গড়ে উঠতে পারল না।

মধুপুর

শীলভদ্র

আবেগে না ভেসে নিরাসক্ত ভাবে নিজের জন্মস্থানের কথা লেখা সত্যিই খুব কঠিন। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি জীবনের বেশির ভাগ সময় নিজের জন্মস্থান থেকে দূরে থাকেন, তিনি যে ছবি নিজের মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছেন তা অনেক পুরনো, এখনকার ছবির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই।

মধুপুরের ধারাবাহিক বিবর্তনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ কখনও মধুপুরে গেলে যে সমস্ত দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পাব বলে আশা করে যাই, সে সব ছবির দেখা মেলে না। লোকজনের থেকে যে ধরনের আন্তরিকতা পাব বলে ভাবি, তা-ও পাই না। তা সম্ভবও নয়। আমি তো এখন একজন বহিরাগত। মধুপুরের এখনকার কর্মকাণ্ডে আমার কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই। আমাকে বাদ দিয়েই মধুপুর চলছে আর চলতে থাকবে।

মধুপুরের কথা ভাবলে আমার চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে, তা কয়েক দশক আগের ছবি। মধুপুর এক জায়গায় স্থির হয়ে থেমে নেই, পরিবর্তনশীল জগতে মধুপুরের মানুষ জনেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যুক্তি দিয়ে এ কথা বুঝলেও মন থেকে মেনে নিতে পারি না। মুশকিল এখানেই মধুপুরে যা যা পরিবর্তন এসেছে তা আমি থাকলেও আসত।

আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন এই গুয়াহাটি কী ছিল, আর আজ কী হয়েছে? জাগতিক এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিকতাও কি আমূল বদলে যায়নি? গুয়াহাটি আজ এক মহানগর। 'বি ক্লাস সিটি'। তখন কী ছিল? শহরও বলা যেত না। গাছপালায় ভরা কয়েকটা বিচ্ছিন্ন গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা জনপদ মাত্র। এখানকার সংস্কৃতিও ছিল গ্রাম্য সংস্কৃতি। তা হবে নাই বা কেন? বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা লোকজনেই তো শহরে থাকত। তাদেরই বলা হত শহরের লোক। তারা কেউ তো আর শেকড় উপড়িয়ে আসেনি, শহরের মেসে থাকা সহপাঠীদের কোথায় বাড়ি জিজ্ঞাসা করা হলে বলত, 'নলবাড়ি', 'বেলশর' ইত্যাদি। কেবল জাগতিক পরিবর্তনই নয়, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক, তবু মেনে নেওয়া যায় না।

আমার চোখের সামনেই মহানগরের পরিবর্তন হচ্ছে। তাই এই পরিবর্তন ক্ষিপ্র হলেও আকস্মিক মনে হয়। মধুপুরে আমি যদি দীর্ঘদিন ধরে থাকতাম, তাহলে মধুপুরের এই পরিবর্তন আমি সহজভাবে মেনে নিতে পারতাম। স্মৃতিগুলো যেহেতু মনের কোণে একান্ত ভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে, তাই সেগুলো এখনও সজীব হয়েই রয়েছে। আমাদের উঠোনের তুলসীতলার দুদিকে দুটো শিউলি ফুলের গাছ ছিল। সকালবেলা ফুলগুলো ঝরে উঠোন ভর্তি করে রাখত। অল্প চেষ্টা করলেই এখনও সেই শিউলির গন্ধ পাই আমি।

দৌড়ে কিছুই নেই। আমরা ছোট থাকতেই উন্নতির শিখরে পৌঁছে ছিল মধুপুর। শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। তার পরে তো শুধুই অবক্ষয়ের ইতিহাস, একটা কুঁড়েঘর জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকতেই পারে, এতে মানুষের কোনও কৌতূহল জাগে না; কিন্তু বিশাল কোনও প্রাসাদের ভগ্নদশা মনে মিশ্র অনুভূতির সঞ্চার করে, এক করুণ অনুভূতি অদৃষ্টের অমোঘ পরিণতির নিষ্ঠুর ইঙ্গিত। 'মাই নেম ইজ ওজিমন্‌ডিয়াস, কিং অব কিংস।' আজ কী করুণ পরিণতি! মনের মধ্যে হয়তো এক রকমের আত্মতুষ্টির ভাবও জাগতে পারে। অজস্র মানুষকে শোষণ করে এই কীর্তিস্তম্ভ গড়েছিলাম, কী হল শেষ পর্যন্ত?

দুই

মধুপুরের সমস্ত কিছুর কেন্দ্রেই ছিল সেখানকার জমিদার, তাঁকে কেন্দ্র করেই সমস্ত লোকের যাবতীয় আলোচনা। দুপুরবেলা কৃষ্ণ ঠাকুর (সেখানে ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলা হয়) চালকুমড়ো পাড়ার জন্য বাড়ির চালে উঠেছিল, আগের দিন আলোকঝারিতে একটা প্রকাণ্ড বাঘ মেরেছিলেন জমিদার। সেদিন এটাই ছিল মধুপুরের আলোচনার বিষয়।

বাড়ির সামনে দিয়ে গগন ঠাকুরকে যেতে দেখে হাঁক পাড়লেন কৃষ্ণ ঠাকুর।

'কোটে হাতে আসলু?'

'আলোকবা বাঘটা দেখি আস্‌নু। বাপ্‌রে কী প্রকাণ্ড বাঘ! দেখ্‌লে ভয় লাগে।'

'কোটে দেখ্‌লু?'

'হাতির পিঠিত তুলি রাজবাড়িত আন্‌ছে। তিনিটা গুলি মারি সেনে মার্‌ছে।'

রাগের চোটে কৃষ্ণ ঠাকুরের চুল খাড়া হওয়ার জোগাড়। এ হল জমিদারের দক্ষতার

প্রতি ইঙ্গিত, একটা বাঘ মারতে একটার বেশি গুলির প্রয়োজন নেই জমিদারের। কৃষ্ণ ঠাকুরও দেখেনি, গগন ঠাকুরও দেখেনি কিন্তু তা-ই নিয়েই ভয়ানক তর্ক, একটা গুলি না তিনটে গুলি? উত্তেজনার বশে টাল সামলাতে না পেরে চাল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলে কৃষ্ণ ঠাকুর, কোমরের ব্যথার সাতদিন শয্যাশায়ী।

মধুপুরের জমিদারকে লোকে রাজা বলে ডাকত। রাজাও নয়, রাজা বাহাদুর, অবশ্য এটা কোনও দোষের কথা নয়। তাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেছিল ব্রিটিশ সরকার,জমিদারের প্রাসাদকেও লোকে বলত রাজবাড়ি, রাজাবাহাদুর আর রাজবাড়িকে কেন্দ্র করেই মধুপুরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। আচ্ছা, ফেলুবাবুর কথা আগে কখনও বলেছি নাকি? বলে থাকলেও বলছি, পুনরাবৃত্তি করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, তিনি ছিলেন কলকাতার এক নাম করা থিয়েটার কোম্পানির সংগীত ও নৃত্য পরিচালক। তিনি মধুপুর এসেছিলেন মধুপুর নাট্য সমিতির পরিচালক হিসাবে; শখের এই নাট্যদলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জমিদার। সমস্ত খরচ জমিদারের। সংস্কৃতির প্রতি জমিদারের গভীর অনুরাগের অন্যতম নিদর্শন, মাঝে মধ্যে নাটক মঞ্চস্থ হত। দর্শকদের জন্য ছিল প্রবেশ অবাধ। অভিনয় করতেন জমিদারের পরিবার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।

তখনকার দিনে মেয়েদের ভূমিকার অভিনয় করত ছেলেরাই। আমরা আমাদের সম্পর্কের জ্যাঠামশাই শরৎ দত্তের অভিনয় দেখিনি। অন্যের মুখেই শুনেছি। সাজাহানের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নাকি ছিল অপূর্ব, সে যুগের কলকাতার স্বনাম ধন্য অভিনেতার অভিনয় প্রতিভার সমতুল্য। প্রফুল্ল দত্তচৌধুরী, ভূদেব অধিকারী প্রমুখ প্রতিভাধর অভিনেতাদের আমরা দেখেছি। মনে আছে জমিদারের বড় ছেলের অপূর্ব অভিনয়। পরবর্তীকালে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে গোটা ভারতে সমাদৃত হয়েছিলনে।

নারী চরিত্রে অভিনয় করা রবীনদা অর্থাৎ রবীন অধিকারীর কথাও ভুলিনি। সার্থক অভিনয়। ব্যক্তিগত জীবনে রবীনদা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির, খুব কম কথাবার্তা বলতেন। তাঁর আরও অনেক গুণ ছিল। তিনি একজন ভাল রেফারিও ছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন সেই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ রেফারি। জেলা শহরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলা হলে তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হত। রবীনদা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মধুপুরের সবার কাছ থেকেই অযাচিত ভাবে অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি আমি।

ফেলুবাবুর সঙ্গে শেষবারের মতো আমার দেখা হয় কলকাতায় প্রায় কুড়ি বছর

আগে। সেখানে মধুপুরের জমিদারের প্রাঙ্গণে ছোট্ট একটা ঘরে। ইতিমধ্যে 'রাজবাহাদুরের' মৃত্যু হয়েছে। জমিদারির অবস্থা পড়তির দিকে। বালিগঞ্জের বিরাট অট্টালিকার প্রায় ভগ্নদশা। দেখাশোনা করার কারও কোনও দায় দায়িত্ব নেই। তখন প্রাক্তন জমিদারের ছোট ছেলের স্ত্রী ছিল সেখানে। খবরটা পেয়ে আমি একদিন এমনিই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি নাকি সম্পর্কে আমার মাসি। কী সম্পর্ক তা আমি নিজেই জানি না ভাল করে। তিনি আপত্তি করলেন।

'তুই হোটেলে উঠেছিস কেন? এত বড় বিল্ডিং পড়ে আছে, আমিও আছি, আজই চলে আয়।' বর্তমানে এ এক পরিত্যক্ত নির্জন অট্টালিকা। আমি নিজেও এই অট্টালিকায় ছিলাম, কী জমজমাট অবস্থা, কী প্রাচুর্যের পরিবেশ। এখন দেওয়ালের পলেস্তরা খসে পড়ছে, হলঘরে মার্বেল পাথরের মেঝে ফেটে গেছে। চারিদিকে ধুলো ময়লা আবর্জনার স্তূপ। আমি নিজেই প্রাচুর্যের কী প্রকাশ চাই না। দেখেছিলাম, বিরাট অট্টালিকা এ দিকে ওদিকে কত ঘর, কত লোকজন। বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন মতলব, মধুপুর থেকে কেউ কলকাতায় গেলে বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকা খাওয়ার অবাধ অধিকার। সেখানে উঠলেই হল, এম এ পড়তে গিয়ে হোটেল বা মেস কোথাও কোনও জায়গা না পেয়ে আমিও কয়েকদিনের জন্য সেখানে গিয়ে উঠেছিলাম। তখনই দেখেছিলাম সেখানে ছিল কয়েকজন চিরস্থায়ী বাসিন্দা। মহানগরে বিনা পয়সার থাকা খাওয়ার সুবিধা, কম সুবিধা নাকি? সবাই যে মধুপুরেরই লোক, তা নয়, পরেশ ঘোষ ছিলেন তবলিয়া, তিনি কেন? ভাল তবলা বাজাতে পারেন, এটাই তাঁর অধিকার, রাজাবাহাদুর কলকাতায় গেলে সেখানে যাতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মজলিশ বসতে পারে। পরেশ ঘোষ তখন ওস্তাদের গানের সঙ্গে সংগত দিতে পারবেন।

আমিই লেগে গেলাম হিসাব করতে। ফেলুবাবু জীবনে কী পেলেন আর কী পেলেন না। রাজাবাহাদুর যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন কোনও চিন্তা ছিল না। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতেন, কখনও বারাণসী, কখনও পুরী আর কলকাতার সঙ্গে তো স্থায়ী সম্পর্ক একটা ছিলই। খরচাপাতি রাজাবাহাদুরের। নাট্য সমিতির পাট কবেই চুকেবুকে গেছে কিন্তু ফেলুবাবু মধুপুরেই থেকে গেলেন। তাঁর নিজের বলতে কিছুই ছিল না, কিছু থাকার প্রয়োজনও বোধ করেননি। ভবঘুরে লোক, জন্ম যাযাবর। শেষবেলায় আশ্রয় নিলেন বালিগঞ্জের বিড়াট প্রাঙ্গণের এক কোণে থাকা ছোট্ট একটা ঘরে। কর্তৃপক্ষ যে তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন, সেটাই তার ভাগ্য।

বহুজনের মাথায় আমাকে দেখে খুব খুশি মানে একেবারে অভিভূত। বাবার কথা বলে তার মাকেই, চোখ দুটো মুছে নিলেন। গাদা গাদা প্রশ্ন। শুধু আমার ব্যাপারেই

নয়। মধুপুরের সমস্ত লোকের ব্যাপারে, কে কোথায় আছে, কে কী করছে, এ সমস্ত অসংখ্য প্রশ্ন।

'অমলের খবর কী? গান বাজনার দলটা এখনও করছে?'

'আপনার খবর কী?'

'খুব ভাল আছি। পেটটা মাঝে মাঝে একটু গড়বড় করে অন্য কোনও অসুবিধা নেই।'

মাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফেলুবাবুর চলে কী করে?'

'ইচ্ছে করলে তো ভালভাবেই থাকতে পারেন। থিয়েটার ও সিনেমা জগতের অনেক নামজাদা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সবাই তাকে পছন্দ করেন। শ্রদ্ধাভক্তি করেন। দু-একজন তো তাঁকে নিজেদের বাড়িতেই রাখতে চান। কানাকাড়ি কিছু নেই কিন্তু মেজাজ আছে ষোলো আনা, জমিদারের সঙ্গে থেকে থেকে জমিদারি মেজাজ পেয়েছেন। পুজো পার্বণে দু-একজন জোর জবরদস্তি করে অল্পস্বল্প কিছু দেন। বয়স হয়েছে, পেটটাও ভাল থাকে না। তেমন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারেন না, নিজে একটা স্টোভে রান্না করে খান। ভাল কিছু রাঁধলে আমাকেও দেন। মুখের ওপর বলতেও পারি না যে লাগবে না, কষ্ট পাবেন।'

পুরনো কথাগুলো জানতে আমার বিশেষ আগ্রহ। কলকাতায় থাকতে ফেলুবাবুর কাছে আরও দু-একদিন গিয়েছিলাম আমি। কোনও ধরনের আক্ষেপ করতে দেখলাম না তাকে। কলকাতার নাম করা থিয়েটার কোম্পানির সংগীত ও নৃত্য পরিচালক ছিলেন। লেগে থাকলে হয়তো গোটা ভারতে নাম করতে পারতেন, জন্মোৎসব পালন করে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান হয়তো তাকে সংবর্ধনা জানাত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলকাতায় থাকলে তো নামযশ হত, টাকাও রোজগার হত। কেন ছেড়ে ছিলেন? এখন আপনার অনুশোচনা হয় না?'

'না রে, কোনও ক্ষোভ নেই, আই ওয়াজ হ্যাপি, এক্সট্রিমলি হ্যাপি ইন মধুপুর, রাজাবাহাদুর আমাকে বললেন যে, তাঁর বড় ছেলে মধুপুরের ছেলে ছোকরাদের নিয়ে থিয়েটার করতে চায়, তা আমি এ সব জানা একজন লোক ঠিক করে দিতে পারব কি? আমি বললাম যে, অন্যলোকের দরকার কি, আমি নিজেই সেখানে কিছুদিন থেকে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব খন। কয়েকদিন পর রাজকুমারের আগ্রহ কমে গেল। তিনি সিনেমার প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশে চলে গেলেন। কিন্তু আমার আর ফিরে আসা হল না, সেখানেই থেকে গেলাম।

বলেছিই তো, পুরনো মধুপুর সম্পর্কে জানার অদম্য কৌতূহল আমার। সে যুগের

লোকজনও এখন প্রায় নেই। আমার সহানুভূতি পেয়ে ফেলুবাবুর মন কিছুটা দুর্বল হয়ে গেল।

'জানিস, আমার একটা ছেলে আছে।'

আমি চমকে উঠলাম, আমরা সবাই জানি যে ফেলুবাবু বিয়ে থা করেননি। তাই ছেলেমেয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

'অন্য জায়গায় এর চল না থাকলেও কলকাতার থিয়েটারে তখন স্ত্রীর চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করত। মিথ্যে কেন বলব? সে সময় ভাল ঘরের মেয়েরা অভিনয় করতে আসত না। নিষিদ্ধ পল্লি থেকে খুঁজে পেতে অভিনেত্রী জোগার করা হত। তাদের কয়েকজনের সহজাত প্রতিভা ছিল। আমার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, আমিও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। সহজেই বিয়ে হয়ে গেল।

যাত্রা থিয়েটারের সঙ্গে আমার জড়িয়ে থাকাটা পরিবারের অপছন্দ ছিল। বিশেষ করে আমার কাজটাও ছিল অন্য ধরনের। হাতে ধরে, গায়ে ধরে মেয়েদের নাচের মুদ্রা দেখিয়ে দিতে হত। আমার এই কাজে পরিবারের ঘোর আপত্তি। সন্দেহ আর সংঘাত আপসের, কোনও পথ নেই আমি যাত্রা থিয়েটার থেকে দূরে সরে বেঁচে থাকতে পারি না। একে চারিত্রিক দুর্বলতাই বলো বা আর যাই বলো। আমার স্ত্রী আবার আমার এই জীবনধারা সহ্য করতে পারে না। ছেলেটির জন্মের পর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল, বাপের মতো ছেলেটাও গণিকাসক্ত হবে বলে স্ত্রীর বদ্ধমূল ধারণা, ভুল ধারণা, আমি মেয়েদের নাচগান শেখাতাম ঠিকই, কিন্তু কারও সঙ্গে কোনও যৌন সম্পর্ক ছিল না আমার। কিন্তু কে শোনে কার কথা? এক বছরের কোলের ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল আমার স্ত্রী। পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আমি থিয়েটারের কাজ ছেড়ে না দিলে ছেলেকে নিয়ে আমার সঙ্গে থাকবে না। থাকা অসম্ভব। ওর যেন অ্যালার্জির মতো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার আবার এটাই নেশা। নিঃশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারলেও থিয়েটারের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকাটা অসম্ভব। সে যুগে এমন পাগল অনেক ছিল। আমার নাম চাই না, স্বীকৃতিও চাই না, পয়সাও চাই না। জল থেকে তুলে এনে মাটিতে রেখে দিলে মাছের পক্ষে কি বেঁচে থাকা সম্ভব?

এসবই হল এক বিগত যুগের কাহিনি। সে সময়কার লোকেদের অনুভূতিগুলো ছিল অনেক বেশি তীব্র আর নিষ্ঠা ছিল সর্বাত্মক। ফেলুবাবুকে আমরা সব সময়ই সদাহাস্যময় ও কৌতূকপ্রিয় লোক হিসেবে দেখে এসেছি। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

এটাই তা হলে ফেলুবাবুর মধুপুরে আসার ইতিহাস।

ফেলুবাবুর স্ত্রীকে কি বলে সম্বোধন করেন? বৌদি না কাকি?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি কি বেঁচে আছেন?'

ফেলুবাবুর বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না।

'না, অনেকদিন আগেই গত হয়েছে।'

'ছেলেটা?'

'আছে, নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।'

'না, তো।'

'কেন? জীবন সেনের নাম শোনোনি?

শুনব না কেন? বিতর্কিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। কয়েকজন জীবন সেনের নামে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর কয়েকজন তাঁর নাম শুনলেই খেপে যান। তিনি নাকি রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয়তা নষ্ট করছেন।

'আপনার সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়েছে কি?'

'আজকাল তো সে প্রায়ই আমার কাছে আসে। অন্য কিছু না হোক, আমার যাযাবর স্বভাবটা পেয়েছে। ওর ঠাকুর্দার সুবিশাল অট্টালিকা, অজস্র সম্পত্তি। কিন্তু সে থাকে মির্জাপুরের একটা মেসে। আমাকেও সে তার মেসে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছে।

'যাচ্ছেন না কেন? এখানে এই বয়সে এ ভাবে একলা পড়ে আছেন?' 'তোকে কী ভাবে বোঝাব? মধুপুরের জমিদারের প্রাঙ্গণের এক কোণে এই আউট হাউসে থেকে আমি অনুভব করি, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আমার কোনও এক যোগসূত্র রয়েছে। তাঁর ছেলেপিলেরাও আপত্তি করেননি, তাঁরা কতদিন এই সম্পত্তি রক্ষা করতেন, রাখতে পারেন নি। বিক্রি করার নাকি কথাবার্তা চলছে। অবশ্য আশা করে আছি, তার আগেই আমার মৃত্যু হবে।

তিন

অনেকেরই তো অনেক আশা থাকে। আশা নিয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। এই হল মানুষের জীবনের অবলম্বন, কর্মের প্রেরণা ও স্বপ্নের উৎস। তাই ভাবি, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাটা নিদারুণ অভিশাপ। আশাগুলো ঝরে যায়, স্বপ্নগুলো ভেঙে যায়।

মিছিলের সামনে থেকে হাতে পতাকা নিয়ে স্লোগান দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকা কোনও ছেলে যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, তা হলে সে সত্যিই ভাগ্যবান। সুন্দর

একটা স্বপ্ন বুকের মাঝখানে নিয়ে মরতে পারাটা কম ভাগ্যের কথা নাকি?

ফরাসি বিপ্লব উন্মত্ত করে তুলেছিল মানুষকে। কি হল তার পরিণতি? মহাত্মা গান্ধি উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন সমগ্র ভারতের মানুষকে, তাঁর আন্দোলনের মূল ভিত ছিল নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিকতার ক্ষেত্রে আপসের কোনও প্রশ্ন নেই। মহাত্মার নামে যারা গলার শিরা ফোলাত তাদের নৈতিকতা কোথায় গেল?

আকাশচুম্বি লোভ আর আক্রোশ। ক্ষমতার লোভ, সম্পদ আহরণের লোভ। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এ সবই হল লোভ চরিতার্থ করার প্রয়াসের পরিণতি।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলোতে কী হচ্ছে? বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিল সাম্যবাদ। সেই আশার প্রদীপ কেন নিভু নিভু? সেসেস্কুর কমরেডরাও যেন সোনার পাত দিয়ে মোড়া ছিল, অথচ এক টুকরো রুটির জন্য ছিল মানুষের হাহাকার। কীসের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন, কার কথাই বা মানবেন? শেষ পর্যন্ত সব বিপ্লব ও আন্দোলনের পরিণতি হয় কদর্য আর বিকৃত। অগ্রদূতদের স্বপ্ন কি আর ভবিষৎ অনুগামীদের মনে প্রতিফলিত হয়? শুধু রাজনৈতিক মতবাদ দিয়ে কি মানুষের মনের কলুষতা ঘোচানো যায়।

কোনও রকমে মানুষের মনে কি সামগ্রিক সামাজিক সত্তা সৃষ্টি করা যায়? একজন হাসলেই তার তরঙ্গ কি সবার মনে দোলা দেবে বা একজন কাঁদলেই কি সবার মন ভারাক্রান্ত হবে? ধর্ম পারেনি, রাজনৈতিক পদ্ধতি পারেনি। বিকল্প কোনও উপায় কি আছে?

আমি বারে বারে ফিরে যাই মধুপুরে। ভিন্ন এক জীবন, ভিন্ন এক পরিবেশ। ছোট জায়গা, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রিটিশের অধীনে ছিল না অন্য কারও তা নিয়ে কারও কোনও ভাবনা নেই। যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ছিল জমিদার অর্থাৎ রাজবাহাদুর। ব্যবস্থাটা ভাল না খারাপ, বলতে পারব না, কিন্তু জীবনধারা ছিল শান্তিপূর্ণ আর নিরুদ্বিগ্ন। অন্তত জমিদারের অনুগ্রহের পাত্রদের জন্য তো বটেই। অসংখ্য আলোকচিত্র, পরস্পরের থেকে আপাতবিচ্ছিন্ন, তবু অদ্ভুত ভাবে সুসংবদ্ধ। অবলুপ্ত এক যুগের মধুপুরের সামগ্রিক রূপের এক একটি খণ্ডচিত্র।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণদিকের রাস্তাটা পার হলেই নাপিতপাড়া। বর্ষায় আমি সেই নাপিত পাড়ার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম। পুরো পাড়া জলের নিচে। ছেলেরা কলাগাছের ভেলায় উঠে আসা যাওয়া করছে। আমাদের বাড়ির উঠোনেও এখন জল জমলে আমরাও তো ভেলায় উঠে এ ভাবে ঘোরাঘুরি করতে পারতাম। চন্দ্র শীলের কথা মনে পড়ছে। বেঁচে কি আছে? আশা কম। আমার চেয়ে বয়সে বড়। পারিবারিক

ব্যবসাটা ছাড়া জীবনে কি না করেনি? একেবারে ছোটবেলায় বিড়ির বিজ্ঞাপন। আগেকার দিনে বিড়ির কোম্পানিগুলো হাটে বাজারে বিশেষ ধরনের বিজ্ঞাপন চালাত। কয়েকজন ছেলে মেয়েদের পোশাক পরে অর্থাৎ 'ছুকড়ি' সেজে নেচে গেয়ে বিড়ির মাহাত্ম্য প্রচার করত। সঙ্গে থাকত দলপতি, যে হারমোনিয়াম বাজাত। নেচেকুদে কোনও ছুকড়ি চোখে ভঙ্গিমা তুলে কোনও গ্রামের লোককে বিড়ি দিতে চাইলে, সেই লোকটা গর্ববোধ করত। চন্দ্র তারপর পানের দোকান দিল। ভালই চলত, সেটাও বাদ দিল। মাঝে নেই, তারপর টিনমিস্ত্রি হিসাবে আবির্ভাব। কোথায় কী ভাবে কাজ শিখল বলতে পারে না। তার পর এক সাধুবাবার চেলা হয়ে তার সঙ্গে চলে গেল। অনেকদিন পর আবার তার আবির্ভাব। চুলদাড়ি বাড়িয়ে নিজেই একজন সাধু। শেষবারের মতো তার সঙ্গে যখন দেখা হল মধুপুরে তখন সে থাকত কলিতাপাড়ার নদীর পাড়ে বিশাল এক বটগাছের তলায়। ইতিমধ্যে ওই জায়গাটাকে চন্দ্রবাবার আশ্রম বলা শুরু করে দিয়েছে লোকেরা।

আগেও এই গাছের নিচে পশ্চিম থেকে এক সাধু এসে আশ্রয় নিত দু-চার বছর অন্তর। এত জায়গা থাকতে মধুপুরেই বা কেন এসেছিল আর ওই গাছটাই বা কী করে খুঁজে বের করছিল বলতে পারব না। সম্পত্তি বলতে তাঁর একটা ছোট হারমোনিয়াম। সন্ধ্যায় গানের মজলিশ বসে যেত ধুনির চারদিকে। নারায়ণ জেঠু, লোকনাথ ঠাকুরের মতো সমঝদার শ্রোতা জড়ো হতেন। সাধুবাবার সম্পর্কে জেঠুর অকৃপণ প্রশংসা মনে আছে আমার।

'গতকাল তিনি ইমন গেয়েছিলেন। উদারার ধৈবতের সুর লাগিয়ে মুদারার রেখা দুবার ছুঁয়ে তিনি যখন গান্ধারে এলেন তখন ইমনের রূপ সত্যিই ভেসে উঠল চোখের সামনে।'

নারায়ণ জেঠুর মতামতের মূল্য আছে। তিনি নিজেও একজন অত্যন্ত উচ্চস্তরের সংগীত সাধক।

সাধারণত কারও বাড়ি যেতেন না বাবাজি। তিনি বাবাকে খুব পছন্দ করতেন। সেই সূত্রে ও আমাকেও তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁকে সাধু বলে ডাকলে অপছন্দ করতেন।

'ক্যা সাধু? হম এক মুসাফির। হারমোনিয়ামটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াই, কোথাও ভাল জায়গা পেলে আর ভাল লোকজন দেখলে দু-চারদিন থেকে যাই। বেশিদিন একই জায়গায় থাকলে শেকড় গজাতে পারে। তার আগেই হঠাৎ একদিন চলে যাই।' সাধুবাবা খুব পছন্দ করতেন বাবাকে। তাঁকে ভাইসাহাব বলে ডাকতেন। অনেকেই

তাঁর কাছে ওষুধপত্র চাইতে যেতেন। তিনি তো হেসেই অস্থির।

'ওষুধ! আমি কি কোনও ডাক্তার নাকি? রোগ হলে কানাই ডাক্তরের কাছে যা, খুব ভাল ডাক্তার। দুদিন ধরে আমার পেটটা খারাপ ছিল। কানাইবাবু জানতে পেরে ওষুধ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেল।'

সাধুবাবার অদ্ভুত এক আকর্ষণ ছিল। তিনি এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন মধুপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, গান শুনে তো সবাই মুগ্ধ। নারায়ণ জেঠু আর লোকনাথ ঠাকুরের কথা তো বলেইছি। জেঠু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে তবলায় সংগত দিতেন। এমনকী রাজাবাহাদুরও সেই বটগাছের তলার গিয়ে হাজির হতেন সাধুবাবার গান শোনার জন্য। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ।

বর্তমান যুগে এই সাধুবাবার মতো লোকগুলো হয়তো লুপ্ত হয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুর পর হঠাৎ মধুপুরে হাজির সাধুবাবা, বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেদিনই চলে গেলেন, তারপর তিনি আর কখনও মধুপুরে আসেননি।

চার

চন্দ্র শীলের কথা বলেছি না? তা হলে টগরের কথাও বলতে হয়। প্রত্যেক জায়গারই বোধহয় এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। সুনির্দিষ্ট ভাবে আঙুল দিয়ে দেখানোটা শক্ত। মধুপুরের বৈশিষ্ট্য বোধহয় এটাই, গতানুগতিক জীবনধারায় অসন্তোষ। নিজে যা করছে তাতেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য একটা কিছু করতেই হবে। তা না হলে জমিদারের ছেলে জমিদারির দেখাশোনায় লেগে না থেকে সিনেমা করতে গেল কেন? বাবার স্বভাবেও এই উপাদান ছিল, আমারও যে নেই, তা বলছি না।

এবার টগরের কথা বলি, জীবনে আমি এমন অস্থির স্বভাবের লোক খুব কমই দেখেছি। নিজের প্রকৃত সত্তার খোঁজে আকুল। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোক। দোতারা বাজিয়ে ভাল লোকগীতি গাইতে পারত। ভাল বাঁশি বাজাতে পারত। ভাল মূর্তি তৈরি করত। আসলে সে যে কী কাজ পারত না? কিন্তু কোনও কাজেই বেশিদিন লেগে থাকতে পারত না। যে কোনও কাজ মুহূর্তের মধ্যে শিখে নিত নিবিষ্ট মনে দেখেই।

মাঝে একবার রংপুর বিশ্বনাথ দাস নামে এক বহুরূপী এল মধুপুরে। টগরও কয়েকদিন বহুরূপী হয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগল। পাগল, হঠাৎ বাবু, অর্ধনারীশ্বর, বিভিন্ন ধরনের রূপ।

একদিন ভরদুপুর বেলায় হঠাৎ একটা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে সাষ্টাঙ্গে বাবার পায়ের সামনে এসে পড়ল। উদভ্রান্ত অবস্থা, কপাল থেকে মাথা গভীর ক্ষতচিহ্ন।

বাবা আতঙ্কিত হলেন।

'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ? কে এইভাবে আঘাত করেছে?'

'হুজুর, ভুবন নাপিত আমায় দা দিয়ে কোপ মেরেছে। দেখুন হুজুর দেখুন, আমার কী অবস্থা করেছে।'

'ভুবন? ভুবন তো এমন লোক নয়? সে তোমাকে কেন কোপাতে গেল? কী করেছিলে?

'কিছু করিনি হুজুর, তাকে শুধু মেয়েলোক বলেছিলাম।'

'কেন? মেয়েলোক বলতে গেলে কেন?

'কী মিথ্যেটা আমি বলেছি হুজুর? তার গলার আওয়াজ মেয়েলোকের মতো নয় নাকি? আপনিই বলুন। সে তো রোজ এসে আপনার দাড়ি কামিয়ে দেয়।'

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে বারান্দায় বোধহয় এসেছি। আতঙ্ক আর কৌতূহল নিয়ে আহত লোকটার দিকে চেয়ে রয়েছি।

বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি চাকরবাকরকে নির্দেশ দিলেন।

'আচ্ছা, এর বিচার পরে হবে। অ্যাই মহেন্দ্র, মাকে বলে ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এসে ওর ঘায়ের ওপর বেঁধে দে, মনেশ্বর তুই যা, কানাই ডাক্তারকে ডেকে আন। আশ্চর্য। ভুবনের এত রাগ।'

লোকটা আবার সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল বাবার পায়ে।

'হুজুর মোক চিনি পান নাই? মুই টগর বহুরূপী।'

টগরের সাহস কম নয়। শুধু বাবার কাছেই নয়, রাজাবাহাদুরের কাছেও সে এভাবে গিয়েছিল, কলাপাতা একটা কাটার জন্য ঢেপেরা বরকন্দাজ নাকি তাকে দা দিয়ে কোপ মেরেছে।

রাজাবাহাদুর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি টাকা বকসিস দিলেন। সাজ পোশাকের জন্য কিছু লাগলে তা-ও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য টগর একই কাজে লেগে থাকার লোক নয়। দুদিন পরই এই কাজে তার আর আগ্রহ রইল না।

উদ্ধব নামে এক টিনমিস্ত্রি মাঝেমধ্যে মধুপুরে আসত। এসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভাঙা কাটা বাসন সারিয়ে দিত। লোকে উদ্ধবের আসার অপেক্ষায় থাকত। সে আমাদের বাড়িতেও আসত। সমস্ত সরঞ্জামই তার কাছে থাকত। ছোট একটা হাপর, কাঠ কয়লার ঝোলা, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। যে সসপ্যানটার ফেলে দেওয়ার মতো অবস্থা, তার তোবড়ানো জায়গাগুলো ছোট্ট হাতুড়ি পিটিয়ে একেবারে সমান করে দিত। সেও ছিল এক অদ্ভুত চরিত্র। পয়সার খাই নেই, যা দাও তাতেই সন্তুষ্ট।

কাজ করতে করতে সে হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে গান গেয়ে উঠত।

উদ্ধবের সঙ্গে থেকে চন্দ্রশীলের মতো টগরও টিন মিস্ত্রির কাজ শিখেছিল। কিন্তু তার আগ্রহ আর ক' দিনই বা থাকে? অদ্ভুত চরিত্রের যে সমস্ত লোক আমি দেখেছি, তার মধ্যে টগর অন্যতম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অশান্ত অস্থির চরিত্র। বিদেশে এমনই একজন লোক হয়তো টমাস আলভা এডিসন হতে পারেন।

এত দক্ষতার সঙ্গে নানা রকম কাজ করতে পারলেও নিজের সংসারে টগরের অবদান ছিল শূন্য। তার থেকে কোনও কিছু আশাও করত না তার পরিবার। সে-ও কম ছিল না, একধরনের ঝোপওয়ালা গাছ কেটে শুকোলে, সেগুলো পুড়িয়ে টিকে বানাত সে। সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে সেই টিকের জোগান দিত। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত লোকেরা তামাক খেত। বালাখান, বিষ্টুপুরী এ সব হল অভিজাত শ্রেণির খাওয়া তামাক। গোটা পরিবেশ গন্ধে ম ম করত। টগরের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। এমন কর্মক্ষম লোকটা শেষ পর্যন্ত জড় পদার্থে পরিণত হল। রামবাবুর দোকানের বারান্দায় নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, কারও সঙ্গে কথাও বলে না। কেউ কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না।

হঠাৎ কারও সামনে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

'এই চাইরটা পইচা দে তো।'

'কেনে, কি করবু পইচা দিয়া?'

'সিঙারা একটা খাইম।'

কখনও কেউ পয়সা দিলে কাছের গজেনের দোকান থেকে একটা সিঙারা কিনে খেত। তার পর আবার এসে নিশ্চল হয়ে বসে থাকত রামবাবুর দোকানের বারান্দায়।

টগরের কথা মনে পড়লে অজ্ঞাতে অকারণে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি।

পাঁচ

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, লোকে যদি নিজের মানসিক জটিলতার কারণ উপলব্ধি করতে পারে তা হলে সেই জটিলতা কেটে যায়। কথাটা কোন অবস্থায় কতদূর সত্য তা বলতে পারব না আমি, আমার নিজেরও অনেক অস্বাভাবিকতা আছে, তা আমি জানি। আমি ভাবি, কেন এই জটিলতা ও অস্বাভাবিকতা তার কারণও আমি জানি। ছোটবেলায় আমরা প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছি। বাবা সেখানকার বড় কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। তাঁর নিজের ইটাভাটাও ছিল। সেখানে ইটাভাটা ছিলই না। মধুপুর থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত ইট বয়ে নেওয়া গরুর গাড়ির মিছিল চলত। বিলাসীপাড়া, শালকোছা ইত্যাদি জায়গায়

পাকাবাড়ি বানানোর জন্য লোকে নৌকো করে এসে বাবার ভাটা থেকে ইট নিয়ে যেত, বাবা যেমন উপার্জন করতেন, তেমন খরচও করতেন। আমাদের বাড়িটা ছিল ধর্মশালা। বাইরের দিকে অতিথিদের জন্য লম্বা একটাই বাড়ি ছিল ব্যারাকের মতো। সেই বাড়িতে বেশ কয়েকটা ঘর। বিছানাপত্তর সবই আছে। সেখানে সবসময় অতিথি থাকত। তাঁদের একজন 'কবিরাজ মশাই'। বরিশালের (অধুনা বাংলাদেশে) লোক। তিনি সেখানে কী করে এলেন জানি না, আমাদের বাড়ির চিকিৎসক ছিল উপেন খাঁ। উপাধি খাঁ হলেও ছিলেন ব্রাহ্মণ। কবিরাজ মশাই বছরে একবার এসে আশেপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে চিকিৎসা করতেন। থাকা খাওয়ার খরচ নেই, তাই নিশ্চয়ই তাঁর উপার্জন ভালই হত। কবিরাজ মশাই ছিলেন খুব শান্ত স্বভাবের নিরীহ লোক। বাড়িতে নীল রঙের একটা লুঙ্গি পরে থাকতেন। চেয়ারে বসলেও দুপা উপরে তুলে মাটিতে বসার মতো হাঁটু মুড়ে বসতেন। অনবরত হুঁকো টানতেন তিনি। ঘরটর নোংড়া করে রাখতেন। রামপ্রসাদ ঘর ঝাঁট দিতে গেলে রোজ তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করত।

সত্য গণকের কথাও বেশ ভাল মনে আছে। সত্যনাথ শর্মা। তিনিও বছরে একবার মধুপুরে আসতেন। ছেলেমেয়ের কুষ্ঠি করানোর জন্য লোকে তাঁর অপেক্ষায় থাকত। একটা একটা করে বেশ কয়েকটা কাগজ জোড়া লাগিয়ে তিনি এক একটা বিশাল লম্বা কুষ্ঠি তৈরি করতেন। পাকিয়ে রাখতে হত। তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদের বনিবনা হত না। রাম প্রসাদের হাত দেখে তিনি নাকি বলেছিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে। রামপ্রসাদের তা ভাল লাগেনি।

কতজনের আর কত কথাই বা বলব? দুটো উদাহরণ দিলাম। কামরূপের বেশ কয়েকটা ছেলে আমাদের বাড়িতে থেকে মধুপুর হাইস্কুলে পড়ত। তখনকার দিনে মধুপুর হাইস্কুল ছিল নাম করা স্কুল, জমিদার পারিবারের ছেলেরাও সেখানে পড়ত। আর পাঁচটা ছাত্রের মতোই ছাত্র, আমাদের জুতো থাকলেও সেটা পরে স্কুলে যেতাম না, স্কুলের বেশির ভাগ ছাত্রই ছিল আশেপাশে গ্রামের গরিব ছেলেরা। ওরা খালি পায়েই আসত। তাই আমরাই বা কী ভাবে জুতো পরে যাই। আজকাল তো কে কত ভাল কাপড় পরে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। তখনকার মানসিকতাই ছিল আলাদা। সংস্কৃতির রূপান্তর বলতে পারি।

উত্তেজিত হয়ে হেডমাস্টারকে নালিশ জানাল ধীরেশ, 'স্যর, নন্দ আমাকে মাখনের জুতো দিয়ে পেটাবে বলছে।

হেডমাস্টার আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'মাখনের জুতো? সে আবার কী বস্তু?'

মাখনের বাবা শশাঙ্ক দত্ত কদিন আগে মধুপুরের পোস্টমাস্টার হিসাবে বদলি হয়ে এসেছেন। মাখন এই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে নাম লাগিয়েছে। সে এখনও মধুপুরের পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়নি। জুতো পরে স্কুলে আসে, কোনও একটা কথা নিয়ে নন্দ আর বীরেশের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেল। সবাই জানে, জুতো পেটা করাটা অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি। কিন্তু তার পায়ে তো জুতো নেই। শুধু তার কেন? মাখন ছাড়া কারও পায়েই জুতো নেই, তাই জুতো পেটা করতে হলে মাখনের জুতোই ভরসা, সত্যিই হেডমাস্টারের আশ্চর্য হওয়ার মতোই কথা।

আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন প্রবোধ বাগচী। ডবল এম এ। বুক অবধি নেমে আসা দাড়ি। জিতেন বাবু উঁচু ক্লাশে ইংরেজি পড়াতেন। তাঁর মতো দক্ষ শিক্ষক আমি কলেজেও পাইনি। টম হান্টারের রাজপুত শিভ্যালরির ঘটনাগুলো এখনও আমার সূক্ষ্ঠ মনে আছে। অঙ্ক শেখাতেন রামেশ্বর কলিতা স্যর। ছাত্রদের মনে অঙ্কের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারতেন তিনি।

কোথায় যে আরম্ভ করে কোথায় যে চলে গেলাম, উপায় নেই, বয়সের দোষ। মধুপুরের কথা ভাবলেই আমি আবেগে অভিভূত হয়ে যাই। আবেগ ও যুক্তির সহবস্থান না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আগেই বলেছি না, ছোটবেলায় আমরা প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছি। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। দেখা গেল, তিনি টাকাপয়সা বিশেষ রেখে যাননি। অন্তত আমাদের জানা বিশেষ কিছু নেই। বাবার এক বন্ধু ইটভাটা চালানোর দায়িত্ব নিলেন। ব্যস ভাটা গেল। যেটুকু টাকাপয়সা ছিল, আমার পড়াশোনা চলতে চলতে সব শেষ হল। আমি বাড়ির বড় ছেলে। মেপেজুখে হিসাব করে চলতে হয়। সেটাই অভ্যাসে পরিণত হল। দুই বিপরীতমুখী স্বভাব, বেপরোয়া খরচ করার সহজাত প্রেরণা অথচ খরচ করতে গিয়ে স্বাভাবিক আতঙ্ক।

স্ত্রী সঙ্গে না থাকলে আমি এখনও ভিড় ঠেলে সিটিবাসে ওঠার চেষ্টা করি; রিকশা, বা অটো নিতে এখনও আমার বাধে। স্ত্রী আপত্তি করে।

'এই বয়সে সিটিবাসে বাদুরঝোলা হয়ে যাওয়ার দরকার কি? রিকশা একটা তো নিতে পারো, রিকশা একটা করতে পারবে না, এমন অবস্থা তো তোমার নয় এখন।

সে কেন মনে করিয়ে দিচ্ছে? আমিও জানি, কিন্তু পারি না। স্বয়ংক্রিয় প্রতিবন্ধক। নিজের জন্য কোনও দামি জিনিস কিনতে বাধে আমার, জুতো হোক বা প্যান্টের পিস বা জামাই হোক না কেন। শখ করে যে কিনতে পারব না, তেমন অবস্থা কিন্তু নয়। কিন্তু কী দরকার? কাজ চললেই হল। সাধ্যে কুলোলে অন্যের জন্য খরচ করতে কোনও আপত্তি নেই আমার, কিন্তু নিজের জন্য পারি না।

আসলে আমি বাবার কথাই বলতে চাইছি। শুধু বাবাই নয়, বেহিসাবি খরচ করা সেই যুগের মধুপুরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোকের মজ্জাগত স্বভাব ছিল। জমিদারের জীবনধারার প্রক্রিয়ার প্রভাব।

কয়েক বছর আগে মধুপুর যেতে নবকাকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আমায় স্নেহ করেন, শুভাকাঙ্ক্ষী লোক। আগেকার লোকজন তো নেই-ই বলতে প্রায়, শুনলাম কাকুর শরীর ভাল নেই, কতদিনই বা আর বেঁচে থাকবেন? পরের বার এলে তখন থাকবেন কি থাকবেন না। যাই একবার দেখা করে আসি। আমায় দেখে বেজায় খুশি নবকাকু। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা। আমি ঘন ঘন মধুপুর যাই না বলে অভিযোগ করলেন। পুরনো কথা বলে চোখের জল মুছলেন।

'কী দিন ছিল, আর কী হল? আমাদের আজকাল আর কেউ খাতির করে না। জমিদারিও গেল, আর আমাদের অবস্থাও পুরো পড়ে গেল।'

লুচি আর চা খেয়ে উঠলাম।

কাকু বললেন, 'কাল দুপুরে আমাদের বাড়িতেই দুটো ভাত খাস খ'ন।'

আমি ওজর দেখালাম। দুদিনের জন্য এসেছি, সময় নেই। বাড়িতেও রাগ করবে। না, কথা কানেই দিলেন না।

'কী রাগ করবে? আমার কথা বলবি। কোনও কাজ থাকলে, তা শেষ করে আসবি। দেরি হলে হবে, কোনও ব্যাপার না, দাদা বেঁচে থাকতে কতদিন তোদের বাড়িতে খেয়েছি। মনে নেই তোর।'

তিনি বাবার কথা বলে আবার চোখের জল মুছলেন। নবকাকুর আন্তরিকতা উপেক্ষা করতে পারলাম না।

দুপুরে কাকুর বাড়ি বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। আসল কথা হল আন্তরিকতা। আমাকে খাইয়ে কাকুর কী আনন্দ!

'নে নে আরেক টুকরো মাছ নে। রেখা তুই দে তো।'

'না না, কাকু আর পারব না।'

'পারব না কি রে? এই বয়সেও আমি তো তোর চেয়ে বেশি মাছ খেতে পারি। কী যে হয়েছে তোদের?'

খেয়ে আনন্দ, লোককে খাইয়ে আনন্দ। মধুপুরের আগেকার সম্ভ্রান্ত মানুষের বৈশিষ্ট্য, নবকাকুর মতো লোকেরা আগেকার স্বভাব এখনও পালটাতে পারেননি।

সন্ধ্যায় মুরারি সাহার দোকানের সামনে দিয়ে যেতে সে একেবারে হুলুস্থুল করে ডাকতে লাগল। বন্ধু মানুষ। হাইস্কুলে কিছুদিন আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম।

'এই, এই ভদ্র। কবে এলি তুই?'

আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তার দোকানের ভেতরে বসাল। বেশ বড়সড় দোকান। অথচ আগে মধুপুরে যে কটা বড় দোকান ছিল, তার সবকটাই ছিল স্থানীয় লোকেদের, যেমন বরুয়া-চক্রবর্তী, চক্রবর্তী অ্যান্ড চক্রবর্তী, গৌরী ভাণ্ডার, লক্ষ্মী ভাণ্ডার। এর সবকটাই ছিল সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। কলকাতায় যা পাওয়া যেত, এই দোকানগুলোতেও তাই পাওয়া যেত। এই সব দোকানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার। এখন এগুলোর একটাও নেই।

মুরারি দোকানের একটা ছেলেকে বলল, 'বিজিতের দোকান থেকে দুটো সন্দেশ আর এককাপ চা নিয়ে আয় যা, নতুন লিকার দিয়ে চা টা করতে দিবে।'

আমি শশব্যস্ত হয়ে আপত্তি করলাম।

'না না, আজ আমি সন্দেশ খেতে পারব না, বাপরে; দুপুরে নবকাকুর বাড়িতে যে খাওয়া খেয়েছি, এখনও তার ঢেকুর উঠছে।

মুরারি গম্ভীর ভাবে বলল, 'ও, তাই।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

'তাই তো বলি, নববাবুর একশোটা টাকা না হলেই নয় কেন। কাল সন্ধ্যায় এসে বেশ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আমায়, আমরা আগেকার লোক— মুখের ওপর না -ও বলতে পারি না। আগেরই অনেক বাকি পড়ে আছে। সোনার সিকি একটা বের করে দিলেন। 'লাগে যদি এটাই রাখ।' কী আর করব?'

মুরারির কথাটা শুনে মনটা প্রথমে খারাপ লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নববাবুর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। অকৃত্রিম আনন্দে উজ্জ্বল একটি মুখ। এখানে আমার দুঃখ করার কি কোনও মানে আছে?

ছয়

এই প্রক্রিয়া এখনও রুদ্ধ হয়নি, এ এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমি প্রব্রজনের কথা বলছি। আমার ঠাকুর্দা চেঙা থেকে মধুপুর গিয়েছিলেন। আজও এই প্রব্রজন অব্যাহত। সমগ্র বিশ্বে এই প্রক্রিয়া চলছে। তা না হলে যে ইতিহাস একটা উপেক্ষার বিষয়ে পর্যবসিত হত। আমেরিকার ইতিহাস কী? অস্ট্রেলিয়ার? ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথাই ধরুন। একই রকম ভাবে আহোমদের আগমন। তারও আগে থেকে হাজার হাজার বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই প্রক্রিয়া চলেছে। কে, কী ভাবে এই সময়সীমা নির্ধারণ করবে? শ্রীমন্ত শংকরদেবের পূর্বপুরুষ চণ্ডীবর কনৌজ (কানপুর) থেকে

এসে বসতি স্থাপন করেন গৌড়ে। তাঁর উত্তর পুরুষ গৌড় থেকে আসেন কামরূপে। স্বাধীনতার সময় দেশটা যখন দুভাগে ভাগ হল, তখন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুর স্রোত এসে ছড়িয়ে পড়ল অসমে। এখন আর মধুপুরে উন্মুক্ত প্রান্তর চোখে পড়ে না। মধুপুরের একেবারে মাঝখানে থাকা তেইলানি মাঠটা আধুনিক মহানগরে থাকা বস্তির রূপ ধারণ করেছে।

আমি আসলে বলতে চাইছি যে, ঠাকুরদার কামরূপ থেকে মধুপুরে যাওয়াটা বিরল হলেও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এভাবে আরও অনেক লোক সেখানে গেছে। বরপেটার মহেশ্বর শর্মা মধুপুরের অনেক প্রতিপত্তিশালী লোকের বাড়ির পুরোহিত ছিলেন। তাঁর ছেলে অবনী শর্মা মধুপুরেই ঘরদোর বানিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করছেন। অবনী শর্মার কথাবার্তা স্থানীয়দের চেয়ে আলাদা ছিল। কিন্তু আজকাল অবনী শর্মার ছেলেমেয়ের কথাবার্তা অবণী শর্মার কথাবার্তার সঙ্গে মেলে না। আমি মধুপুরে গেলে, শর্মার ছেলে আমায় বলে —

'দাদা, কোনদিন আসলেন?'

পরশু দফাদারের কথাও মনে পড়ছে। আসল নাম পরশুরাম কলিতা। নলবাড়ির লোক, মধুপুরের লোকেরা তাকে পরশু দফাদার বা সংক্ষেপে দফাদার বলে ডাকত। দফাদার মানে হয়তো ছোট খাটো ডাক্তার বা কয়েকজন মজুরের প্রধান। বাঁশের কাজে দক্ষ। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাড়ি হত খড়ের। দরজা, জানলায় হয়তো আয়না লাগানো, জানলা অবধি ইটের দেওয়াল, বেড়ায় সিমেন্টের প্লাস্টার, কিন্তু চালটা খড়ের, আমাদের চৌহদ্দির ভেতরের উঠেনটার চারদিকে চারটে বড় ঘর ছিল। তারই দক্ষিণে ছিল বাবার শোয়ার ঘর, চালটা খড়ের। ঘরটা বড়, অন্তত দুহাজার বর্গফুটের। প্রায় একফুট মোটা শক্ত খড়ের ছাউনি। বিশেষ ধরনের ছাউনি। কী যেন বলত সেটাকে, ভুলে গেলাম। এই ছাউনির খড়ের আগাগুলো ওপর থেকে নিচে নেমে না - এসে, নিচ থেকে ওপরে উঠে যায়। এই ছাউনি করতে গেলে ঘোড়ার লেজের মতো খড়গুলো করতে হয়। দক্ষ মজুর চালটা দেখে এমন ভাবে আগুন লাগায় যে ছাউনিক ওপর ঝুলের মতো বেরিয়ে থাকা আগাগুলো পুড়ে যায়। চালে আগুন লাগে না।

বাবা ঠিকাদারি করতেন। যে কাজগুলো নিতেন, তাতে বাড়ি বানানের কাজও ছিল। হোগলা বা বাঁশের বেড়া দেওয়া হত। বেড়া দেওয়ার জন্য বাঁশগুলো চ্যাপটা করে নেওয়া হয়। এসব কাজ করত দফাদার। দরকার হলে দফাদার আমাদের বাড়িতেও কাজ করত। বাঁশ কেটে বেত করার কাজও ছিল দেখার মতো। মোটা লাঠি দিয়ে

ক্রস এর মতো করা হত। বাঁশের মাথাটা সমান চার ভাগে চেরা হত। এবার ক্রসের চারদিকে চারটে ভাগ বসানো হত। সামনের থেকে চারটে ভাগকে একটা জড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধা হত। সেই জড়ি ধরে টানার জন্য সামনে একজন থাকত, পেছন দিক দিয়ে বাঁশটা ঠেলার জন্য আরও একজন থাকত। বাঁশটা নিয়ে দুজন একসঙ্গে টানা ঠেলা করলেই বাঁশটা সহজেই ফালা ফালা হয়ে চার টুকরো হয়ে যেত। ক্রসটা পার হওয়ার সময় বাঁশের গাছগুলো ফটফট করে আওয়াজ হয়। ফট, ফট, ফট। দেখতে খুব ভাল লাগত। খুব সহজ অথচ কার্যকর পদ্ধতি।

পরশু মধুপুরের স্থানীয় বুলিতে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। এদিক থেকে নিয়ে যাওয়া মজুরদের সঙ্গেও বলত। কিন্তু শালিক বুড়ো হলে আর কোথায় বুলি ফোটে। সে কথা বললে মনে হত ইয়ার্কি করছে। পরশুরাম কলিতা ঘরদোর বানিয়ে মধুপুরেই পাকাপাকি ভাবেই রয়ে গেল। কয়েকদিন আগেই কলিতার নাতির সঙ্গে দেখা। সে ধুবড়ি জেলার উন্নয়ন সংস্থার সচিব। ভীষণ উত্তেজিত।

'উমরা আমাক অসমিয়া বুলি নাধরে। কেনে? আমরা অসমিয়া নাহই? কি করছে আমার কারণে? কি আছে এটি? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ একটাও কি এটি হবারে না পায়? আমার এডিকার মানুষের হাজার গুণ থাকিলেও কেনে খাতির নাপায়? আমার ছাওয়া ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হইয়াও কেনে ফরেন স্কলারশিপ না পায়?

বুঝলাম যে, আমার উস্কে দেওয়ার জন্য আমার সঙ্গে জড়িত একটা প্রসঙ্গ তুলেছে। আমি কৌতুকের দৃষ্টিতে সুধীরের দিকে তাকালাম। দুই পুরুষ পার ওহয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত রূপান্তর। প্রব্রজনের কথা আমি এমনি এমনি বলিনি। সমস্যাটা এত সহজ নয়।

সাত

দীনেশ চক্রবর্তীর কথাও মনে পড়ছে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তিনি বুক ফুলিয়ে বলতেন যে, কলকাতার এক বড় জমিদার পারিবারের ছেলের কঠিন অসুখের চিকিৎসার জন্য তাঁকে কাকুতি মিনতি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। তাঁর জীবনে নানা ঘটনার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা।

চক্রবর্তী ডাক্তার লোক ভাল, অতিশয় সরল মানুষ। মধুপুরে কে ই বা খারাপ ছিল? সত্যিই বেশির ভাগ মানুষই ছিলেন ভাল। ছোটখাটো দুর্বলতা বা ত্রুটি বিচ্যুতি না ধরলেও চলে। সে কার নেই? সে ভাবে ধরলে আমি নিজেই নিজের অসংখ্য

দোষ বের করতে পারি।

চক্রবর্তীর পসার যে খুব ভাল ছিল তা বলা যায় না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের নিয়ে যে সমস্ত রসিকতা চলে সে সবের উৎপত্তি মনে হয় দীনেশ চক্রবর্তীরা।

লোক তাঁর কাছে সহজে যায় না। তিনি কাউকে ধরলে ছিনে জোঁকের মতো ধরেন। রোগীর তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

'হরকান্ত, ও হরেকান্ত, আশ্চর্য তো!

'ডাক্তার বাবু তোমার? কোটে হাতে?'

'না এসে জো আছে? নাতির অসুখ বলে গতকাল ওষুধ নিয়ে এলে। আজও সারাটা দিন পেরিয়ে গেল কোনও খবর নেই যে। কেমন আছে বা নেই তা কি ডাক্তারকে একটু জানাতে হয় না।

'কি আর জানাব? ঠিকই তো আছে?'

চক্রবর্তী খেঁকিয়ে উঠল।

'ভালই আছে। ভাল আছে না খারাপ আছে তা তুমি বোঝার কে হে। এতই জান যখন তুমিই ডাক্তারিটা করতে পারতে। ওটা হয়তো সাময়িক উপশম। যে তুমি বুঝবে না। আমরা এ ভাবে ছেড়ে দিই না বাপু। একেবারে গোড়ায় গিয়ে অসুখ ঠিক করতে হয়।

হরেকান্ত বিব্রত। ছেলে ভালই আছে, সারাদিন খেলাধুলো করছে। সন্ধ্যায় গা ছেড়ে দেওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমে একেবারে কাচা। কী ভাবে টেনে তুলে আনবে এবার?

'কী ভাবে তুলব? বেঘোরে ঘুমোচ্ছে?

'হুঁঃ। এখনও সারেনি। এভাবে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। চল দেখি, ব্যাপরটা কি নিজে একবার দেখে নিই।' লোকে তাঁকে দেখলেই পিঠটান দেন। তিনি নিজেই বলেন যে তাঁর চিকিৎসা অত সহজ নয়। সাধনার প্রয়োজন।

'আমরা তো রোগের চিকিৎসা করি না। রোগী কতটা লম্বা, তার গায়ের রং কেমন, মেজাজটাই বা কেমন, রাগ ওঠেইনি নাকি সামান্য কথাতেই রেগে যায়, সব সময় কিছু চিন্তা করে নাকি বেপরোয়া ধরনের, সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখতে হয়, সহজ কথা নয়, সাধনার প্রয়োজন।'

লোকে তাঁর প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ধরুন রোগীর পেট খারাপ, ব্যথা কেমন, কী তার চরিত্র।

প্রচণ্ড ব্যথা না চিনচিন করে? ব্যথাটা বিশেষ কোনও বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত নাকি

পুরো পেটের ভেতরটা ব্যথা। মাঝে মধ্যে হচ্ছে নাকি কমছে বাড়ছে। গোঙানি ভাল লাগে না লাগে না। লোকজন এলে ভাল লাগে না রিক্ত লাগে। গাদা গাদা প্রশ্ন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, কিছু প্রশ্নের একেবারে অসম্ভব।

দীনেশ ডাক্তারের অসীম আত্মবিশ্বাস।

'হেঃ হেঃ। শেষ পর্যন্ত এই দীনেশ ডাক্তার ছাড়া কোনও গতি নেই। আমি জানি লোকে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু শেষে আমিই অগতির গতি। সন্তোষ চৌধুরীর বড় ছেলেটা এখন আবার সাইকেল চালিয়ে বেড়াচ্ছে তো, না কি? ধুবড়ির সিভিল সার্জন বলেনি নাকি, সেরে ওঠার আশা নেই। সবাই জবাব দিয়ে দেওয়ার পর আমার কাছে এল। তিন দাগ, জাস্ট থ্রি দাগ্‌স ওষুধ দিলাম। ব্যস, পুরো সুস্থ।

এটাই দীনেশ চক্রবর্তীর দুঃখ প্রথমেই কেউ তাঁর কাছে যায় না। রথী মহারথী অর্থাৎ বড় বড় ডাক্তার কোবরেজ হাল ছেড়ে দেওয়ার পর লোকে তাঁর কাছে আসে। ইতিমধ্যে রোগীর যা সর্বনাশ করার করে দিয়েছে ডাক্তার কোবরেজরা, সমঝদার শ্রোতা পেলে তো আর কথাই নেই। মাত্রা ছাড়িয়ে কোথায় গিয়ে পৌছন তার ইয়ত্তা নেই।

ভূতে পাওয়া আধ পাগল লোক। মনটা ভাল, খুব সরল প্রকৃতির লোক। ডাক্তার হিসাবেও মন্দ নন। বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে খেপায়। তিনি অবশ্য ধরতে পারেন না। জিতেন বাবুর বারান্দায় আড্ডা বসে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে চক্রবর্তীকে যেতে দেখলে সবাই সমস্বরে তাঁকে ডেকে আনেন। তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করাব মতলব। 'ডাক্তারবাবু আসুন।'

'ডাক্তারবাবু এসো এসো।'

অসুখ আর চিকিৎসা সংক্রান্ত কথা ছাড়া কোনও কিছুর তালগণ্যি মাড়ান না তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা। যুদ্ধ নিয়ে কথার্বাতা চলছিল। বর্মায় তখন গেরিলা যুদ্ধ। দীনেশ চক্রবর্তী খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে যেতে লাগলেন। নিজের কোনও মতামত দিলেন না, তখনকার দিনে গেরিলা যুদ্ধ, গেরিলা বাহিনী এসব শব্দের তেমন চল ছিল না। কিন্তু কথাগুলো তাঁর মনে গেঁথে গেল। খুব উশখুশ করছেন। রাস্তায় আমাকে দেখে ডাকলেন।

'কী রে ভদ্র, খবর কি তোর?'

'ভাল, আপনার?'

'এমনিতে ভালই। তবে রোগীর উৎপাতে আর রক্ষে নেই। শান্তিতে দুমুঠি ভাতও খেতে পারি না।' তিনি খানিক ইতস্তত করে আমায় প্রশ্নটা করেই বসলেন, 'তুই তো

অনেক জানিস, তাই তোকেই জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছিলাম। সেদিন জিতেনবাবুর ওখানে কথাটা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। সত্যিই না ইয়ার্কি বুঝতে পারলাম না। সত্যি হলে তো এ এক অদ্ভুত কাণ্ড!'

'কী কথা।'

'ইংরেজরাও কম নয়। বার্মায় নাকি তারা গরিলাদের ট্রেনিং দিয়ে জাপানিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড বল তো!'

'গরিলা যুদ্ধ নয় গেরিলা যুদ্ধ। মানুষই এই যুদ্ধ করে। সম্মুখ সমর নয়। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক বনে জঙ্গলে শত্রুপক্ষকে অতর্কিতে হামলা করে। তা ছাড়া বার্মায় গরিলা পাবে কোথায়?

'সেই বল।'

তাঁর বিরাট এক সমস্যা মিটল।

চিকিৎসার জন্য জমিদার বাড়ি থেকে লোক এসেছে তাঁকে ডাকতে। জমিদারের বাড়িতে কলকাতা থেকে অতিথি এসেছেন। তাঁরাও জমিদার। তাঁদেরই কোলের বাচ্চার অসুখ। জ্বরের মতো কিছু একটা হয়েছে। বাচ্চার বাবা মনে করেন, বাচ্চাকে চট করে অ্যালোপেথি দেওয়া ঠিক নয়। সামান্য অসুখবিসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই ভাল, কোনও অপকার করে না। জমিদারের বাড়ি থেকে সেই প্রথমবার ডাক পেয়ে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন ডাক্তার দীনেশ চক্রবর্তী। সারা জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। উত্তেজনার বশে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

'আমাকে? আমাকে ডাকছে? কে বলেছেন? রাজাবাহাদুর নিজেই বলেছেন? ভুল শোনোনি তো? কী বলেছেন বলো তো। ডাক্তার ডাকতে বলেছে? যাও কানাইবাবুকে ডেকে নিয়ে যাও, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, তাঁর কাছে যাও।'

'না, আপনাকেই নিয়ে যেতে বলেছে।'

দীনেশ চক্রবর্তীর হাত পা কাঁপতে লাগল। তিনি নিজেকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

'আচ্ছা, তুমি এগোও। আমি আসছিখন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছচ্ছি গিয়ে।

'আমার সঙ্গেই চলুন। আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ি এনেছি।'

'গাড়ি।'

ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

এরপর থেকে দীনেশ ডাক্তারকে দেখলেই লোকে দূর থেকেই পিঠটান দেওয়া শুরু করল। একবার ধরলে পরে আর রক্ষে নেই।

এখানে অবশ্য একটা কথা না বললে দীনেশ চক্রবর্তীর প্রতি অবিচার হবে, আমার একবার পেটা ব্যথা হয়েছিল।

হঠাৎ তলপেটে ব্যথা শুরু হয়, অসহ্য যন্ত্রণা। আধঘণ্টা মতো থাকে, তারপর আর নেই। সব স্বাভাবিক, অনেক ও ওষুধপত্র খেলাম, কোনও লাভ হল না। কলকাতা যাওয়াই ঠিক হবে বলে ভাবলাম। গুরুপ্রসন্ন স্যর আমায় জোর করে দীনেশ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন।

'খেয়ে দেখই না, কোনও অপকার তো করে না। লোকটা আধপাগল হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান আছে।'

দীনেশ ডাক্তারের ওষুধ খেয়েই আমি সেরে উঠলাম।

আট

মনোজদা, মনোজ চক্রবর্তী মধুপুরের জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞ। এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করেন। তখনকার একটা বিখ্যাত জীবনবীমা কোম্পানিতে অসমের জন্য আধিকারিক স্তরের লোক চাই। দাদা অত্যন্ত সপ্রতিভ লোক, চোখে পড়ার মতো চেহারা। তিনি বি.এ পাশ করে এমনিই বসেছিলেন। কোনও ভাবে খবরটা পেতেই তিনি সোজা দেখা করলেন কোম্পানির অসম শাখার ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজার মুখার্জিবাবু খুব ভাল লোক। তিনি যখন জানলেন যে দাদা মধুপুরের দিকের লোক তখন একটা পরামর্শ দিলেন।

'তুমি একটা কাজ করো না কেন? আমাদের কোম্পানিতে সবচেয়ে বেশি টাকার পলিসি আছে মধুপুরের জমিদারের নামে। তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে একটা চিঠি লিখে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।'

দাদা আমায় বলেছিলেন, 'আমি সঙ্গে সঙ্গে মধুপুর গেলাম রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম তাঁর শরীর ভাল নেই, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি তো ডাকতেই চাইছিলেন না। সোজা বলে দিলেন দেখা হবে না।

আমার নাম বললে তো চিনবেন না। আমি এক কাজ করলাম। এক টুকরো কাগজের বাবার নামটা লিখে, আমি তাঁর ছেলে বলে লিখলাম। সেক্রেটারিকে কাগজটা দিয়ে বললাম — অনেক দূর থেকে এসেছি, তাঁকে দিন এটা, দেখা করার অনুমতি দিলে দেখা করব, তা না হলে আর কি করব? সঙ্গে সঙ্গে আমায় ভেতরের ঘরে ডেকে পাঠালেন, সেরকম কোনও বিশেষ অসুখ নয়। রাজাবাহাদুর প্রথমেই বাবার খবরা খবর নিলেন। আমি কতদূর পড়েছি, কী করছি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

'দুর্গামোহনের কী খবর ? দুর্গামোহন কী করে ? এলাও গানটান করে কি না ? এসরাজ বাজায় ? ওর হাতটা খুব ভাল ছিল।' এ সব জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্গামোহন আমার কাকা, রাজা বাহাদুরের প্রিয়পাত্র। আমি আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি মন দিয়ে কথাগুলো লিখে নিতে বললেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার নাম ঠিকানা লিখে রাখতে বললেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে তিনি চেনেল বলে জানালেন। বাংলাদেশের জমিদার, কলকাতায় পরিচয়। দিন পনেরো পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে লেখা রাজাবাহাদুরের চিঠির একটা কপি পেলাম। ওপরে হাতির ছবির ছাপ মারা রাজাবাহাদুরের নিজস্ব লেটার হেডে টাইপ করা চিঠি। রাজাবাহাদুর এই চিঠি লিখে না দিলে কাজটা আর কই হত আমার ? চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

এই ঘটনাটা উল্লেখ করার কারণ এই যে মধুপুরের জমিদারের থেকে কেউ কোনও সাহায্য চাইলে তিনি আন্তরিক ভাবে সাহায্য করতেন। বিশেষ করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে। মধুপুরের সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্রকে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন আর টাকা পয়সার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। অসমে তখনকার দিনে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি ছিল না। মধুপুরের মেধাবী ছেলেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে পড়তে যাওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন। মধুপুরের ছেলেদের কথাতো বাদই, অসমের অন্যান্য প্রান্তের প্রতিশ্রুতিমান ছাত্রও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য পেয়েছেন।

প্রভাতদার কথা কি আগে বলেছি ? প্রভাত দত্ত, মধুপুরে জমিদারের জামাইয়ের সম্পর্কের ভাইপো। সেই সূত্রেই জমিদারের সাহায্য সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে তাঁর। তিনি ধুবড়ির দেশলাই কারখানার কাজ করতেন। সেখানকার ম্যানেজারকে জমিদার একটা চিঠি লিখে দিতেই কাজ হয়ে যায়।

প্রভাতদার কথা তুললাম কেন ? কারণ আছে, কয়েকদিন আগে প্রভাতদা আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর মেজ ছেলে এই শহরেই কাজ করে। মাঝেমধ্যে প্রভাতদা তার কাছে আসেন। এলে আমার সঙ্গে দেখা না করে যান না। আশি বছরের ওপর বয়স। তার ওপর একটা হাত নেই। আমার কাছে আসেন সিটিবাসে করে। শুনে ভয়ই লাগে আমার।

আমি বোধহয় তখন ক্লাস টেনে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা মধুপুরে ছড়িয়ে গেল। কারখানার কাজ করতে করতেই প্রভাতদার ডানহাতটা মেসিনে ঢুকে গেল। কবজি কেটে বাকি হাতটা বের করে আনতে হয়েছিল। রক্ত আর রক্ত। প্রভাতদা শহরের হাসপাতালে। অবস্থা খারাপ, খবর পেয়েই তড়িঘড়ি রাজাবাহাদুর গাড়ি নিয়ে

ধুবড়ি দৌড়লেন। তিনি সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা করে বললেন, চিকিৎসার যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে। বিশেষ কোনও ওষুধপত্র লাগলে তিনি লোক পাঠিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতে পারবেন বলে জানালেন। কলকাতা নিয়ে যাওয়াই ভাল হবে না কি ? এ ব্যাপারে রাজাবাহাদুর যা বলবেন তা ই হবে।

রাজাবাহাদুরের আন্তরিকতাও সহানুভূতির কথাই বলতে চাইছি। সঙ্গে প্রভাতদার কথাও। তখনকার দিনে দুর্ঘটনায় পঙ্গু হলে ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। এমন পঙ্গু লোকের ভবিষ্যৎ কী ? জমিদারের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কোনও রকমে খেয়ে-পরে হয়তো থাকতে পারতেন, কিন্তু সে ভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি ? অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন জীবন। কিন্তু দুর্ঘটনার জন্য জীবনটা নষ্ট করতে দিলেন না প্রভাত দা। সেই সময় মধুপুরে ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস বসানোর দায়িত্ব নিয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার এলেন। তাঁর ডানহাতটা ছিল কনুই থেকে কাটা। মধুপুরের লোক তাঁকে হাতকাটা বাবু বলে ডাকত। তাঁর কর্মদক্ষতা দেখে প্রভাতদার মনেও উৎসাহ জাগল। প্রভাতদা হাতকাটা বাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। সেই সময় এই হাতকাটা বাবুর উপস্থিতি দরকার ছিল। তিনি যদি পারেন তা হলে প্রভাতদা পারবেন না কেন ?

আরও একজন ইঞ্জিনিয়ার বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সুকুমার বোধহয় ইঞ্জিনিয়ার বাবু কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কয়েক বছর পর প্রভাতদা মধুপুরে ফিরে এলেন। কৃত্রিম হাত লাগিয়ে এসেছেন। দেখলে কোনও খুঁত আছে বলে ধরা যায় না, কিন্তু এই পর্যন্তই। কিন্তু দেখাই সার, এই হাত দিয়ে কাজ করা যায় না।

যুদ্ধের পর মধুপুরে অবস্থা পালটেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ট্রাক জিপ এসব খুব সস্তায় পাওয়া যেত। গাড়িঘোড়া হঠাৎ বেড়ে গেল। রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হয়েছে। আগে মধুপুর থেকে শালকোচা যেতে হলে তিনবার জোড়ানৌকো করে নদী পার হতে হত। সে সব নদীর ওপর সেতু হল। বাস ট্রাক চলাচল বাড়ল। অথচ ভাল একটা গ্যারেজ নেই, দক্ষ মেকানিক পাওয়া যায় না। কলকাতা থেকে এসে মধুপুরে একটা গ্যারেজ খুললেন প্রভাতদা। জটিল কাজ হলে নিজেই লেগে পড়েন। কৃত্রিম হাতটা খুলে রেখে কাটা ডানহাত দিয়ে পার্টস চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে নিপুন ভাবে বেঞ্চ পাকায়। যে ক্ষিপ্র গতিতে তিনি কাজ করেন, দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

আমি প্রভাতদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কলকাতা থেকে চলে এলেন কেন ? সেখানে নাকি ফোরম্যান হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবদের কোম্পানি, অনেক নাকি সুযোগ সুবিধা।

'তোমাক মিছা কথা কিয় কম? তাত মোর উপার্জন বহুতো বেছি আছিল।'

'তা হলে?'

'না রে, মধুপুর ছাড়ি থাকিব না পানু। মধুপুরত কিবা এটা আছে রে।'

সত্যিই কিছু একটা আছে, ছিল অন্তত। এখনকার কথা বলতে পারব না। দুদিনের জন্য যাই। প্রকৃত রূপ চোখে পড়ার আগেই আবার ফিরে আসি। ভৌগোলিক পরিচয়ই তো আর একটা জায়গার প্রকৃত পরিচয় নয়।

নয়

অতীতমুখী প্রগতিকে পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে। কিন্তু বারে বারে আমার মনটা মধুপুরের দিকে উড়ে যায়, বয়স যত বাড়ছে ততই সেই প্রবণতা বাড়ছে। এখন আর ক্ষোভ করে লাভ নেই। মধুপুর ছেড়ে আসা উচিত হয়নি। মহানগরে থেকে কীই বা লাভ হয়েছে? প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে ফিরে যাচ্ছি না কেন? অসুবিধা তো কিছু নেই। মধুপুরে নিজের বাড়ি আছে। গেলে বাড়ির সবাই যারপরনাই। খুশি হবে, কিন্তু ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। যোগসূত্র ছিড়ে গেছে। কৃত্রিম ভাবে গিঁঠ মেরে জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি মধুপুরের প্রতিটি লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুল, অথচ কারও সঙ্গে দেখা হলে অস্বস্তি হয়, কী কথা বলব বুঝে উঠতে পারি না। শুধু নিজের মনের মধ্যেই যোগাযোগের প্রয়োজন অনুভব করি, বাস্তবে যোগসূত্রের ছিন্ন প্রান্তগুলি খুঁজে পাই না। বিখ্যাত এক লেখক যথার্থই বলেছিলেন, 'ইউ ক্যানট রিটার্ন হোম এগেন।' সত্যিই বাড়ি ফেরা আর হয় না।

হঠাৎ মধুপুরের এক একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই। সবার সঙ্গেই যে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তা ও নয়।

হঠাৎ যে কেন কেবল রায়ের কথা মনে পড়ছে? বড় ঘরের কোনও লোক নয়। জমিদারের বাড়িতে অনেক কাজের লোকেদেরই একজন। আছে কারণ আছে। 'মামা' বলে ডাকলেই কেবল খেপে যেতেন। তাই রাস্তায় বেরুলে তাঁর আর শান্তি থাকত না। এদিক থেকে কেউ ডাক দিল, 'কেবল মামা'। কেবল তাকে তেড়ে গেলে ও দিক থেকে কেউ আবার চিৎকার দেয়, 'ও মামা, কোটে যাইস?' 'মামা' বলে ডাকলেই তিনি কেন পাগলের মতো হয়ে যান? এমনিতে তো বেশ ভাল মানুষ। কাজকর্ম ঠিকই করেন। মস্তিষ্কের বিকৃতি রয়েছে বলে মনে হয় না। এ নিয়ে আমার মনে অশান্তি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'মামা বুলি কৈলে তুই অমন রাগ খাইস্ কেনে?'

কেবল আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

'তুইয়ো, তুইয়ো মোক মামা কবার চাইস্?'

'ডেট্। তুম তো মুই দাদা বুলি ডাকাং। কেবল দা, দাদাক মামা কওয়া যায় নেকি?'

কেবলদার মতে 'শালা' আর 'মামা' সমান অপমানজনক, এখানে যে শালা বলছে, সে হল বোনের জামাই। যে মামা বলছে, তার বাবা হল বোনের জামাই। সত্যি এ ভাবে ব্যাখ্যা করলে তো আপত্তিকরই।

মোহিত মিশ্র বা মোহিত মিছিরের সামনে 'রাধাকৃষ্ণ' বললেই তিনি জ্বলেপুড়ে উঠতেন। তাই মোহিত মিছিরকে দেখলেই 'রাধাকৃষ্ণ' না বলে থাকাই যায় না, নিজে নিজেই কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। মোহিত মিছির ছিল মামাদের বরকন্দাজ।

কৌতূহল সামলাতে না পেরে মিছিরকে একদিন প্রশ্ন করলাম।

'রাধাকৃষ্ণ বললে খেপে যাও কেন?

'উ তো লম্বট হ্যায়। পরমাত্মা কা নাম লেনা হ্যায় তো সিয়ারাম বোলো।

এরই মধ্যে ও দিক কেউ আবার খেপিয়ে দিল।

'মোহিত মিছির, তোমার টিকিমে রাধাকৃষ্ণ।'

মিছিরের ইয়াব্বড় একটা টিকি। গিঁট দিয়ে ছোট করে রাখে। সেই টিকির গিঁট খুলে মিছির জোরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করে।

অপ্রাসঙ্গিক এক একটা ঘটনা, কোনও গুরুত্ব নেই। তবু এমনই এক একটা দৃশ্য হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দশ

মধুপুরে কথা বলা আমার পক্ষে কঠিন। আবেগের বশবর্তী না হয়ে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া কঠিন। এরকম তো হতে পারে না যে, মধুপুরের প্রত্যেকটা লোকই ভাল লোক ছিল, সেখানে ভাল লোকও ছিল, খারাপ লোকও ছিল। এখনও নিশ্চয়ই একই অবস্থা। তা সত্ত্বেও যাঁদের আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে জানি, তাঁদের প্রায় সবাই আমার আত্মীয় স্বজন। কারও কোনও বিচ্যুতি চোখে পড়লেও সবার সামনে তা ফাঁস করে দেওয়ার নৈতিক অধিকার নেই আমার। সবাই আমাকে স্নেহ করত। আত্মীয় অনাত্মীয়, মধুপুরে সবার কাছ থেকেই আমি অজস্র ভালবাসা পেয়েছি। রাজাবাহাদুর থেকে শুরু করে একজন ভিখিরিরও ছিল আমার প্রতি অপরিসীম শুভেচ্ছা।

আতপজান পাগলি লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াত। তাকে পাগলি কেন

বলা হত আমার ঠিক জানা নেই। ভিক্ষা চায় বলে নয়, শুভানুধ্যায়ী হিসাবে।

'বাও, ভাল করি পঢ়ালিখা করি ডাঙর মান্‌ষি হওয়া যাইবে। আল্লায় তোর ভাল করবে।'

মাথার দুপাশ দিয়ে দুহাত ওপরে তুলে চোখ দুটো বন্ধ করে বিড়বিড় করে কিছু বলত সে। অর্থাৎ আমার মঙ্গল করার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা।

আগেও হয়তো আমি আপতজানের কথা বলেছি। পুনরাবৃত্তি হলেও দোষের কিছু নেই। আমার কাছ থেকে কোনও প্রত্যাশা তার ছিল না। বাবুরামের কথাও হয়তো আগে বলেছি। ঘটনাটা সবাই জানে বলেই কোনও বাধা নেই। জমিদারের এক কর্মচারীর সঙ্গে বাবুরামের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এসব সহ্য করতে না পেরে বাবুরাম কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ওই কর্মচারীকে হত্যা করে। কেউ পেশাদার খুনি নয়। একেবারে কাঁচা কাজ। তাই সঙ্গে সঙ্গে সবাই ধরা পড়ে গেল। বাবুরাম এখনও বেঁচে আছে। অন্তত পাঁচ বছর আগে তো বেঁচেই ছিল। মধুপুর যেতে দেখা হয়েছিল। বেশ বুড়িয়েছে। আমাকে দেখে অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেছিল। 'বাও, কোন দিন আসলু। ভালে আসিস? ছাওয়াপোয়াগুলো ভালে আছে?'

কতজনের কথা বলব? হত্যাকারী থেকে শুরু করে একেবারে উচুঁ স্তরের লোক পর্যন্ত।

আগেকার লোকজন প্রায় নেই ই বলতে গেলে। নতুনরা আমাকে চেনে না। মধুপুরে গেলে অনধিকার প্রবেশ করার মতো লাগে। মহানগরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারিনি, মধুপুরের সঙ্গেও যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা।

আমি কলেজ পড়ার সময়ই রাজাবাহাদুরের গলায় ক্যানসার হয়। ছুটিতে বাড়ি এসেছি, একবার খবর নিতে যাওয়া উচিত। বাইরে থেকেই খবরাখবর করে চলে আসব বলে ভেবেছিলাম। তাঁর মেজছেলে আমাকে দেখতে পেয়েই একেবারে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল। রাজাবাহাদুর মুখ দিয়ে কথা বলতে পারেন না, কিন্তু মুখে ক্লেশের চিহ্ন নেই। আমায় দেখে তাঁর মুখে সম্ভাষণসূচক একটা হাসি ফুটে উঠল। চোখের ইশারায় আমাকে কাছের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। কথাবার্তা চালানোর কোনও প্রশ্নই নেই, কিছু জিজ্ঞাসা করার আমার সাহসও নেই।

স্লেটে তিনি কিছু লিখলেন। তাঁর সেক্রেটারি আমাকে স্লেটটা দিলেন। লেখাটা পড়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। নিজের যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে এই অন্তিম দশায় তিনি আমাকে প্রেরণা দিচ্ছেন।

'তোর ওপরত মধুপুরর অনেক আশা।' মধুপুর মানে মধুপুরবাসী। জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে আজ আমি জ্যাঠামশাইয়ের (রাজাবাহাদুরকে আমরা জ্যাঠামশাই বলে সম্বোধন করতাম) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি —

'জ্যাঠামশাই আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার আশা আমি পূরণ করতে পারলাম না।'

।। অনুবাদ : তাপস পাল।।

বেওয়ারিশ লাশ

প্রণবজ্যোতি ডেকা

গাড়িতেই বমি বমি লাগছিল। এখন হাঁটতে গিয়ে তলপেটটা যেন খামচে ধরল। ব্যথাটা ক্রমশ উপরের দিকে ওঠে বুকের নিচের দিকটাতে আটকে রইল। মানুষটা পেটে হাত দিয়ে কুঁজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যথাটা কমেছে বলে মনে হল। তামোল-পানের দোকানের সামনে চারটে খুঁটি পেতে বেঁধে রাখা কাঠের পাটাতনটার দিকে চোখ গেল।

কিছুক্ষণ বসে থাকায় ব্যথাটা কমল। কেবল পেটের মধ্যে কেমন যেন একটা ভারি অস্বস্তির ভাব থেকে গেল। আর হাঁটা ঠিক হবে না, একটা রিকশা নিতেই হবে আর কাল সকালবেলাই হাসপাতালে যেতে হবে। ওঠার চেষ্টা করতেই পেটের নাড়িগুলি পাক মেরে উঠল। অসহ্য ব্যথায় মানুষটি বাঁকা হয়ে গেল। ঘামে ভিজে জামাটা চপচপ করতে লাগল। কয়েক ফোঁটা ঘাম কানের পাশ দিয়ে বয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। মানুষটার একবার মনে হল এখনই বমি হয়ে যাবে। বমি হলে ব্যথাটা কমে যাবে। সে তখন যেতে পারবে।

অসহ্য শীতে মানুষটি থরথর করে কেঁপে ওঠল। ব্যথাটা যেন ধীরে ধীরে উজিয়ে ওঠছে। একটু হাওয়া লাগলে হয়ত ভালো লাগত। মানুষটা জোর করে হাঁ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। আরও একটু বাতাস। মানুষটা ডান হাত দিয়ে শূন্যে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল।

'পড়ে গেল, পড়ে গেল' মধু দোকানি লাফ মেরে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। 'বাতাস আসতে দিন, বাতাস আসতে দিন' বলে আরও কয়েকজন লোক দৌড়ে এল। 'নিশ্চয় মৃগী রোগ রয়েছে, তার স্যান্ডেল জোড়া মুখের সামনে ধরেন।'

'ওটা দিয়ে হবে না। চামড়ার স্যান্ডেল চাই। কার চামড়ার স্যান্ডেল আছে?' কে যেন চামড়ার স্যান্ডেল এগিয়ে দিল। মধু দোকানি একহাতে স্যান্ডেলটা নাকের সামনে ধরে অন্য হাতে মানুষটার হাওয়াই শার্টের বোতামগুলি খুলে দিল।

'এ মৃগী রোগী নয়। দেখতে পাচ্ছেন না মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে।' বাতাস

আসতে দিন, বাতাস আসতে দিন। ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন কেন? মানুষ দেখেননি নাকি?'

'একটু হাওয়া করুন।'

'পাখা পাখা।'

'দোকানে আছে। দোকানে আছে। পান দোকানে।' মধু দোকানি বাঁ হাত দিয়ে মানুষটার মাথাটা তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

'মুখে একটু জলের ছাঁট দিন না কেন?'

'জল, জল'।

এক রিকসাওলা কলের উদ্দেশে দৌড় লাগাল যেখানে কলস, বালতি সব সারি পেতে রাখা আছে। 'এই শালা দেশোয়ালি, আমার বালতি ছুঁয়ে দিচ্ছিস কেন। এই, এই বালতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?' রিকসাওলা ঘুরে তাকাল না। মেটে রঙের শার্ট পরা একটি লোক চোখে মুখে জলের ছিঁটা মারতে লাগল।

'জোরে জোরে হাওয়া করছেন না কেন? এই, এই তোদের এখানে কী চাই? মজা দেখতে এসেছিস নাকি? ভাগ শালারা। এদের থেকে রেহাই নেই।'

মানুষটার শরীরটা থরথর করে কেঁপে ওঠল। হাতের মুঠিটা শক্ত করে ধরে আবার খুলে গেল।

'শালা বেল্টে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা দেখুন।'

'বুকে হাত দিয়ে দেখছেন না কেন? মানুষটা মরেছে কিনা তাও দেখতে জানেন না কি?' ভিড়ের ভেতরের লোকগুলি বাইরে বেরনোর চেষ্টা করল। বাইরের লোকগুলি ভেতরে চলে এল।

'ডাক্তার, ডাক্তার। কেউ ডাক্তার ডাকছেন না কেন?'

'ডাক্তার এখন কী করবে মশাই? আর দরকারের সময় শালাদের পাওয়া যায় নাকি?' এমনিতে তো পয়সায় চারগণ্ডা।' মধু দোকানি মানুষটার মাথা নামিয়ে রেখে ওঠে দাঁড়াল।

'পাখাটা, পাখাটা?'

'এদিকে দিন।' মানুষের ভিড় বেশ ভালোভাবেই কমে গেল। বালতির মালিক বালতিটা নিতে এসে বিড়বিড় করে বলল 'শালা দেশোয়ালি জলটা মিছামিছি নষ্ট করল। এখন আবার লাইনের শেষে দাঁড়াতে হবে।'

মানুষটা পাশে কেবলমাত্র দশ বারো বছরের কয়েকটি ছেলে রইল। মধু দোকানি

দোকান বন্ধ করতে লাগল। রাস্তার ওপাশের সদানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভোলাবাবু দোকান থেকে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে মধু, কী হয়েছে?'

'কী আর হবে। শালা আর মরার জায়গা পেল না। আমার দোকানের সামনে এসে মরল। লাশটা পরে থাকলে কোথা থেকে খরিদ্দার আসবে?' মধু দোকানি দোকানের তালাটা দুই একবার টেনে দেখল।

'ভোলাবাবু আপনিও দোকান বন্ধ করে দিন। এখন পুলিশ এলে সবাইকে থানায় দৌড় করাবে।'

'আমি ভাই দোকানের ভেতর ছিলাম। কে কোথায় মরে পড়ে রইল তা আমি কিভাবে জানব?'

'আমি কিন্তু আগামী কালও দোকান খুলছি না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন তিনদিন ধরে দোকান বন্ধ আছে। পুলিশ জাতটা মহা খচ্চর, দেখতে পেলেই টাকা চাইবে।' ভোলাবাবুর মাথাটা দোকানের ভেতর ঢুকে গেল। মধু দোকানি চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে হাঁটা দিলেন। মানুষের ভিড় আবার একজন দুজন করে বাড়তে লাগল।

'এটা কি লাশ নাকি?'

'এখানে এভাবে কেন পড়ে আছে? most unhygenic?'

'আমাদের মিউনিসিপালিটির কাজও এমনি।'

'.... মারা গেলে তবে মিনিউসিপ্যালিটির দায়িত্ব। এটাকে পুলিশ রিমুভ করবে।'

'কেউ থানায় খবর দিচ্ছে না কেন?'

'আপনি তো যাবার সময় থানায় খবরটা দিয়ে যেতে পারেন?'

'অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

'ছেড়ে দিন, আমরা খবর না দিলে থানা কি আর খবর পাবে না? মরবেই তো, পৃথিবীতে লোকসংখ্যা কত বেড়ে গেছে। আবার ভিড় কমে গেল। নিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ শাড়ি পরা আধবয়সী মহিলাটি এগিয়ে এলেন।

মতি, মতিই হবে। একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। চোখের নীচটা কালো হয়ে গেছে। মুখটাও ভেতরে ঢুকে গেছে, অনেকদিন অসুখে ভুগছিল নিশ্চয়। কত বছর হল? কুড়ি বছর? ধেৎ সে শহরে আসারই আঠার বছর হয়ে গেছে। কী সার্কাস ছিল ওটা ওরিয়েন্টাল না কমলা? নামটাই মনে পড়ছে না। নামটা জিহ্বায় এসেও মনে পড়ছে না। নিউফিল্ডে তাঁবু বানানো হয়েছিল। বাপ রে বাপ কী বিশাল এক সাহেব পালোয়ান ছিল দলটিতে। মতি বলেছিল, এই সব দেখাশোনার জন্য কেউ নেই। মতি দেখতে

ক্ষীণ হলে কী হবে, তারও শক্তি ছিল। সেবার মারামারির সময় ...

'এই যে সাজিনা বেগম, প্যারের মানুষকে খুঁজে পেলি নাকি? কেউ রাস্তার ওপাশ থেকে চিৎকার করে বলল।

'হারামজাদা কোথাকার, মাকে গিয়ে বল যা, প্যায়ারের খোঁজ এনে দেবে, কে তোকে জন্ম দিয়েছে। আমার সঙ্গে লাগালাগি করলে কিন্তু ভালো হবে না।' মাথা না তুলেই নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিল মহিলাটি, যেন উত্তরটা মুখস্থ করে রাখা ছিল। মাথা না তুললেও সাজিনা বেগম কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিল এ হলো নিউ গ্যারাজের নবীন মিস্ত্রি। শালার বিবি মরেছে বেটা বিয়ে করেছে তবু রাস্তাঘাটে ফাজলামি করার স্বভাব যাচ্ছে না। বহুদিনের মক্কেল নবীন মিস্ত্রি। তার বিবি জীবিত থাকা অবস্থা থেকেই। নাহলে হয়তো আরও দুয়েক কথা শুনিয়ে দিত। সাজিনা বেগমের সঙ্গে লাগালাগি করলে শালার ইজ্জত মেরে দেবে। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা লাশটা থেকে একটু দূরে সরে এসে নিম গাছের নিচে বসল। অনেক বছর পার হয়ে গেল। নবীন মিস্ত্রি বা তখন কোথায় ছিল, যখন তার সঙ্গে মতির আশনাই চলছিল। লাশটার পাশে আরও কিছু মানুষ জমা হয়। একজন বুড়ির কথা শোনা গেল। 'হায় রাম, একটা মানুষ মরে পড়ে আছে।'

'দেখতে পাচ্ছিস না নাকি?' — মুখ ভ্যাঙচানো উত্তর এল।

'কার ঘরের বা ছেলে ছিল? কোন পোড়াকপালি জানি পথ চেয়ে রয়েছে?'

'হয়েছে হায়, এখানে এভাবে সময় নষ্ট করলে ওদিকে বাস চলে যাবে।'

'যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি, বুড়ো হয়েছি তো। এভাবে পথে ঘাটে মানুষের কি মরে পড়ে থাকা উচিত? কপাল।'

'মরা দেখলে যাত্রা ভালো হয় আয়।'

গাছের নিচে বসে সাজিনা বেগম শাড়িটা দিয়ে মাথাটা ঢেকে নিল। লাশটার দিকে আরও একবার তাকাল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না, এই সেই মতি ড্রাইভার। 'মা জগদম্বা' বাস চালায়। বাজারের বাস। মাঝে মাঝে রিজার্ভ হয়। সাজিনা বেগমের চোখের সামনে পুরোনো বাসের ছবিটা ভেসে ওঠল। সামনেরি দিকটা সবুজ। বডিটা হলদে রঙের। সামনের দিকে বড় বড় করে লাল কালিতে লেখা 'মা জগদম্বা'। মতি বার্কলে সিগারেটে সুখ টান দিতে দিতে সহকারিকে বলছে, মার, একবার মেরে দে, শালা ভাত খায় না নাকি?' কী ছিল জানি সহাকারিটার নাম। কানু, লালু না ভোলা। ধুর কত বছর হয়ে গেল। হঠাৎ সাজিনা বেগমের মনে হল বার্কলে সিগারেটের কী হল? অনেকদিন তো কোনো দোকানে দেখেনি। মতি একবার সিগারেট টানতে টানতে

বলেছিল 'বিড়ি খেলে শরীর থেকে বড় গন্ধ বেরোয়। শালা সহ্য হয় সে গন্ধ?' এটা বার্কলে সিগারেট। আরে শালা যদি বিড়িই খেতে হয় তাহলে আর কামাই করছি কেন?' লাশটার সামনে পড়ে থাকা গোড়ালি (যে-খাওয়া রবারের চটিজোড়ার দিকে তাকিয়ে সাজিনা বেগমের মনে হল, শেষের দিকে তার হয়ত বিড়ি কেনারও পয়সা ছিল না। যখন সাজিনার সঙ্গে তার দেখা হয়, গফুর চাচাও তাকে মতি বলে ডেকেছিল। অন্য সবাই ড্রাইভার বাবু বলে ডাকত। কয়েকজন তাকে ড্রাইভার সাহেব বলেও সম্বোধন করছিল। বলবে নাই বা কেন, তার পরনে যে কালো কাপড়ের গরম কোট প্যান্ট। গলায় মাফলারটা পেঁচিয়ে নিয়ে সে হাসতে হাসতে বলে, 'আরে আমিও কি আর নতুন নিয়ে লাইন বাস চালাতে পারি না, না কি ট্যাকসি নিতে পারি না। এই তো ভবেন মহাজন বলছে— মতি তুই তোর ভাঙা গাড়িটা ছেড়ে দে। আমার কাছে চলে আয়, ট্যাকসি রেখে দেব। ইনকাম যা হবে তার আধাআধি বখরা। আমি সোজাসুজি না করে দিয়েছি।'

শালা পয়সাই কি সব? হৃদয় নেই? আর আমার ভাঙা বাসে কী পয়সা নেই। মতি আস্তে করে বাঁ চোখটা বুজে নেয়, যাতে শ্রোতার কোন সন্দেহ না হয় যে মতির যত পয়সা লাগে ভাঙা বাস থেকেই বের করে নেয়। কোটটা কিন্তু সত্যি সত্যিই গরম ছিল। একবার সার্কাস দেখে ফিরে আসার সময় রাতের বেলা গাড়িতে মতি কোটটা তাকে পরিয়ে দিয়েছিল। কোটটাতে সিগারেট সিগারেট, ঘাম ঘাম আরও কী সব গন্ধ। সে কোটের হাতাটা নাকের সামনে এনে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়েছিল। আঠার বছর পরে গন্ধটা মনে পড়ায় সাজিনা বেগমের মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠল। ওটা পুরুষ মানুষের গন্ধ। শালাগুলির সবার গায়ে একই রকম গন্ধ। সেদিন বাসে গফুর চাচা ছিল। বাড়িতে গিয়ে বলে দিল, 'দেখিস এই করিম, মতি ড্রাইভারের সঙ্গে তোর মেয়ের বেশ ঢলাঢলি চলছে। মতি হাজার হোক ভিন্ন জাতের ছেলে। কবে যে নাক-কান কাটবে।' আব্বাজান বলেছিল, 'না, না মতি আমার নিজের ছেলের মতোই।'

নিজের ছেলের মতো। আজ এত বছর পরে সাজিনার কথাটা মনে পড়ায় থুঃ করে থুথু ফেলল। সে যেন আর জানে না মতি আব্বজানকে মদ খাবার জন্য পয়সা ধার দেয়। কখনও কখনও আবার গুয়াহাটি থেকে বিলেতি বোতল নিয়ে যায়। আম্মাজান কেবল বলেছিল, 'আমাদের সাজিনা হুঁশিয়ার মেয়ে।' আম্মাজান কোথা থেকে জানবে, তার সঙ্গে তখন মতির ঘোর মহব্বত চলছে।

মতি তখন দিনের বেলা বাজারের বাস চালায়। রাতে সেই গাড়িতেই 'রিজার্ভ' মারে। আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে গুয়াহাটিতে সার্কাস দেখার জন্য লোক নিয়ে

আসে। সার্কাস শেষ হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রাতের বেলা সাজিনাদের সামনের ঘরটাতে খেরের ওপর শুয়ে থাকে। সঙ্গে 'মাল' থাকলে আব্বাজান রাতের বেলা চুপচাপ এসে মতির সঙ্গে একটু নেশা চড়িয়ে যায়। সাজিনা সেবার তিনদিন সার্কাস দেখল। একবার সার্কাস দেখতে এসে মতির সঙ্গে সিনেমাও দেখল। কী জানি ছিল সিনেমাটা? সাজিনার কেবল মনে আছে কেউ একজন খুব জোর ঘোড়া ছুটিয়েছিল।

সার্কা উঠে যাবার চারদিন আগে সে ঠিক করল, মতির সঙ্গে পালিয়ে যাবে। মতি তাকে বলছিল, 'তুই আমার সঙ্গে চল। তোকে হিন্দু বানিয়ে বিয়ে করব।' না পালিয়েই বা কী করবে? মানুষকে পনেরো বললে কী হবে? সে তো জনে তার আঠার বছর হয়েছে। ধান উঠলেই আব্বাজান ধান বিক্রি করে তার পয়সা দিয়ে মদ খায়। তারপর বলেন টাকাই তো নেই। এবার ধান উঠলেই সাজিনার বিয়ে দেব। আম্মাজান কী কম কেঁদেছিল? শেষ পর্যন্ত গিয়ে রহমত বুড়োকে তার জন্য ঠিক করল। তার বড় বিবি বোধহয় সাজিনার মায়ের চেয়েও বড় হবে।

'আরে সাজিনা বেগম যে এখানে?'

সাজিনা বেগমের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। মাথা তুলে দেখে দশরথ কনেস্টেবল। ছেলেটি ছোট কিন্তু স্ফুর্তিবাজ।

'এই বসে আছি।'

'লাশটার সামনে যে?'

'লাশটার জন্যই বসেছি।'

'মক্কেল নাকি?'

'মক্কেল নয়, এর সঙ্গে আশনাই ছিল।'

'মরা মানুষের সঙ্গে মহব্বত?' দশরথ কনেস্টেবল হেসে ফেলল, 'আমি আরও ভাবছি ব্যাপরটা কী? ব্যাপার তাহলে এই। 'সাজিনা বেগমের জন্য অর্ধেক গুয়াহাটি পাগল। এদিকে সাজিনা বেগমের প্যায়ারের মানুষ এখানে পড়ে রয়েছে।'

'সাজিনা বেগমের জন্য অর্ধেক গুয়াহাটি যখন পাগল ছিল, তখন তুই মার বুকের দুধ খাস।' দশরথকে পাত্তা না দেবার জন্য সাজিনা বেগম বলে ওঠল, যদিও কথাটা তার ভালোই লাগছিল। 'আরে আমি মায়ের বুকের দুধ খাবার সময় থেকেই তোর মহব্বতে ফেঁসে আছি।' দশরথের কথায় দুজনেই হেসে উঠল।

'তোর কাছে তামোল আছে নাকি। এই শালা দোকানিটাও দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে।' দশরথ মধু দোকানির বন্ধ দোকানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল।

'তামোল নাইরে। আর একটি পায়সাও সঙ্গে নেই যে কিনে খাব।' সাজিনা বেগম স্বাভাবিক ভাবেই মিথ্যা কথা বলল।

'দাঁড়া, আমি একটা নিয়ে আসছি। খুব তামোল খেতে ইচ্ছা করছে। দেখিস লাশটা যেন আবার কেউ টেনে নিয়ে না যায়।'

'মরা মানুষের লাশে কার প্রয়োজন?'

'আরে মরে গেলেই তো লাশ হয়।' দশরথ মুখ ঘুরিয়ে মজা করে বলল। দশরথ চলে যেতেই সাজিনা বেগম লাশটার সামনে এগিয়ে এল। মতির মুখটা একেবারে বুড়ো মানুষের মতো হয়ে গেছে। তিন চারদিন দাড়ি কামায় নি। অর্ধেক দাড়ি পেকে গেছে। মুখটা এত বসে গেছে, বোধহয় দুই তিনটা দাঁতও পড়ে গেছে। সাজিনা বেগমের মনে পড়ল তার এখনও একটিও চুল পাকেনি। অবশ্যে গোড়ার দাঁত একটা গত এক বছর ধরে বেশে ব্যথা করছে। দাঁতটা পোকায় কেটেছে, তুলতে হবে। মতির মুখের কাছটাতে রক্ত আর ফেনার মতো কিছু একটা লেগে আছে। চোখ দুটি খোলা। মরা কুকুরের মতো সাদা, যেন অনেকদিন জলে ডুবে ছিল। মতির চোখের মণিটার ওপর দিয়ে একটা পিঁপড়ে চলে গেল। পাতি না পড়া চোখটা দেখে সাজিনার শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে ওঠল। পিঁপড়েটাকে তাড়িয়ে দিতে গিয়েও তাড়াল না। আবার এসে নিমগাছটার নিচে বসে রইল।

এই মতি, হ্যাঁ, এই মতিই বাসটা স্ট্যান্ডে রেখে টকোবাড়ি থেকে মাংস কিনেছিল। চারজনের হাতে একটি ছোট পোঁটলা, একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ আর গামছা দুটি। সেই গামছা দুটি নিয়ে পরে মতি হেসেছিল। 'গামছা দুটি তুই কেন আনলি বল তো? হীরা, জহরৎ হলেও একটা কথা ছিল। না কী তুই ভেবেছিলি আমরা শহরে গামছা পরে বেড়াই।' সাজিনা লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু কোনোদিনেই বলল না যে সে মতিকে তাদের বাড়িতে কুয়োর কাছে ফাটা গামছা পরে স্নান করতে দেখেছে। সে আর তার ছোট বোন ঢেঁকি ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল। ছেঁড়া গামছা পরা মতিকে দেখে দুজনেই মুখে কাপড় গুঁজে খিল খিল করে হাসি চেপে রাখতে চেষ্টা করছিল। ততদিনে অবশ্যে মতির সঙ্গে তার পালানোটা ঠিক হয়ে গেছে, গামছার কথাটাই প্রথম তার মাথায় এসেছিল। মতিকে কিন্তু কোনোদিনই সেই কথাটা বলা হল না। অপরিচিত একটি পুরুষ মানুষকে স্নান করার সময় সে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখেছিল কথাটা জানতে পারলে মতিই বা কি ভাবত? তারপরে তো পালিয়েই এল।

কিন্তু সেই প্রথম দিনটি। মতি রিকসায় তার হাত টিপে আদর করছিল। এর আগেও মতি তার শরীরের হাত দিয়ে আদর করেছে। কিন্তু তা বলে এত মানুষের

সামনে, পথে, রিকসায় সে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। মতি শুধু হাসছিল। মতি তাকে এনে মাছখোয়ার রেললাইনের সামনে একটি বাড়িতে নিয়ে এল।

রাতের খাবার খেয়ে মতি বলেছিল, 'তুই একা থাকতে পারবি তো। পাশের ঘরটিতেই ফুলমতিয়ার মা থাকে। আমি আজ একজন বন্ধুর সঙ্গে থাকব। কাল থেকে তোর সঙ্গে। মতি চোখ টিপে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাতে মতির বিছানায় তার ঘুম এল না। কিছু আশঙ্কা, কিছু আশা কে জানে রাতে হয়তো মতি এসে উপস্থিত হবে।

মতি সকালবেলা এল। সঙ্গে পুরী আর সব্জি। খাবার খেয়ে মতি কাজে বেরিয়ে গেল। দুপুরবেলার ভাত দিল ফুলমতিয়ার মা। মতি বলে গিয়েছিল বোধহয়। সন্ধেবেলা মতি ফিরে এল। মদ খেয়ে এসেছে। সাজিনাকে কাছে টেনে নিল। সাজিনা নিকার কথা বলেছিল। মতি এক চড় কষাল। তারপর আরও এক চড়, তারপরে লাথি। নিকার কথা আর তোলা হল না। প্রচণ্ড নাকের ডাক, ভীষণ শরীর ব্যথা নিয়ে সেদিনও সাজিনার ঘুম হল না। মন ভালো লাগছিল, আবার খারাপও লাগছিল। আব্বাজানও যৌবনে মাকে নাকি এভাবে মারধোর করত। তখন আব্বাজান কাজের মানুষ ছিল। যেভাবে কাজ করত, সেরকম রাগও ছিল। একদিন মারের চোটে আশেপাশের লোকরা দৌড়ে এসেছিল। পরে আব্বাজান মদ খেতে শুরু করল। কাজ না করা বেমার দেখা গেল। মায়ের চোখের দিকে আর তাকাতে পারে না। চোখে চোখ পড়ে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। তা বলে মতির তাকে এভাবে মারধোর করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাকে নিকা করার কথা মতিই তাকে বলেছিল। মতির যদি নিকার দরকার নেই তাহলে তারও কোনো প্রয়োজন নেই। দিলের মিলটাই আসল।

পরের দিন অবশ্যে মতি তাকে খুব আদর করে মাপ চেয়ে নিয়েছিল। আগের দিন নাকি তার মেজাজ খারাপ ছিল। বাসস্ট্যান্ডে কোন এক ড্রাইভার তাকে বলেছে যে সে সাজিনাদের গ্রামের দিকে গেলে তাকে আধমরা করে ফেলবে। সেদিনই একটা রিজার্ভ ছিল। মতি যাবে না বলায় মালিক তাকে বাকি পয়সা নিয়ে যেতে বলে। এত দিনের চাকরি, শালা মালিকগুলিও নেমকহারাম। তারপর একজন লোকের সঙ্গে দেখা করেছিল। সাজিনাকে হিন্দুমতে বিয়ে করার জন্য। সেখানেও একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুনতে হল। শালা রাগের চোটে মদ খেয়ে বাড়ি এসে এসব কাণ্ড করেছে। মতি নিজের কানে ধরতে চেয়েছিল, সাজিনাই দেয়নি।

তারপর ছয়মাস বেশ ভালোই চলছিল। মতি ইন্দ্র মহাজনের সিটিবাস চালাতে শুরু করল। সকাল বেলা বেরিয়ে যায়, রাতের বেলা আসে। নিয়মিত রোজগার।

সাজিনাকে শাড়ি, ব্লাউজ, পাউডার কত কিছু যে কিনে দিয়েছিল। একবার একটা সোনার আঙটিও বানিয়ে দিয়েছিল। কোথায় যে গেল আঙটিটা? সাজিনা বেগম ভাবল। তারপরেই মনে পড়ল কালু সিঙের মৃত্যুর বছরে যে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে সময় বন্ধক দিয়েছিল, পরে আর ছাড়িয়ে আনা হয়নি।

সবই ঠিক ছিল, কেবল এই ফুলমতিয়াদের সঙ্গে পাশাপাশি থাকাটা ভালো লাগত না। ফুলমতিয়ার কাছে লোক আসে, দুই একদিন থাকে তারপর চলে যায়। নতুন নতুন মানুষ আসে। কখনও বা আবার পুরোনো মানুষ ঘুরে আসে। মানুষ এলে মা বারান্দার ঘরে শোয়। সাজিনা আর ফুলমতিয়ার ঘরের মাঝখানে বাঁশের বেড়া পর্যন্ত নেই। সব কিছুই দেখা যায়, সব কিছু শোনা যায়। সাজিনার তখনো নিকা না হলে কি হবে, হিন্দু নারীর মতো ওড়না নেয়, কপালে সিঁদুর দেয়। ফুলমতিয়াকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মতি শুধু হাসে। বলে 'আরে সবারই নিজের নিজের বিজনেস আছে। এইসব ড্রাইভাররা কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে আসে, যাবে যোরহাট, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া। মাঝখানে এখানে দুই একদিন থেকে স্ফুর্তি করে যায়। ফুলমতি না থাকলে ওরা কোথায় যাবে। তোদের মতো মেয়েদের ওপর চোখ দিলে হবে।' সাজিনা দুহাতে তার মুখটা চেপে ধরে। আর বলতে দেয় না। সাজিনার কাছেও পুরুষ মানুষ আসে। ইব্রাহিম, ও বেদুর, নিশি, যোগেন এরা সব মতির ইয়ার দোস্ত। স্ফুর্তি, তামসা করে, কখনও কখনও মদও খায়। কিন্তু যা কিছু সব মতি থাকা অবস্থায়। মতি বাড়ি না থাকলে সে কাউকে ঘরে ঢুকতে দেয় না বা কারও সঙ্গে কথাও বলে না। এই ইব্রাহিম বজ্জাতটাই তো কতদিন বউদি বউদি বলে একেবারে গায়ে ঢলে পড়তে চেয়েছিল। তখনই মতিকে বলে দিলে ভালো হত। বললেই বা কি হত। সাজিনা নিজেকেই মুখ ভেঙচে হাসল। সব সমান বজ্জাত। মতি যেদিন মার খেয়ে বাড়িতে ফিরে, চোখে মুখে রক্তের দাগ, এক গোছা চুল কে যেন তুলে নিয়েছে। শার্টটা ছিঁড়ে গেছে। শার্টটা খুলতেই দেখে সমস্ত শরীরে বেত দিয়ে কোপানের দাগ, জায়গায় জায়গায় কালো হয়ে গেছে। মানুষটা হেলতে দুলতে আসছে। সাজিনা দেখেই কাঁদতে শুরু করল। মতি ধমক দিয়ে বলল 'চুপ কর শালি, কান্নাকাটি করতে হবে না, তার চেয়ে বরং জল গরম করে। ক্ষতস্থান গুলি ধুয়ে দে'।

সাজিনা বেগম কাঁদতেই কাঁদতেই জায়গাগুলি ধুয়ে দিল। কিছুই জিজ্ঞেস করল না। রাতের বেলা মতি বলল যে গাড়ি জোরে চালানোর সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে যাচ্ছিল, গাড়ির সামনে দিয়ে একটা ছোট ছেলে দৌড় মেরেছিল। ছেলেটা তো বেঁচে গেছে, কিন্তু গাড়ি গিয়ে একটা রিকসাকে ধাক্কা মারল। কারও কোনো ক্ষতি হয় নি,

কিন্তু পাবলিক মতি ড্রাইভারকে ধরে খুব মার লাগাল।

আসল ব্যাপরটা সাজিনা বেগম কয়েকদিন পরে জানতে পারল। বোধহয় ইব্রাহিমই কথার মধ্যে বলে ফেলেছিল। রাতের বেলা ভাত খেতে বসে ইন্দ্র মহাজন ছোট মেয়ের খোঁজ করতে গিয়ে তাকে বাসের ভেতর মতির সঙ্গে দেখতে পায়। ইন্দ্র মহাজনের ছেলে দুটি মতিকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রচণ্ড পিটুনি দেয়। পুলিশেই দিয়ে দিত, নিতান্তবদনামের ভয়েই দেয়নি। সাজিনা বেগমের খুব রাগ হয়েছিল ইন্দ্র মহাজনের মেয়েটির ওপর। হাতের কাছে পেলে চোখ দুটি ওপড়ে নিত। সাজিনা বেগম আগে মেয়েটিকে দেখেছে। পুরুষ মানুষ দেখলেই শরীর দুলিয়ে হাটে। ওই হাতিটাকে আবার ফ্রক পরিয়ে রেখেছে। মতিকে দোষ দিয়ে কী হবে, ওই হারামজাদির পুরুষ মানুষ হলেই হল।

তার কয়েকদিন পরেই মতি উধাও হয়ে গেল। সে তখন নুরুল ঠিকাদারের লড়ি চালায়। প্রথম রাতে মতি না আসায় সে খুব একটা অবাক হয়নি। পুরোনো গাড়ি, মাঝে, মধ্যে রাস্তা ঘাটে খারাপ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলা সে না আসায় সাজিনা বেগম নুরুল ঠিকাদারের কাছে গেল। ঠিকাদার উল্টে তাকেই তাড়া করে এল, 'কোথায় গেল হারামজাদা? আমার এদিকে লোড করা গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। শালা যাদি কাজ করবে না তাহলে বলে দিলেই তো হয়।' সাজিনা বেগম কেঁদে ফেলল। নুরুল ঠিকাদারের স্ত্রী বুঝিয়ে শুনিয়ে সঙ্গে একজন লোক দিয়ে থানা, হাসপাতালে খবর করার জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দিল। মতি কোথাও নেই। প্রথম দিন সে ভাত রেঁধে খেয়েছিল। দ্বিতীয় দিন যে নুরুল ঠিকাদারের স্ত্রী চা খাইয়ে পাঠিয়েছে তাই সই। হাতে দুটি টাকা ছিল, রিকসায় ঘোরাফেরা করতে কিছুটা খরচ হল। বাকিটা দিয়ে কিছু একটা কিনে ফেলল। তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা থেকে উপোস। নুরুল ঠিকাদারের বাড়ি থেকে আসার পরে সে আর মতির চিন্তা করেনি। ভেবেছিল নিজের কথা। নুরুল ঠিকাদার বলে পাঠিয়েছিল, হারামজাদা পালিয়েছে যা। আমার কাছ থেকে কুড়ি টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে, লাইসেন্সটাও নেই, ঘর থেকে আরও কী নিয়েছে দেখে নিস। সাজিনা ঘরে এসে লক্ষ্য করল, মতির পরে থাকা কাপড় ছাড়াও একটা শার্ট, একটা পেন্ট, আর কয়েকদিন আগে কেনা জোতা জোড়াও নেই। মতি স্যাণ্ডেল পরেই গাড়ি চালায়।

মতি যাবার চারদিন পরে ইব্রাহিম এসে উপস্থিত হল। 'এই তামোল খাবি?' দশরথ একটা তামোল পান এগিয়ে দিল। সাজিনা বেগম তামোলটা নিয়ে একটা আঙুল দিয়ে পান পাতা থেকে চুনটা মুছে নিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল। তারপর তামোলটা মুখে দিয়ে

নীরবে চিবোতে লাগল।

'কী হল, একদম চুপ করে আছিস দেখছি। বড় প্যায়ারের মক্কেল ছিল নাকি? দিলদার না মালদার?'

'মক্কেল নয়, এর সঙ্গেই প্রথম বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম।'

'ও হো, পহেলা প্যার।' দশরথ আরও কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু একটা সাদা অ্যামবাসাডার এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির জানালা দিয়ে হাতটা বের করে শঙ্করীবাবু ইঙ্গিতে দশরথকে কাছে ডাকলেন। বিরাট বিজনেস ম্যান। দশরথ আবার পয়সাওলা লোকদের সহ্য করতে পারে না, তবুও এগিয়ে গেল। শঙ্করীবাবু গাড়ির দরজাটা খুলে টাক মাথাটা বাইরে বের করে রাস্তায় থু করে কিছুটা পিক ফেললেন। তারপর দশরথকে জিজ্ঞেস করলেন 'এটা মূর্দা নাকি?'

'একদম মরে গেছে' দশরথ বলল।

'এটা কিরকম পথে পড়ে রয়েছে?'

'ছোটা সাহাবর হুকুম।' আসলে শঙ্করীবাবু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন যে লাশটা পথে কেন পড়ে রয়েছে, আর দশরথ তার উত্তরে বলতে চেয়েছিল যে এস. আই সাহেব হুকুম দিয়েছেন যে তিনি না আসা পর্যন্ত যেন কেউ লাশটা নাড়াচাড়া না করে। মুখে যাই বলুক না কেন দুজনেই ঠিক বুঝতে পারল। শঙ্করীবাবু পুনরায় বললেন, 'লাশটা যদি বেওয়ারিশ হয় তাহলে আমার গদিতে খবর দিলে সৎকার দিলে সৎকার সমিতির লোক এসে নিয়ে যাবে। মানুষটা কি হিন্দু?'

'কিভাবে বলব হিন্দু না মুসলমান। এই সাজিনা বেগম জানে।'

সাজিনা বেগম, সাজিনা বেগম' শঙ্করীবাবু নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন। তারপর বললেন, লোকটি মুসলমান। মুসলমান লোককে খবর দিতে হবে।' তারপর পথে আরও কিছুটা পিক ফেলে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে গাড়ি চালানোর জন্য ইঙ্গিত দিলেন। দশরথ সাজিনা বেগমের কাছে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তখনই আরও কিছু কৌতূহলী মানুষ তাকে প্রশ্ন করতে লাগল।

চার দিনের দিনই হবে, সকালবেলা ফুলমোতিয়ার মা এক গ্লাস চা আর কিছুটা মুড়ি দিয়েছিল। দুপুরবেলা চাল আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে লজ্জায় চাল আছে বলে বলেছিল। সারাটা দিন শুয়ে ছিল। মতির কথা ভেবে ভেবে, ভাবতে বন্ধ করে দিয়েছিল। নিজের কথাই ভেবেছিল। ইব্রাহিম টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিটাতে ভাত, ডাল আর সব্জি নিয়ে এসে বলেছিল, 'এটা আমার নানী পাঠিয়েছে, না খেলে বুড়ি বড় কষ্ট পাবে। ওই হারামজাদা কিছু টাকা পয়সা রেখে গেছেকি?' সাজিনা

বেগম বুঝতে পারল, মতির পালানোর খবরটা সবাই জানে। সে কেবল জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পালাল কেন?' ইব্রাহিমের সামনে সে কেঁদে ফেলল।

'হারামজাদা কেন পালিয়েছে?' ইন্দ্র মহাজনের মেয়ের ...' ইব্রাহিম হাত দুটি পেটের সামনে এনে একটা বিশেষ ভঙ্গি করল যে ইন্দ্র মহাজনের মেয়ের অবস্থা আর মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হল না। মহাজনের ছেলে দুটি মতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই নাকি খুন করবে। মতি জেনেশুনেই পালিয়েছে। আমি, নিশি, ইদ্রিশ, সবাই মিলে তাকে এত করে বোঝলাম, আরে ভাবিকেও নিয়ে যা, সে কোনমতেই রাজি হল না। বলে, আরে মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়ব। জোয়ান, খুবসুরত মেয়েছেলে, কাচ্চাবাচ্চা নেই, নিজের খানা নিজেই জোগাড় করে নেবে।'

'জোয়ান, খুবসুরত মেয়েছেলে' সাজিনা বেগম ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করল। তারপর থু করে মতির উদ্দেশে থুথু ছিটিয়েছিল। থুথু ছিটিয়ে তার খারাপই লেগেছিল। যাঃ লোকটি মরেই গেছে। আর কে জানে মতি হয়তো সে ভাবে বলেইনি। ইব্রাহিম শালাও কি কম বজ্জাত ছিল। সে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলত। ইব্রাহিম মতির কথা বলতে গিয়ে আরও বলেছিল 'শালা আমাদের কথা শুনল না। যাবার সময় আমার কাছ থেকে আরও ত্রিশ টাকা নিয়ে গেছে।' ইব্রাহিম দেবে টাকা। কে জানে মতির কাছ থেকে কোনো কিছু রেখে দিয়েছে কিনা। শালা কি আর এমনিতে পচে মরেছে। সাজিনা বেগম ভাবল।

প্রথম দিন সন্ধেবেলা ইব্রাহিম বেশিক্ষণ বসেনি। ইব্রাহিম যাবার পরে সাজিনা বেগম ভাতটুকু নর্দমায় ফেলে দিতে চেয়েছিল। কিছু একটা ভেবে ফেলল না। রাতের বেলা উঠে খেয়ে নিল। ভাত, ডাল, সব্জি। পরের দিন সকালবেলাই ইব্রাহিম এসে উপস্থিত হল। সারাটা দিন রইল। তার পরের দিনও। পরে আর সাজিনা বেগম নিজেই বলতে পারে না কিভাবে ইব্রাহিম রাতের বেলাও থাকতে লাগল। মাঝে কাজও শুরু করেছিল। নুরুল ঠিকাদারের স্ত্রী আদর করে কাজটা দিয়েছিল — কাপড় ধোয়া, বাসন মাজার। দিনের খাবারটা আর বেতন মাসে ত্রিশ টাকা। ঠিকাদারনি দেখতে শুনতে সুন্দর একটি মেয়েমানুষকে রাতের বেলা আশ্রয় দিতে সাহস করল না — বাড়িতে বড় বড় ছেলেরা রয়েছে। মাসের শেষে তার বেতন থেকে মতির নেওয়া অ্যাডভান্স কুড়ি টাকা নুরুল ঠিকাদার কেটে রাখল। তারপর থেকে সে-ও আর কাজে যায়নি, ইব্রাহিমও নিষেধ করেছে।

সন্ধেবেলা মতির পুরনো বন্ধুরা এসে জমা হয় — নিশি, ওয়াহিদ, যোগেন ধন এরা সব। কখনও বা মদ খায়, তার সঙ্গে গলাবাজি করে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে। ইব্রাহিম

কখনও বা বিজনেসের জন্য উধাও হয়ে যায়, তখন নিশি বা ওয়াহিদ এসে থাকে। মতি যাবার পরে তার জন্য ইব্রাহিম যা, নিশিও তা, ওয়াহিদও সেই একই। তাকে খাবার খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়, টুকটাক কিনে দেয়। ইব্রাহিমের বিজনেসটা কি সাজিনা বেগম বুঝতে পারেনি। সেদিনই বুঝতে পারল যেদিন তার সামনেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত ওয়াহিদের শার্টের কলার চেপে ধরে ইব্রাহিম বলল — 'এই শালা পয়সা দিয়ে যা। গত মাসেরও পয়সা বাকি রয়েছে।' সাজিনা ওয়াহিদও পয়সা দেয় জেনে অবাক হল। সিনেমা-টিনেমা দেখতে গেলে সাধরণত ওয়াহিদই পয়সা খরচ করে। কিন্তু ওয়াহিদই যেন দোষী এভাবে সে বলল 'একটা পয়সা নেই ভাই। মালিক এসে গেলেই ...।'

'ধুর শালা। গত মাসেও তো তুই একই কথা বলেছিলি। তোর মালিককে আমি রাস্তায় দেখতে পেয়েছি।'

'আল্লার কসম ভাই, মালিক কলকাতা গেছে। এই সপ্তাহে এসে যাবে।'

'শালা পকেটে যদি পয়সা না থাকে তাহলে মেয়েমানুষের সঙ্গে স্ফুর্তি করতে আসিস কেন? শালা এই সময়টাতে কত টাকা কামাতে পারতাম জানিস?' সাজিনা বাকিটুকু আর শুনল না। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছু ক্ষণ পরে ইব্রাহিম এসে দরজা খুলতে বলল — প্রথমে ভালভাবে, তারপরে খিস্তি খেউড়। পাশের বাড়ি থেকে মানুষজন বেরিয়ে না এলে দরজাটা বোধ হয় লাথি মেরেই ভেঙে ফেলত। যাবার আগে গজগজ করে গেল — 'দরজা বন্ধ করে বসে থাক, ক্ষুধা লাগলে নিজেই খুঁজতে বেরোবি আমাকে। না কি তোর মতি এসে হাজির হবে?'

ইব্রাহিম চলে যাওয়ার পরে সাজিনা গ্রাম ছেড়ে আসার পর প্রথমবারের জন্য মা, বোনকে মনে করে মাটিতে গাড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল। ঠিক করল পরের দিনই গ্রামে ফিরে যাবে, বাবার পায়ে ধরবে, মায়ের পায়ে ধরবে। ধান বেনে, কাপড় কেচে পেটের ভাত জোগাড় করবে।

সাজিনা বিবি কথাগুলি মনে পড়ায় নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত বোকা ছিল সে। হুঁ, গ্রামে ফিরে যাব বললেই যাওয়া যায় কি? তাকে লাথি মেরে তাড়াত। এখন আলাদা কথা। গ্রামের সবাই জানে সাজিনা বেগমের গুয়াহাটিতে দুটো ঘর আছে। ঘর দুটিতে কারা থাকে সে কথাও সবাই জানে। না জানার ভান করে। বড় বেশি বলতে হলে বলে, জায়গাটা ভাল নয়। এই গফুর চাচা প্রথম যেদিন তাকে বস্তিতে দেখে, কি আনন্দ তার অধঃপতন দেখে। 'তুই করিম মিঞার মেয়ে, কত বড় বংশের মেয়ে তুই। তুই এসে বস্তিতে ঘর নিলি। তোর বাবা জানতে পারলে এখানে এসে

তোকে দুই টুকরো করে রেখে যাবে। তোর মা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। তুই গ্রামের নাম ডুবিয়েছিস। আমি তখনই তোর বাবাকে বলেছিলাম বুড়ো টুড়ো যাই পান বিয়ে দিয়ে দিন। রহমত মিঞা তাদের কাছে বুড়ো হয়ে গেল। কাল তোর বাবাকে নিয়ে আসব দাঁড়া। নিজের চোখে দেখে যাক বেটি কি করছে। 'শালার সব স্ফুর্তি মাটি হয়ে গেল ঘর দুটো সাজিনা বেগমের জেনে। প্রথমে বিশ্বাসই করবে না। বলে 'আরে গফুর বুড়োকে কি ফাঁকি দিবি। তোদের সব ধাপ্পা-বাজি আমার জানা আছে।' পরে অন্যের মুখে শুনে বিশ্বাস করল। তার মুখের চেহারাই পালটে গেল। শালি হারামজাদি থেকে সাজিনা বেগম হয়ে গেল। বাবার কথা বলল, কাজ-কর্ম করে না, বাড়িতেই বসে থাকে। ঘর-দরজা মতোই রয়েছে সে বিরাট মানুষটি, ধুতি পাঞ্জাবি, গালায় তাগা পরা। ঘরের ভেতর এসে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিয়ে বলল, এখানে চুয়াল্লিশটা টাকা আছে, রেখে দিস। সাজিনা কিছু একটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু তার আগেই সে বেরিয়ে গেল। তারপরে সকালবেলা শরীরে একটা টিকটিকি পড়েছে। টগর তো শুনেই নম্বর কাটতে দৌড়ে চলে গেছে। ভেঙে গেছে। মা মুরগির তরকারি বেচে খাবার খরচ বের করে। বাইরে মিলে কাজ করছে, ঘরে টাকা পয়সা দেয় না। সাজিনা পালিয়ে যাওয়ায় বোনেরও বিয়ে হল না। শেষে রহমত বুড়ো এসে আশ্রয় দিয়েছে। বোনের অবস্থাও ভাল নয়। বুড়ো মারা গেছে। আগের পক্ষের বিবি আর তার ছেলে মেয়েরা জমি বাড়ি বুঝে নিয়েছে। বোনের দুটি শিশু। সাজিনা গফুর চাচার মাধ্যমে মাকে কুড়িটা টাকা পাঠিয়েছিল। দিয়েছে কিনা খোদাই বলতে পারে। বুড়োটাও যে বজ্জাত। আল্লাঃ। সাজিনা বেগমের পায়ের শিরা উপশিরায় টান ধরেছে বলে মনে হতো লাগল। একটু নড়ে চড়ে বসল।

'কি হল? পহেলা প্যারের কথা ভাবছিস নাকি?' সাজিনা বেগম মাথা তুলে তাকাল। সূর্য প্রায় মাথার উপর চলে এসেছে। 'ধ্যেৎতেরি অনেক বেলা হয়ে গেল।' সাজিনা বেগম মাথা তুলে তাকাল। সূর্য প্রায় মাথার উপর চলে এসেছে। 'ধ্যেৎতেরি অনেক বেলা হয়ে গেল।' সাজিনা বেগম ওঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়া একটু দাঁড়া আমিও যাব। ছোটা সাহাব এসে লাশ উঠিয়ে নিলেই হলো।'

'আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ওদিকে হাউসফুল হয়ে যাবে।'

হারামজাদি নিশ্চয় অন্যান্যদেরও কথাটা বলে দিয়েছে। সেই মহল্লার সব বুকিরই ফর্টিফোর ফুল হয়ে আছে। অবশ্যে সাজিনাকে এমনিতেও আসতে হতো। কারণ মুনসীরাম ছাড়া এখানে কোনো বুকিই পাঁচ টাকার নম্বর নেয় না। বাবুয়াকে দেখার পর তার একটু বেশি পয়সা দিয়ে খেলার ইচ্ছা হয়েছিল। 'বাবুয়া, বাবুয়া যা হয়েছে

সব বাবুয়ার জন্য।' সাজিনা নিজের মনেই বলে উঠল। সেদিন বিকেলে ফুলমতিয়ার মা তাকে বাবুয়ার কাছে না নিয়ে এলে তার ভাগ্যে কি যে হতো? কোথাও নোঙরা অসুখ হয়ে মরে পড়ে থাকত। তা না হলে গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে হতে হতো। ফুলমতিয়ার মা-ই বলেছিল, 'তোর মতো আউরৎকে মরদরা মাথার তুলে রাখবে। এই ইব্রাহিম আবার তোকে নিয়ে দালালি করতে এসেছে। চল, তোকে বাবুয়া সিঙের কাছে নিয়ে যাব। ফুলমতিয়ার কাছে আসত যখন তোকে দেখেছে। তারপর থেকে কেবলই তোর কথা বলতে থাকে। বলে, নিয়ে আসবি বিবি বানিয়ে রাখব। খরচের ভাবনা নেই। আমার ফুলমতিয়ার যদি সেরকম ভাগ্য হত।' আরও অনেক কিছু বলেছিল বুড়ি। সেদিনই সাজিনা জানতে পারল যে বুড়ি, যাকে সে এতদিন ফুলমতিয়ার মা বলে ভেবে এসেছে তার সঙ্গে ফুলমতিয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। এমনিতেই দেখা শোনা করে। মা বলে জানলে বিজনেস সুবিধে হয়। বাবুয়ার কথাও বলেছিল — 'এখন আর আগের মতো পয়সা নেই তবে দিল আছে।'

হ্যাঁ, দিলের জোর ছিল বটে বাবুয়ার। ইব্রাহিমটা দশ মিনিট ধরে যা মুখে আসে বাবুয়াকে গালিগালাজ করছিল। বাবুয়া চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। মহল্লার লোকরা তাজ্জব বনে গিয়েছিল, জিন্দেগিতে প্রথমবার বাবুয়া গালিগালাজ শুনছে। হঠাৎ বলল, ব্যস, এই কথাই বলতে চেয়েছিলি?' তারপর ইব্রাহিমের চুলের গোছাটা খাপ মেরে ধরে রাস্তা পর্যন্ত টেনে এনে ছেড়ে দিল — 'যা তোর সব কথা শুনলাম। আর এদিকটায় আসবি না।'

সাজিনা পরে বলেছিল, 'শালাকে মেরে লাশ করে দিলে ভাল হতো।' বাবুয়া কেবল হেসেছিল। 'তোর মতো মেয়েছেলেকে হারিয়ে রাগ তো হবেই। শালার কামাইয়ের রাস্তা আমি বন্ধ করে দিলাম।' এই বিরাটা মানুষটা একদিন মাথা ফেটে মরে পড়ে রইল।

'কি হলো? ওঠে দাঁড়ালি দেখছি। তারপর আবার ব্যাঙের মতো মুখ মেলে রেখেছিস কেন।

'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কি পহেলা প্যারের কথা নাকি? বস, বস।' দশরথ পুরনো ঠাট্টাকেই চালিয়ে গেল। সাজিনা বেগম নিজের আজান্তে বসে পড়ল। 'এর সঙ্গে। শালা একটা বজ্জাত হারামজাদা ছিল। আমার কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার নিয়ে মেরে দিয়েছে।' নুরুল ঠিকাদারের কুড়িটা টাকার শোক সাজিনা বেগমের আজ এত দিন পরে মনে পড়ে গেল। তবুও মরা মানুষটাকে গালি গালাজ করায় সাজিনার কিছুটা ভয়, কিছু খারাপ

লাগল। মরা মানুষটাকেও শুনিয়েই যেন জোর গলায় সাজিনা বেগম বলে উঠল — 'তবুও বেচারা এভাবে পথে ঘাটে মরে পড়ে থাকবে তা ভাবিনি। মরার সময় কোনো পরিচিত মানুষকে দেখতে পেল না। 'কেন তোকে পেয়েছে না? দশরথ বলেছিল। সাজিনা বোধহয় শুনতে পেল না। কারণ সে জিজ্ঞেস করল — 'এখন লাশটা নিয়ে কি করবে?'

'আমাদের ছোট দারোগা আসবে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারপর মুর্দাফরাস লাশকে ঠেলা গাড়িতে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। হাসপাতালে ডাক্তররা পেট কেটে দেখবে কিভাবে মারা গেছে। কেউ বিষ দিয়ে থাকলে বা খুন করে থাকলে কেস হবে। না হবে। না হলে ফেলে দেবে।'

'ফেলে দেবে?'

'জানি না। ফেলেও দিতে পারে, পুঁতেও রাখতে পারে। ব্রহ্মপুত্রে ভাসিয়ে দিতে পারে। আমি ঠিক জানি না।'

'তোদের হিন্দু মানুষকে তো পুড়ে ফেলে। তাই নাকি?'

'আরে বেওয়ারিশ লাশ কে পোড়াতে যাবে? জানিস কত খরচ লাগবে। খড়ি লাগে, ঘি লাগে, বামুন লাগে। সব বেওয়ারিশ পোড়াতে হলে সরকার দেউলিয়া হয়ে যাবে।'

'তার মানে শিয়াল কুকুরে খাবে?' ইতিমধ্যে দূর থেকে একটা গাড়িকে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে কয়েকজন মানুষ ঠেলে আনতে দেখতে পেল। এস. আই আর হাওয়ালদার সাহাব গাড়ির পেছন পেছন পায়ে হেঁটে আসছে। তারপর একজন কনেস্টেবল একটা সাইকেল ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বোধহয় এস. আইয়ের সাইকেল। দশরথ সাজিনা বেগমের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাজকীয় কার্যের আহ্বানে এস. আইর সামনে গিয়ে সালাম দিল। এস. আই নোটবইটা খুলে নিল।

ফেলে দিবে শুনে সাজিনা বেগমের অন্তরটা কেমন যেন খচখচ করছিল। শিয়াল কুকুরে খাবে জেনে আরও খারাপ লাগল। হাজার হউক, এক সঙ্গে ঘর করেছে। মতি লোকটা খারাপ ছিল না। কত ভালবাসত। সেইবার কোথা থেকে যেন টাকা জোগাড় করে শাড়িটা কিনে দিয়েছিল। কালোর উপরে গুনার কাজ করা। শাড়িটার কথা মনে পড়ায় সাজিনা বেগমের কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করল। সত্যি সত্যিই চোখের জল বেরিয়ে গেল। শাড়ির আঁচলটা সে চোখের উপর চেপে ধরল। হঠাৎ ঠিক করল মতির লাশটাকে সে রাস্তার কুকুরের মতো ফেলতে দেবে না। মতি হিন্দু, হিন্দুর মতোই মৃতদেহ দাহ করবে। আল্লা তাকে অনেক দিয়েছেন। আশার চেয়েও বেশি

দিয়েছেন। বাবুয়া মরার আগে বস্তির ঘর দুটি তার নামে লিখে দিয়ে গেছে। কোথা থেকে তার দুই বোন এসে হাজির হয়েছিল, তারপর দলিল দেখে গালি গালাজ করতে করতে চলে গেছে। কেউ জানে না, সে ডাকঘরেও তিন হাজার টাকা জমা করেছে। হিন্দু মতে মৃতদেহ দাহ করতে আর কত টাকা লাগবে, তিন শ। পাঁচ শ? যত টাকা লাগে লাগুক। এখন বস্তিতে খবর দিলে রামরতন, ধনদের পাওয়া যাবে। ওদেরকে খবর দিতে হবে। সাজিনা ওঠে দাঁড়াল।

মানুষগুলি লাশটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গাছের নিচে বিড়ি খেতে বসল। এস, আই আর হাবিলাদার সাহেব সদানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। খাওয়াটা বোধহয় খুব একটা ভাল হলো না, কারণ এস. আই সাহেব বাইরে বেরিয়ে এসেই বললেন — 'শালা কিছুই না জানার ভান করছে। সবাইকে নিয়ে ভরিয়ে রাখতে হবে।' বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দশরথকে জিজ্ঞেস করলেন 'কোথাকার মানুষ জানতে পারলি?'

'না আমাদের সাজিনা বেগম মানুষটাকে জানে। তার সঙ্গে ঘর করেছিল।'

'কোন সাজিনা বেগম?'

'সেই যে বাড়িওয়ালি।'

'ও। আমাদের মালকিন।' এস. আইআর অশ্লীল ইঙ্গিতের হাসি হাসল — 'ডাক ও কে।' সাজিনা বেগম এগিয়ে এলো।

'এই তুই এটাকে জানিস?' হাতের বেতের লাঠিটা দিয়ে গাড়িতে পড়ে থাকা লাশটা দেখিয়ে দিল।

'এটা মতি হুজুর।'

'মতি কি?'

'মতি ড্রাইভার।'

'ড্রাইভার যখন বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে। এখন থানায় চল।'

'থানায় হুজুর? সাজিনা বেগমের কণ্ঠস্বরটা কেঁপে ওঠল। থানায় যেতে হলে আর কিছু না হলেও সারাটা দিন নষ্ট। সেখানে আবার কি সমস্যা দেখা দেয়।

'হ্যাঁ, থানায়। তোর নাকি খসম হয়।' দারোগা সাহেব পুনরায় অশ্লীলভাবে হাসলেন। 'থানায় সনাক্ত করতে হবে। পকেটে থাকা টাকা পয়সার হিসেব হবে। না হলে পরে তো হাল্লা করবি যে দারোগা সাহেব সব খেয়ে ফেলেছে।' মতির পকেটে পয়সা থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে দারোগা সাহেবের রসিকতা শুনে সবাই হাসল।

'না হুজুর, আমাদের কি সে সাহস আছে?'

'এসব বাদ দে। থানায় চল। লাশ সনাক্ত করতে হবে। পরে ডাক্তারি পরীক্ষা হয়ে গেলে লাশ তোকে সমঝে দেওয়া হবে, নিয়ে যাবি।'

'হুজুর আমি গরিব স্ত্রী লোক। লাশ নিয়ে আমি কি করব? আমার নিজেরই খাবার নেই। কোনো রকমে ঘর ভাড়া দিয়ে দুটি পয়সা পাই।' পুলিশ পয়সা চাইতে এলে যেভাবে কাকুতি মিনতি করে থাকে অভ্যাসবশত সাজিনা সেটাই আউড়ে যেতে লাগল।

'তোর নাকি খসম লোকটি?'

'হুজুর, জানেনই তো আমার মক্কেল, আজ আছে তো কাল নেই।' রোদ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছিল। দারোগা সাহেবের ধৈর্যও কমে আসছিল। কনেস্টবলের কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে তাতে লাফিয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে বলে গেল, 'সে সমস্ত জানি না। থানায় গিয়ে লাশ সনাক্ত করবি। তারপরে লাশ যদি না লাগে হাসপাতালে বিক্রি করে দিবি।' লোকগুলি গাছের নিচ থেকে ওঠে গাড়িটা ঠেলতে শুরু করে দিল।

সাজিনা বেগমের মনে পড়ল, নিশ্চয় এই টাকার কথাই বাবুয়া রাতে তাকে স্বপ্নের মধ্যে বলেছিল। দশরথ মাঝে মধ্যে কিছুই জানে!

না বলেছিল যদিও, সাজিনা বেগম সারাটা পথ জিজ্ঞেস করতে করতে গেল, হাসপাতালে কত টাকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়, নাকি পরে গিয়ে আনতে হয়। ডাক্তারকে কি কিছু দিতে হবে? দুর্বল মানুষ আর শক্ত পোক্ত মানুষের লাশের জন্য একই মূল্য দেয় কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

নারী দিবস

অরুণ গোস্বামী

অসুবিধে তো হবেই। ভাতের হোটেলের সামনের ফুটপাথে যদি এরকম একটি ঘটনা ঘটে তাহাল কে আসবে হোটেলে? সকাল আটটার সময় হোটেল খুলতে এসে হোটেলের মালিক প্রথমে দেখতে পেয়েই নাক কোঁচকাল — তিনি দরজার বন্ধ তালাগুলিতে একটা নমস্কার করে চাবিগোছার নির্দিষ্ট চাবি দিয়ে খুলে ফেললেন। কিছুটা বিরক্ত হলেন। এমনিতেই এই সময়টায় চা-পুরি খেতে আসা লোকের বেশ ভিড় হয়। কিন্তু গতকাল বিশ্বকর্মা পুজো ছিল সমস্ত মহানগর জেগে থাকায় আজ পথে ঘাটে লোকজন বেশ কম। আজ বাসযাত্রীরও অভাব, কারণ বাসও খুব একটা চলছে না। তালাগুলি খুলে মালিক দরজারচৌকাঠে প্রণাম জানিয়ে ভেতরে ঢুকে ক্যাশবাক্স থেকে শুরু করে প্রতিটি আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। একটা সময়ে তিনি, সিপিএমের সমাগম হলে মার্কসবাদের ওপরে গরম গরম বক্তৃতা চলে। তিনিও তাতে অংশগ্রহণ করেন বলে সবাই তাকে সিপিএম বলেই মনে করে থাকেন। সেই কমিউনিস্ট রজত পুজারি তামার পাত্রে রাখা জলের মধ্যে ডুবানো আমপাতা দুটি সমস্ত আসবাব পত্রগুলির ওপর ছিটিয়ে গেলন যেভাবে পুরোহিত শান্তিজল ছেটায়। রাত সাড়ে দশটায় হোটেল বন্ধ করার সময় ছেলেগুলি টেবিল-চেয়ার ধুয়ে মুছে যায় বলে সকালের জন্য সেসব কাজ থাকে না। রজত পুজারি একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সমস্ত ঘরে ঘুরিয়ে নেয়। মুখে কী সব বিড়বিড় করে বলে, পরে ধূপকাঠিটা মিষ্টির আলমারির ওপর রেখে প্রণাম জানায়। তার পরেই তার ক্রোধ বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে কাজে নেমে পড়ার জন্য তৈরি-থাকা ছেলেগুলিকে বলে উঠলেন, 'এই দেখতে পাচ্ছিস না ওটাকে। তাড়া। ওটা এভাবে পড়ে থাকলে দোকানে কে আসবে?'

'জা-জলপান' নামে হোটেলটার সামনের ফুটপাথে মহিলাটি কোঁকাচ্ছে, আর মাঝে মধ্যে একটি বিকট চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির হাত-পা কুঁকড়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলি আগে থেকেই মহিলাটির দৃশ্য দেখার জন্য মনে মনে সুযোগ খুঁজছিল। তাই মালিকের

আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সামনে গিয়ে দেখত লাগল। — এই তোরা কি সিনেমা দেখছিস, না ওটাকে তাড়নোর বন্দোবস্ত করছিস? মালিক ভিতর থেকে চিৎকার করতে লাগল। তাতে সায় দিয়ে ছেলেগুলিও তখন চিৎকার করে উঠল, 'ঐ, যা যা ভাগ, ভাগ এখান থেকে, ভাগ। যা বলছি না — বলেই ছেলেগুলোর মধ্যে দুজন কাগজ পলিথিন দলা পাকিয়ে মহিলাটির দিকে ছুড়ে মারতে লাগল। মহিলাটির সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন হাতির গায়ে মশা বসেছে — কিছুই এসে যায় না কিন্তু মহিলাটি হাত-পা কুঁচকে খুব কাতড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে এক একবার যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে।

— এই এখনও উঠলি না। তাড়াতাড়ি কর।

— নাঃ, কোনো মতেই উঠছে না। এদিকে নয়টা তো বাজতে চলল। ওটা থাকলে গ্রাহক কী আসবে? ঐ ঐ সুরেন ...

— দাদা, মহিলাটির কাছ থেকে বয়টা জবাব দিল।

— এদিকে আয়। ওটার শরীরে একটু গরম জল ছিটিয়ে দে-গে যা।

— উস। পুড়ে যাবে না!

— তাহলে উঠিয়ে নিয়ে যা। তোর বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিচ্ছিস না কেন? মালিকের কথা শুনে সুরেনের মনটা যদিও ভাল লাগল না তার চেয়ে বড়ো বয় হেম বড়ো মজা পেল। মালিককে তোষামোদ করার জন্যই হোক বা পুরোনো রাগ মেটানোর জন্যই হোক তাড়াতাড়ি করে চুল্লির সামনে গিয়ে একটা মগে করে একটু গরম জল ভরিয়ে নিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণ গায়ে গরম জল ছিটিয়ে দিল। গরম জলটা শরীরে পড়তেই মহিলার শরীরটা আরো কিছুটা কুঁচকে গেল, আর চোখ দুটি ড্যাব ড্যাব করে মেলে বেশি করে কোঁকাতে লাগল। ইতিমধ্যে সাপ-খেলা দেখার জন্য ভিড়ি করা লোকের মতো মহিলাটির চারপাশে লোকজনের ভিড় বাড়তেই লাগল। একজন দুজন করে লোক জমা হতে-হতে বহু লোক হয়ে গেল। অকটু দূরেই থাকা রিক্সা স্ট্যান্ডটা থেকে রিক্সাওয়ালারা এসেও ভিড় করে দাঁড়াল। হোটেলের ভেতরে ক্যাশবাক্সের সামনে নির্দিষ্ট উঁচু জায়গাটিতে বসে থাকা মালিক উৎপল পুজারি বিরক্ত হয়ে উঠলেন কারণ এতটা সময়ে অন্যান্য দিন দুই-আড়াইশ টাকা যেখানে বিক্রি হয়ে যায় আজ সেখানে এখনও পর্যন্ত একশ টাকাও বিক্রি হয়নি। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে এই দৃশ্য দেখতে জমা হওয়া অর্ধেক লোকেরও যদি চা-সিঙ্গারা বা চা-জিলেপি খেত তাহলেও হাজার টাকার ওপর বিক্রি হতো। তার মহিলাটির ওপর রাগ হল। গরম জল ঠান্ডা জল ঢালা সত্ত্বেও ভ্রূক্ষেপ করছে না। একালের হলেও এস এফ আই

বা কমিউনিস্ট ছিলেন বলে এ ধরনের দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। সত্ত্বেও দাঁত মুখ খিঁচে ভেতরে ভেতরে রাগে গরগর করতে করতে পৌরনিগমকে গালাগালি দিয়ে সমালোচনা করতে লাগলেন। দশটা বাজার পরেই মহিলাটির চিৎকার বেড়ে চলল। ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় মাথার ওপরে। মহিলাটি হাত-পা কুঁচকে যন্ত্রণায় চিৎকার করে চলেছে। দেখা গেল আশপাশের উঁচু উঁচু বিল্ডিঙের ব্যালকনি থেকে মহিলা এবং যুবতিরা নিচের ফুটপাতের এই দৃশ্যটি একান্ত মনে উপভোগ করছেন। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো শিশুরা অন্যান্য বড়োদের মতো এত আগ্রহভরে কী দেখছে তা দেখার জন্য গলা বাড়িয়ে কৌতূহলভাবে দেখতে যেতেই মা-দিদিরা তাদের টেনে টুনে জোর করে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে আবার নিজেরাই ব্যালকনিতে ফিরে এসে হাফ-ওয়ালে ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে। টাইট জিন্সের লংপ্যান্ট পরা মেয়েরা সেই ফুটপাতের সামনে দিয়ে মহিলাটিকে দেখতে-দেখতে কানে মোবাইল ফোন লাগিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যেই একজন বেশ সমাজ সচেতন আর রসিক ছিল। হঠাৎ মেয়েটি মহিলাটিকে ওভাবে হাত-পা কুঁচকে চিৎকার করতে দেখে 'জা-জলপান' হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে কোনো একজনের নম্বরটা ডায়াল করল। মেয়েটি ফোনটা কানে লাগিয়ে চোখ দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে কারো কাছে বর্ণনা করছে — *মাই গুডনেস স্ট্রেঞ্জ, ইউ ক্যান নট ইমাজিন হোয়াট আই অ্যাম সিউং ইউ লি। মহিলাটি ফুটপাতে শুয়ে শুয়ে হাত-পা কুঁচকে কুঁচকে কোঁকাচ্ছে আর চিৎকার করছে। প্রোবাবলি সি উইল গিভ বার্থ অ্যা বেবি — হাউ স্ট্রেঞ্জ ক্যান ইউ ইমাজিন! বিফোর দিস মেনি পিপল গেদারড় মহিলাটি একটি শিশুর জন্ম দেবে — মাই গুডনেস। ইউ ক্যান অলসো এনজয় ইট ইফ ইউ কাম নাউ...। নো নো আই ক্যান্ নট্ মিট্ ইউ টু-ডে। কিস বাই।* মেয়েটি ফোনটা হাতে মহিলাটির দিকে তাকাল, আর ধীরে ধীরে সরে গিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে থুথু ফেলল। সম্ভবত দৃশ্যটিতে মেয়েটির ঘৃণা জন্মেছিল।

যে মহিলাটি ফুটপাথের ওপরে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে চিৎকার করছে আর মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে, যার ওপরে ঠান্ডা-গরম জল ফেলেও তাড়ানো যায়নি, যে দৃশ্যের চারপাশ ঘিরে স্থানীয় দোকানি, পথযাত্রী, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা দেখছে, অদুরে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশটাও গাড়ি-ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করার ফাঁকে মাঝেমধ্যেই এদিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে, পাশের দোতলা-তেতলা বাড়ির ব্যালকনি থেকে মহিলারাও তাকিয়ে রয়েছে যার দিকে সেই ভিখারি মহিলাটি এই অঞ্চলে মোটেই অপরিচিত নয়। প্রথমে তাকে সবাই পাগলি বলেই ভেবিছিল যদিও সে কিন্তু

পাগলি ছিল না — ছিল ভিখারিনি। পাগলি বলে মনে করটা একেবারে অযৌক্তিক ছিল না — কারণ মহিলাটির গায়ে অনেক সময়ে কাটা-ছেঁড়া বা বিবর্ণ হলেও দামি শাড়ি দেখা যেত। হয়তো-বা কেউ ফেলেদেওয়া বা আশেপাশের কোনো দয়ালু মহিলার দেওয়াও হতে পারে। বা সেই দয়ালু মহিলাটিই হয়তো ব্যালকনি থেকে এখন নিচের এই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখছে। ভিখারিনি বলে চেহারা দেখে কেউ সঠিক বয়সটা আন্দাজ করতে পারছিল না। চুলগুলি লাল হয়ে গেছে আর শুকনো। চুলের গোড়াতে একটা রবার দিয়ে বাঁধা থাকে। শরীরে একটা ব্লাউজ থাকে আর কখনও একটা ব্রাও পরা থাকে। এই যে ব্রা পরা থাকে বা কখনও যে মহিলাটির পায়ে এক জোড়া পুরোনো স্যান্ডেলও পরা থাকে — সে সমস্ত দেখে শুনেই আশেপাশের দোকানিরা তাকে একটা সময়ে পাগলি বলে ভেবেছিল। শুকনো শরীর বলে বুড়ি না যুবতি তার অনুমানও আজ থেকে মাস দুয়েক আগে কেউ করতে পারেনি। কারণ যুবতি হতে হলে শরীরে যে সম্পদের প্রয়োজন হয়, যা দেখে মানুষ যুবতি বলে আখ্যা দেয় তা কিন্তু মহিলাটির ছিল না। মহিলাটির শরীর শুকনো হাতের মতো দুটো স্তন— ইত্যাদি মহিলাটিকে যুবতি বা কম বয়সি বলে মনে করার কোনো সুযোগ রাখেনি। কোনো সহায় সম্বল না-থাকা ভিখারিনি। দিনের মধ্যে যা কিছু পয়সা পায় তাই দিয়ে দুপুর বেলা ফুটপাথের পাশে চা-ভাতের রেস্তোরাঁয় এক থাল ভাত নিয়ে খেয় নেয়। বিকলে যে কোনো হোটেলের সামনে হাতে একটা গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে হোটেলের কোনো বয় হয়তো গ্লাসটাতে একটু চা ঢেল দেয়। সঙ্গে হয়তো এক টুকরো বাসি সিঙ্গারা বা খুরমা দেয়। সেটাই ভিখারিনি গাছের ছায়ায় বা বারান্দায় বসে বড়ো তৃপ্তি করে খায়। খাবার সময় এমন একটা ভাব করে যে দেখে মনে হয় বড়ো রেস্তরাঁয় বা হোটেলে মেনু কার্ড দেখে অর্ডার দিয়ে খাবার আনিয়ে খাচ্ছে। বিকেলের রোজগারের পয়সা দিয়ে ভিখারিনিটি সন্ধে বেলায় রুটি বা একথালা ভাত খেয়ে পরিবহন নিগমের বারান্দায় পড়ে থাকে। তাই হাতে নাতে কোনো প্রমাণ না পেলে চট করে ভিখারিনিটি যুবতি না বুড়ি তা বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু আজ থেকে দুই মাস আগে এই অঞ্চলের দোকানি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালারা বুঝতে পারল যে এই ভিখারিনিটি বুড়ি নয়, উর্বরা। অর্থাৎ যুবতি। সৃষ্টিক্ষম। মহিলাটির উঁচু হয়ে আসা পেটটাই তার প্রমাণ। ভালভাবে লক্ষ না করলেও চোখে পড়ে মহিলাটির পেটটা। কারণ শুকনো শরীরে মহিলাটির পেটটাই উঁচু হয়ে উঠেছে। একজন সুস্থ সবল মানুষেরে পেটটা বড়ো হতে থাকলেও তা চট করে মানুষের চোখে পড়ে না কারণ পেট পর্যন্ত যাবার আগে মানুষের চোখ, গলা, ঘাড়,

বুক সব অতিক্রম করে যাবে। এখন মহিলাটি শরীরে যেহেতু আর কোনো আকর্ষণীয় উপাদান নেই লোকের দৃষ্টি সোজাসুজি একেবারে মহিলাটির উঁচু হয়ে আসা পেটের ওপর পড়ে, আর তাতেই প্রামাণিত হয়ে যায় যে মহিলাটি উর্বরা। উঁচু হয়ে আসা মহিলার পেটের দিকে প্রথমেই লোকের দৃষ্টি যাবার আরো একটা প্রধান কারণ হল যে মহিলাটির কোমরে পেটিকোট জাতীয় কোনো ধরনের কাপড় প্রায়ই থাকে না। শাড়িটাকেই পেঁচিয়ে মেখলা এবং পেটিকোটের কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেদিন থেকে দোকানি আর পড়শিরা তার উর্বরাশক্তির প্রমাণ পেয়েছে সেদিন থেকেই তার আরো একটা অসুবিধা সৃষ্টি হল এই যে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রসিকতা করে খ্যাপানোর জন্য, এমনকী জুতোর মিস্ত্রি পর্যন্ত বলে — 'কি রে বিয়ে করলি আর আমাদের নিমন্ত্রণ করলি না।' যেখানেই ভিক্ষে করতে যায় সেখানেই এই উঁচু পেটের জন্য রসিকতা করে। পেটটা উঁচু হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির বুকেও যেন রস জমা হতে শুরু হতে লাগল — পুরুষ মানুষের চোখকে এটাও এড়াতে পারল না।

কোনোদিনই যেসব কথা কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি আজ কিছুদিন ধরে তাকে সেসবও শুনতে হচ্ছে। আগে দোকান বদলে, ঘর বদলে বদলে ভিক্ষে করতে যেত, আধুলিটা-টাকাটা কেউ কেউ ছুঁড়ে দিত, পরিবহন নিগমের বাস-আড্ডাতেই বেশিরভাগ সময় যাত্রীদের মুখের সামনে হাত পেতে কাটাত — কেউ কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করত না। বাসের জন্য অপেক্ষা করা বাস থেকে নামা যাত্রীরা পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা পয়সা বের করে ভিখারিনিকে দেওয়ার মতো সময় নেই। কেবল বেশিরভাগের মুখেই 'নাই নাই যা, খুচরো পয়সা নেই' বলে ঠোঁটের আগায় ঝুলতে থাকা কয়েকটা শব্দ ভিখারির কানে ছুড়ে দিত। সেক্ষেত্রে ভিখারিনির ঘর কোথায়, ঘরে কে আছে, স্বামীর কীভাবে মৃত্যু হয়েছে — এ জাতীয় কথাগুলি আর কে জিজ্ঞেস করে? সময় কোথায়? কিন্তু এখন বাস-আড্ডায় অপেক্ষারত যাত্রীরা তার পেটটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অপরিচিত হলেও পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রীর সঙ্গে মন্তব্য করে — 'দেখুন খাবার নেই, কাপড় নেই, অথচ পেটটার দিকে দেখুন! অসুখ নাকি প্রেগন্যান্ট?...' আর এখন থেকেই দোকানি, রিক্সাওয়ালারা, হোটেলের বয়রাও মজা করতে শুরু করল, তার ঘর কোথায় জিজ্ঞেস করতে লাগল। মহিলাটির কথা জানার পর মুখে গোটা ব্যাপারটা প্রচারিত হবার পরে সেখানকার লোকদের মনে তিন ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হল। প্রথমটা হল বন্যায় তাড়িত মানুষ। কোনো এক আশ্রয় শিবিরে ছিল। সেখানে ছেলে দুটি গ্রহণী রোগে মারা গেল। দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে একদিন

স্বামী-স্ত্রী সোনবালি থেকে দিন হাজিরা করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য গুয়াহাটি এসে উপস্থিত হল। কিছুদিনের মধ্যে লোকটি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল পড়েছিল। ডাক্তার ঘরে নিয়ে যেতে বলেছিল। নেবে কীভাবে। ইতিমধ্যে মহিলাটি পুরোনো গ্রামে গিয়ে জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে সমস্ত কিছুই জানাল। সবারই একই অবস্থা। অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করল। কেউ কেউ দুই চার টাকা দিয়ে সাহায্য করল। তবে কেউ সঙ্গে এল না। কী আর করে। লেকটি রোগীর বিছনায় পড়ে থাকে। আর স্ত্রী বারান্দায় পড়ে থাকে। একদিন লোকটি মারা গেল। সেই যে বারান্দায় পড়ে পড়ে কাটাতে হল তাতেই শুকিয়ে বত্রিশ বছরের মহিলাটি বাষট্টি বছরের ভিখারিনিতে পরিণত হল। একটাই সুবিধা হল তাতে চেহারাটা ভিক্ষে করার উপযুক্ত হয়ে গেল। এই ব্যাপারটা জানার পর পল্টন বাজারের পরিবহন নিগমের সামনের ছোটো ছোটো দোকানি, রিক্সাওয়ালার মনে প্রথম অনুভূতি — দুঃখ-সহানুভূতি হল। দ্বিতীয় অনুভূতি রগড় করার। এই রোগা চেহরার মহিলাটি ভেতরে ভেতরে কম নয়, রাতের গভীরে নিশ্চয় প্রেম করে বেড়ায়। তাহলে সন্তান উৎপাদন করার মতো দেহের যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকই ছিল। কিন্তু কে কার সঙ্গে প্রেম করল? তার সঙ্গে মৌজ করার জন্য আবার কাউকে টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে নাকি? সেজন্যই তাহলে মহিলাটির গায়ে মাঝে মধ্যে নতুন ব্লাউজ, শাড়ি দেখা যায়? কখনও কখনও আবার ব্রা-ও দেখা যায়। পরিবহন নিগমের বাস-আড্ডার ওয়েটিং রুমটা খোলা থাকলে মহিলাটি ভেতরে শুয়ে থাকে, আর না হলে বাইরের বারান্দায় এক কোণে পড়ে থাকে। কোথায় কীভাবে কার সঙ্গে প্রেম করল। এই কথাটা আগের জাগা দুঃখবোধের সঙ্গে রগড় অথবা তামাশার মিশ্রণ ঘটাল। কারণ তার পেটের বাচ্চাটার বাপ কে? সেকথা রিক্সাওয়ালা-ঠেলাওয়ালারা ঘনঘন জিজ্ঞেস করতে লাগল। সেই সম্পর্কে মহিলাটি কোনো জবাব না দিলেও তারা বারবার একই প্রশ্ন করতে থেকেছিল। এই প্রশ্নগুলি মহিলাটিকে একটি সুবিধা করেও দিল। মহিলাটি তার আস্তানার বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিল যাতে তাকে একই প্রশ্ন বারবার শুনতে না হয়। মানুষের তৃতীয় অনুভূতিটা হল সন্দেহের। কে জানে হয়তো বা মহিলাটির পেটে টিউমারই হয়েছে। অনেক আবার এটাও সন্দেহ করল যে মহিলাটি হয়তো বা দেহ ব্যবসায়ী। তবে এই সন্দেহটা মহিলাটির দেহের দিকে তাকালেই কর্পূরের মতোই উবে যায়। এই দেহ নিয়ে ব্যবসা করার মতো কোনো মূলধনই নেই তার শরীরে। মহিলাটিকে সব সময় দেখতে পেত যারা তাদের মনে এই তিনটি অনুভূতিই কাজ করে যাচ্ছিল।

এখন সেই মহিলাটিই পল্টন বাজারের 'জা-জলপান' রেস্তরাঁর সামনের ফুটপাথে

প্রসব যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়ে ছটপট করছে, চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রয়েছে আর তার চারপাশে অসংখ্য লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রেস্তারার মালিক মহিলাটির গায়ে জল ঢেলেও তাড়াতে পারল না। কীভাবে উঠে যাবে! চারপাশের দালানগুলির ব্যলকনি থেকে এমনকী পরিবহন নিগমের আস্তানার ছাদের ওপর থেকেও মহিলারা নিচের এই দৃশ্য তাকিয়ে দেখছে। সেই প্রসব যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকা মহিলাটির সম্পর্কে এখনও নানাজনে নানা মন্তব্য করেই যাচ্ছে। কেউ বলছে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। কেউ আবার বলছে — 'না পুলিশের দরকার নেই, পৌরনিগমের জমাদারকে খবর দিলেই হবে।' কেউ আবার সে সমস্ত কথা থেকে সবে এসে মহিলাটির পেটে বাচ্ছাটা কীভাবে হল, সেই বাচ্চার বাপ কে, কোথায় এই অপকর্মটা করেছে ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক ব্যাপারগুলি আলোচনা করতে লাগল। সেই যে 'জা-জলপান' রেস্তোরাঁর বয় হেম যে কোঁকাতে থাকা মহিলাটির গায়ে জল ঢালায় খুব উৎসাহ দেখিয়েছিল, আসলে তার মহিলাটির ওপর রাগ ছিল, আর ঈশ্বর সেই রাগেরে শোধ নেবার জন্য একটা সুযোগ করে দেওয়ায় সে বড়ো উৎসাহের সঙ্গে কমিউনিস্ট মালিকের আদেশে মহিলাটির শরীরে গরম জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। তার রাগের যে একটা যুক্তি রয়েছে আজ দুমাস আগেই সে প্রথম উপলব্ধি করেছে। দশজনের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললেও তার রাগের যৌক্তিকতাটা স্বীকার করতেই হবে। রাত সাড়ে দশটার সময় হেম একদিন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গুমটি ঘরে গরম পকোড়ার সঙ্গে একগ্লাস চোলাই খেল। মাঝে মাঝেই খায়, আজ কয়েকবছর ধরে এটা তার রুটিনে পরিণত হয়েছে। সেদিন আবার দু গ্লাস খেয়ে ফিরে যাবার সময় তে-রাস্তার মাথায় গাছের গায়ে লাগান ইংরেজি সিনেমার পোস্টারাটাতে চোখ পড়ল। উন্মুক্ত বক্ষের প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ যুবতিটির বুকের মধ্যে একটা পুরুষ মুখ গুঁজে বাঁ-হাত দিয়ে যুবতির কোমর জড়িয়ে রেখছে। দৃশ্যটা দেখে হেমের সারা শরীরে একটা শিহরণ জেগে উঠেছিল। অপূর্ব পুলকে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরসির করে উঠেছিল। তার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে হেম প্রায় শূন্য হয়ে পড়া চারপাশে তাকিয়ে দেখতে থাকল, আর তারপরেই সে টলমল প্রায়ে বাস-আড্ডার ভেতরে প্রবেশ করল। দেখতে পেল পুব দিকের যাত্রী বিশ্রামাগারে কোণে একজন মহিলা গুটিশুটি হয়ে রয়েছে। ঘরটিতে কেউ নেই, এমনকী আলোও নেভানো, কেবল বাইরের আলোর রেশ এসে ঘরটিকে কিছুটা আলোকিত করে তুলেছে। সে এগিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকা মনুষটির কাছে বসল, আর তখনই বুঝতে পারল শুয়ে-থাকা মহিলাটি প্রতিদিন ফুটপাথে দেখতে পাওয়া সেই ভিখারিনি। তার কামনা তীব্রতর

হল। কোনোরকমে সোহাগ বা কলাকৌশল ছাড়াই শুয়ে-থাকা ভিখারিনিটিকে সে জড়িয়ে ধরল। জেগে উঠেই মহিলাটি তাকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগল। সে ততই আরো জোর করে জড়িয়ে ধরতে লাগল। সে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কী সব দেবার কথাও বলল যদিও সেসব মহিলাটির কাণে ঢুকছিল না। মহিলাটি তাকে গায়ের জোরে ঠেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত লাথি মেরে কোনোভাবে শোওয়া-থেকে দৌড়ে বাইরে গিয়ে ঘুমিয়ে-থাকা চৌকিদারটার কাছে বসে ফোঁপাতে লাগল। হেম পেছন পেছন গালিগালাজ আর তর্জনদর্জন করতে করতে দৌড়ে এল। চৌকিদারটা জেগে উঠে সমস্ত কিছু বুঝতে পেরে হেমকে তাড়া করতে গিয়েছে। হেমও ভিখারিনিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলত লাগল — 'দেখে নেব শালা রেণ্ডি, সতীপনা দেখাতে এসেছিস, যদি তুই কাল হোটেলে বাসি সিঙ্গারা বা চা-বিস্কুট চাইতে আসিস — শালি তোর মাথায় তখন গরম জল ঢেলে দেব — থুঃ, তোর শরীরে আছে কী? এত ফুটানি যেন একেবারে সেরা সুন্দরী — শালা দেখলেই ঘেন্না করে — থুঃ থুঃ করতে করতে হেম বেরিয়ে গেল। তাই এই ঘটনাটা যদি কেউ হেমের কাছ থেকে শোনে তবে তাকে নিরপেক্ষ বিচার করলে হেমর পক্ষে রায় দিতেই হবে। হয়তো...। মহিলাটি যে স্ব-ইচ্ছায় তার কাছে দেহ নিবেদন করতে যাওয়া হেমকে দূর দূর করে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়ে বড়ো সতীপনা দেখাল তাহলে আজ তার এই দশা হল কেন? সে তো আর কোনো পুষরুকে বিয়ে করে সংসার পাতেনি যে স্বাভাবিক কারণে সে গর্ভবতী হয়ে সন্তানের জন্মদান করবে। নিশ্চয় কোনো এক হেমের দ্বারাই সে গর্ভবতী হয়েছে। অবশ্য মুখ দিয়ে কেবল আর্ত চিৎকার নির্গত হওয়া, ফুটপাথে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা এই মহিলাটিকে এখন জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবে না যে সে এভাবে শুয়ে-থাকা অবস্থায় একদিন দুটো মানুষ গিয়ে তাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে একজন হাত চেপে ধরে রেখেছিল আর অপরজন তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেছিল। পরে একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয়জনও তার সঙ্গে যৌনসংসর্গ করে। অনেকদিন জায়গা বদলেও সে সেই দানব দুটির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। কখনও-বা ঐ দুজনের নতুন সঙ্গীও যেত এ কথা আজ সে কীভাবে বোঝাবে? দ্বিতীয়ত, রাতের অন্ধকারে শুকনো ভিখারিনিকে মদের নেশায় সিনেমার তারকা 'বনে যাওয়া' ধর্ষণকারী বলে হওয়া নায়করা তো আর এই ভিড়ে উপস্থিত নেই। থাকলেও 'আমিই গর্ভস্থ সন্তানের পিতা' বলে মানুষটিকে প্রসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দানের জন্য মেডিকেল কলেজের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ভর্তি করে দেবে না। তা ছাড়া মহিলাটিও তো সেই অন্ধকারের কামনার নায়কদের নাম-ঠিকানা জানেন না যে জমায়েত হওয়া লোকদের

প্রশ্নের জবাবে রাতের আঁধারে তার সঙ্গে গর্হিত কাজ করা লোকদের নামগুলি যথাক্রমে চিৎকার করে বলে যাবেন।

তাই দৃশ্যটা চেয়ে থাকা লোকগুলি নিজেদের ভেতরে অনেক সম্ভাব্য কথা কল্পনা করে আলোচনা করার বাইরে আর কোনো উপায় নেই। ইতিমধ্যে লোকজনের সংখ্যা আরো বেড়েছে। গাড়িগুলি পোঁ-পোঁ শব্দ করে হর্ন বাজিয়ে শামুকের গতিতে এগোতে লাগল। ভাগ্য ভাল যে স্কুল বন্ধ আজ, তা না হলে স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদেরও এই দৃশ্য দেখতে হতো। অবশ্য হাতে বা পকেটে মোবাইল ফোনের সেট নিয়ে ঘোরা প্যান্ট-শার্ট পরা অনেক যুবতি মেয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠিকই উপভোগ করছে। চিৎকারের সময় কোঁকানিতে হাত-পা ছোড়ার সময়, গায়ের কাপড় পুরোপুরি ফুলে গিয়ে ভিখারিনিটি উলঙ্গ হয়ে পড়ল। দেখা গেল গর্ভস্থ সন্তানের প্রায় অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। কয়েকজন — নিশ্চয় তারা সচেতন সংবেদনশীল নাগরিক হবেন — পকেট থেকে ফোন বের করে পল্টন বাজারের আরক্ষী থানায় উপর্যুপরি ফোন করতে লাগলেন। পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে জানালেন। সম্ভবত পুলিশ থানা থেকে লোকগুলি কোনোরকম সন্তোষজনক উত্তর পায়নি, কারণ তাঁরা সুইচ্ অফ্ করে পুলিশের চোদ্দপুরুষ তুলে গালিগালাজ করতে লাগলেন। ঠিক তখনই ভিখারিনিটি অত্যন্ত কাতরভাবে 'জল জল' বলে চিৎকার করে উঠল। নাঃ, যারা এত মজার দৃশ্যটা উপভোগ করছে তাদের মধ্যে এই কাতর আর্তনাদের কোনো প্রভাব পড়ল না। কেউ কেউ আবার বলে উঠল, 'চিৎকার করে বললেই তাকে এখন কে জল দিতে যাবে?' কিন্তু 'জল জল' বলে চিৎকার করেই চলেছে। তখন সকলেরই হঠাৎ খেয়াল হল যে মহিলাটি একটি সন্তান প্রসব করেছে, সম্ভবত সন্তানটি মৃত কারণ নবজাতকের কান্না শোনা যায়নি। মহিলাটিকে কেউ জল দেয়নি। কেউ কেউ — নিশ্চয় তারা দয়ালু হবেন মহিলাটির দিকে এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট ছুড়ে দিলেন। ভিখারিনির কিন্তু সেসব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কেবল 'জল জল' বলে চিৎকার করে চলেছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের একজন ছিমছাম পোশাক পরা লোক এগিয়ে গেলেন। তিনি পাশের দোকান থেকে একটা এক লিটারের মিনারেল ওয়াটারের মুখে ধীরে ধীরে জল ঢেলে দিতে লাগলেন। হঠাৎ মহিলাটি থাবা মেরে বোতলটা টেনে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে বোতলটা খালি হয়ে গেল।

এল। পুলিশ এল। লাঠিটা নাড়তে নাড়তে পুলিশ কয়েকজন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে ভিখারিনির কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মহিলা পুলিশ দুজন ভিখারিনির দুটো হাত ধরতেই পুরুষ পুলিশ ভিখারিনির আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টাকা-পয়সাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। জমাদার মৃত সন্তানটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নাড়িটা কেটে নিয়ে শিশুটিকে একটা ভাঙা হাড়িতে ভরে নিলেন। মহিলা পুলিশ দুজন ভিখারিনির দুটো হাত ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই সুন্দর চেহারার দামি শাড়ি পরা, ঠোঁটে গোলাপি রঙ মাখা প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সি একটি মহিলা পুলিশ দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে কমান্ডিং সুরে বলে উঠলেন, 'একটু অপেক্ষা করবেন।'

— কেন? আপোনার ঘর কোথায়?

— ঐ যে, বলে মহিলাটি সমানের দোতালা বাড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

— আপনি কি করেন? আপনি এই ভিখারিনিটাকে জানেন নাকি?

— এই ভিখারিনিকে কে না জানে এখানে? আমরা তো এক ঘণ্টা থেকেই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখছি।

— কেন অপেক্ষা করতে বলছেন?

— একটা ফটো তুলব। আমি মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

— ফটো তুলবেন? কেন?

— আমরা আগামী ৮ মার্চ বেশ বড়ো করে কেন্দ্রীয়ভাবে নারী দিবস পালন করার আয়োজন করেছি।

— তাতে কি হল?

— মহিলাটির ফটো একটা তুলে রাখলে এনলার্জ করে নারী দিবসের প্রদর্শনীতে রাখা যাবে।

বেশ অ্যাট্রাকটিভ হবে বলে মহিলাটি হাতের ক্যামেরাটিতে ক্লিক ক্লিক করে কয়েকটি স্ন্যাপ নিলেন। ইতিমধ্যে মহিলা পুলিশ দুজন প্রায় অচেতন হয়ে থাকা সদ্য প্রসবা ভিখারিনিকে ফুটপাথ দিয়ে হাতে ধরে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ভাঙাচোরা অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে নিয়ে গেলেন।

মহিলাটি নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তা না হলে ছেঁচড়ে যাবার সময় নিশ্চয় চিৎকার করে উঠত। সম্ভবত সেই পুরুষটির দেওয়া বোতলের জলটা খেয়ে মহিলাটি গভীর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মহিলা সমিতির সভানেত্রীও প্রসন্ন চিত্তে চলে গেলেন। নারী দিবসের প্রদর্শনীটাতে নিশ্চয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সভানেত্রীর ক্যামেরায় আলোক চিত্রটাই সম্ভবত প্রথম পুরস্কার পাবে। তাহলে ব্যালকনি থেকে এক ঘণ্টা ধরে হাতে ক্যামেরা নিয়ে তিনি এই দুলর্ভ মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন!

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

নির্লজ্জ এক অবুজ কোলাজ

হরেন্দ্র কুমার ভূঞা

লজ্জা লেগে গেল। বুদ্ধ বরার। কার্যালয়ের অধ্যক্ষ তিনি। নির্লজ্জ ভঙ্গিতে বুদ্ধ বরা প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর ফাইল। পরিচালনা সঞ্চালক সৌমারজিৎ শর্মার সম্মুখে তিনি এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা লজ্জায় লাল। প্রতিক্রিয়ার প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বে চাকুরিজীবনের আদ্যোপান্ত। হঠাৎই একদিনের লাজ লাজ ভাবের আত্মপ্রকাশ। কুণ্ঠিত, কম্পিত তিনি। সৌমারজিৎ শর্মা ব্যক্তিগত সচিব সুদর্শনা সুকন্যা চৌহানের দিকে তাকালেন। সুকন্যার সুবাসিত কেশদামে সেঁটে রয়েছে গতরাতের বিন্যস্ত প্রহর। সুগভীর নয়ন। সুরক্ষিতা। সুদেহী আমন্ত্রণ। আবেদনময়ী। এসব কথা একটু বিস্তারিত করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই গল্পের নায়ক সৌমারজিৎ শর্মা চাউনিতে বুঝিয়ে দিলে সুকন্যা উঠে গেলেন। গা টা পাকিয়ে উঠল। সুঠাম দেহবল্লরিতে একটা কম্পন। কাঁপটা সৌমারজিৎ শর্মার হৃদপিণ্ড বরাবর পৌঁছে গেল। অবাক হয়ে তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন সুকন্যার শ্রোণিদেশে। দৃশ্যটা নয়নাভিরাম। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি ফেরালেন। সম্মুখে বুদ্ধ বরার লজ্জারাঙা মুখ।

এদের অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় একটু কান দিলেই বোঝা যায় কী আবেগে লজ্জাভ হয়ে উঠেছে বুদ্ধ বরার মুখখানি। শ্রীবদন তাঁর গোলাকার। পাকা সন্তরা ফলের মতো। চোখ দুটি আপনার আর্টস্কুলে ভরতি করানো ছোট্ট মেয়ের আঁকা আপনার ছবির। নাকটা? থাক নাকেই। ধরে কী লাভ! সংলাপে আসা যাক। ফ্যান চলছেই। শীততাপ নিয়ন্ত্রণও। রাস্তায় যানবাহন। রৌদ্রঝিলমিল দুপুর। সূর্যমুখী। এই সঞ্চালয়ের খুব কাছেই এখনও বেদখলমুক্ত পানার পুকুর। দুর্গন্ধময়।

— বলুন।

— স্যর, ফাইলটা স্যর।

— কীসের?

— কনসট্রাকসন অব এ তাজমহল ইন আসাম। স্যর, অসমে তাজমহল নির্মাণের ফাইলটা দেখুন।

সৌমারজিৎ— হুঃ

বুদ্ধ — না, মানে স্যর, আই মিন, মানে স্যর —

সৌমার— তাজমহল একটা বানাতে চাইছি। সে কথাই বলতে চাইছেন তো? বলতে চাইছেন তাজমহলটা কী। বিদেশি পর্যটকের জন্য। ফর ফরিন ট্যুরিস্ট, বুঝছেন?

বুদ্ধ — হাঁ। না, স্যর —

সৌমার — আমি ইঞ্জিনিয়ার। পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। অসমের পর্যটন বিকাশ দরকার। অসমের গড়ঁকয়টাই পর্যটন। আর আছে কী? আছে কিছু?

বুদ্ধ — কেন, বিহুনাচ?

সৌমার — আর?

বুদ্ধ — কামরূপী লোকগীত।

সৌমার — আর —

বুদ্ধ — স্যর, তাজমহলটা স্যর প্রেম-টেমের বিষয়। সরকারি কথায় প্রেম-টেম খুউব খারাপ জিনিস।

সৌমার — বিয়ে বর্হির্ভূত?

বুদ্ধ — (নির্বাক) — (স্বগত) ছিঃ এসব কী রকম কথা। আমাদের স্নেহময়ী জানতে পারলে কী হবে? তিনি নিজে সেসব করবেন আর আমাকে এই বুড়ো মানুষটাকে — (প্রকাশ্যে) বিয়েটা তো স্বর্গীয় বস্তু। জীবনানন্দ। এখানে নন্দন-তাত্ত্বিক কিছু নেই।

সৌমার— তাজমহল হবে। হতেই হবে। ব্যস। প্লান এসটিমেট ঠিক করে দিন। মানে প্রাক্কলন।

বুদ্ধ — স্যর, সরকার পরিকল্পনা উন্নয়নের অনুমতি, বিত্তীয় সম্পত্তি? মানে কনকারেন্স?

সৌমার — দায়দায়িত্ব আমার। কাজে লাগুন।

বুদ্ধ — স্যর —

সৌমার — এখন লাজকাজ গেল তো?

বুদ্ধ — গেল বটে। ইস, স্যর যে। (স্বগত) যায়নি। এখনও না। এটা কর্মসংস্কৃতি বর্ষ না হলে ফাইলটাই হারিয়ে ফেলতাম। নতুবা ছুটি নিতাম। নইলে — নইলে ... (প্রস্থান)।

এরকম দুপুরে কেউ বীণায় হাত দেয়। নিকটবর্তীরা কাছে না-থাকলে দূরবর্তীদের মনে পড়ে। মনে-মনে খোঁজে। সান্নিধ্য। বীণবিরাগির বীণায় এই দুপুরটি গভীর। যদি কাজলা নদীর পারে বসে শুনতে পারতাম তোমার চিৎকার। মরা-নদীর পারের সুকন্যা

সুন্দরী। নির্ভর প্রাণে নড়ে উঠল শ্যামাঙ্গীর মেখলার খস খস শব্দ। সৌমারজিৎ শর্মা নিলাজ নিলাজ একটা আশা নিয়ে পথ চেয়ে রইলেন। কার জন্য, বলাই বাহুল্য। তাজমহলের ফাইলটাতে মগ্ন বুদ্ধ বরা। তিনি পূর্বের এক পত্রে কাউকে তাজমহলের কথা লিখেছিলেন। মমতাজ বেগমকে বুঝি? লজ্জা হচ্ছে। এটাও একটা স্কিম হল? তাজমহল বানাবেন। ফলাবেন। রিজেক্ট হবে। প্ল্যানিং ডিপার্টমেণ্ট তাঁকে তাজমহল বানাতে দেবে। চোদ্দ বছরের একসপেরিয়েন্স! কত এল — কত গেল। বুদ্ধ বরা জীবনটাকে বাজিয়ে দেখেছে। পৃথিবীর পাতালতক দেখেছে। এর মাথা খেয়ে বসে আছে। এই সুকন্যা চৌহানের কিঙ্কিণীর বোলি কম নয়। আগেরবার ধীরেশ্বর বরুয়া, তার আগে মঃ মোস্তাক হুসেন, তারও আগে অনুপম দত্ত চৌধুরী। এবার ইনি। ডুবলেন বটে। তাজমহল বানাবেন!

টু: প্ল্যানিং — তাজমহল? অ্যাব্‌সার্ড।

সৌমার — তাজমহল বাস্তব। রিয়েল।

টু: প্ল্যানিং — উদ্দেশ্য?

সৌমার — বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে। টু অ্যাট্রেক্ট দ্যা ফরেন টুরিস্ট। অসমের গড়গুলো পুরোনো হয়ে গেছে। যে হারে গণ্ডারহত্যা চলছে এই প্রাণীটি নিশ্চিহ্ন হতে আর কতদিন বাকি? লোহিতপাড়ে এবার তাজমহল। কাছেই হবে বিহুনাচ।

টু: প্ল্যানিং — মোটেও কন্‌ভিন্সিং নয়। তবু বিত্তবিভাগ যদি অনুমোদন করে আমার আর বলার কিছু নেই। অ্যাপ্রোভ্‌ড। সামান্যতম লাজবীজ খেয়ে বুদ্ধ বরা ফাইলটা বুকে জাপটে ধরে পরিচালন সঞ্চালকের রুমে ঢুকে গেলেন। দৃশ্য একটাই। মুখোমুখি সৌমারজিৎ শর্মা আর সুকন্যা সুন্দরী। চোখে চোখে কী বা দেখে আদুরি, আমি চোখ মেললেই নতমুখী। গ্রাহ্যই করলে না। বললে স্যর, তাজমহল ফাইলটা এসে গেছে। ট্যুরিজম প্ল্যানিং স্কিমটা অ্যাপ্রোভ করে দিয়েছে — সাব্‌জেক্ট টু ফিন্যান্স কনকারেন্স। সৌমারজিৎ শর্মা একগাল হাসলেন। এমন ঘরে এমন হাসি হাজার জনে হাসছে।

— ফাইলটা ফিন্যান্সে অ্যান্‌ডোর্স করে দিন।

— ঠিক আছে স্যর।

— আর কিছু?

— নেই স্যর।

বুদ্ধ বরা নৃত্যপটিয়সীর নয়নযুগল দেখলেন। কোনো এক প্রান্তরে তখন বেহাগ আর হিল্লোলের যুগলবন্দি। ইস, মাছমাংসে একপেট ভাত, ভাড়াটে থেকে ঘর আর

মারুতি একখানির জন্য এসব দৃশ্য হজম করতে হয়। কর্মসংস্কৃতির বর্ষ নাহলে নতুন নাগিনীকে বিহুনাচ নাচাতাম। ভেবেচিন্তে বুদ্ধ বরা দৃশ্যপট থেকে দৃশ্যান্তরে গেলেন। আজকাল বুদ্ধ বরা স্বপ্নে তাজমহল দেখেন। মর নদীর পারে। সান্ধ্যভ্রমণ দেখেন। পূর্ণিমা রাত দেখেন। স্বপ্নে একদিন সুকন্যাকে সাপটে ধরেছিলেন। দীর্ঘদিন আলিঙ্গন চুম্বনাদি কামজ ব্যসন ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা স্ত্রী এক ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের বালিয়াড়িতে কেউ কোনোদিন একটা তাজমহল কখনো দেখেছেন কি? পরে শোনা গেল তাজমহলটা ফিন্যান্‌শল ইয়ার শেষে সমান সমান দুভাগ হল। একটা ভূকম্প হয়েছিল কিনা জানা গেল না। কেবল শোনা গেল এসব কারণেই সৌমারজিৎ শর্মার প্রয়োজন হ বু হ বু করছিল। তিনি নিজে ধরে মেলে আগের পদবিতে আরও একবছর এক্সটেন্‌শন নেবেন। বোধ হয় অসমে অধিক বিদেশি পর্যটক টেনে আনতে তাঁর আরও দুটি কুতুবমিনার বা লালকেল্লা বানানো দরকার। ইতিমধ্যে সুকন্যা দিল্লি ভ্রমণরত। সৌমারজিৎ শর্মা ফের আদর্শ স্বামী এবং পিতা। জীবনের সাবলীল ছন্দ অভ্যস্ত প্রেম প্রীতি ও দায়িত্বে। সৌমারজিৎ শর্মাকে এখানেই ছেড়ে দিই। ধৈর্য ধরে পথ চেয়ে থাকা যাক কখন তাঁর উপর ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টিকরাপ্‌শন জাপটে পড়ে।

ধরে ফেললেন। মানুষটার চালচলনে ইতিমধ্যে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিলই। কারণ, তার ছেলেটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। পড়াতেও ভালো। সহধর্মিনী দৃষ্টিনন্দন। পরিধানে সিল্কের শাড়ি। একলাই ঘোরে হাটবাজারে। মানুষটি আগে পরতেন ধুতি, এখন লংপেন্ট শার্ট। আগে ছিলেন তালপাতর সেপাই, এখন নাদুসনুদুস। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন। একটা ফাইল সঞ্চালকের কোঠায় নিয়ে যেতে দশটা টাকা খুঁজেছিলেন। বুদ্ধ বরা একলাফে দুই হাতে জাপটে ধরলেন। খানাতালাশি করলেন। পকেটে পেলেন তিরিশ টাকা। অ্যান্টিকরাপ্‌শনের গৌরবে তিনি ভ্রষ্টাচারী পিয়ন ধনেশ্বর রাভাকে ঘাড়ে ধরে সঞ্চালকের সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বুদ্ধ — স্যর, ও একটা ঘুসখোর বদমাস। দিনকে দিন তিনি ধনী হয়ে উঠছেন। এনার দিনের ইনকাম কম করেও একশো। এদানিং এনার ইস্তিরি সিলিকের শাড়ি ধরেছেন। পুত্তর পড়ে ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে। উয়িদ ইমিডিয়েট অ্যাফেক্ট একে সাসপেন্ড করে দেওয়া দরকার।

সুকন্যা — হরিবোল! আনফরচুনেট। করাপ্‌শন। ম্যাল্‌প্রাক্‌টিশ (কণ্ঠে তাঁহার একরাত্রি আবেগ)।

সৌমার — এবারের জন্য, আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি। বি কেয়ারফুল। সাবধানে কাজ

করবে। সাবধানে হাত চালাবে। ডু য়্যু আন্ডারস্ট্যান্ড? নাউ গো।

মনের দুঃখে আজ একটু তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরে এল রাভা। বিছানায় গা এলিয়ে দিলে শূন্য গোধূলি বেলায়। স্ত্রীকে গালমন্দ করলে — ইস, পিয়নের শয্যাসঙ্গিনী আবার সিল্কের শাড়ি পরে। এখন থেকে কাপাসের মেখলা ছাদর না পরলে তোর পিঠের ছাল তুলে নেব। পুত্রসন্তানকে গাইলবাজ করে বলে পড়ালেখায় চোকা, ইংরেজি ইস্কুলে পড়ে বড়োমানুষ হবে। ছেলে বা স্ত্রী কেউ বুঝল না মাথামুণ্ডু। মানুষটি গোবেচারা। রাগ উঠলে ভয়ংকর। ওরা চুপটি মেরে গেল। ভাত খেতে ডাকতে গিয়ে দেখে চিৎপটাং হয়ে রাভা শুয়ে আছে। নাক ডাকা ঘুম। ওরাও ভাতে-ভাত না-খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। মাঝরাতে দুয়োরে ঠকঠকি।

অচিন কণ্ঠস্বর — ধনেশ্বর, অই ধনেশ্বর রাভা!

ধনেশ্বর বিছানা ছাড়ে। ভয়ে ভয়ে শুধে — কে?

অচিন কণ্ঠস্বর — দুয়ার খুলবি, না ভেঙে ঢুকব?

ধনেশ্বর ভয়ে ভয়ে দুয়ার খোলে। দেখে দুয়ারমুখে দাঁড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড মানুষ। খাকি পোশাক। একমুঠো মোচ। কালচে। হতশ্রী। হাতে আবার একটা ডান্ডা।

ধনেশ্বর — আ — আপনি কে?

আগন্তুক — সি বি আই।

ধনেশ্বর — ইস্ বি আই!

আগন্তুক — বুঝিসনি? তোর ঘরে কালোটাকার মটকি। ব্ল্যাকমানি। তোর ঘর রেইড করতে এসেছি। রেইড। চল ভেতরে।

আগন্তুক ভিতরে ঢুকে গেলেন। এদিক সেদিক তাকালেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন — কোথায়? টাকার বাণ্ডিল কোথায় রেখেছিস?

ধনেশ্বর — টাকা!

আগন্তুক — কালোটাকা। ব্ল্যাকমানি। বল, কোথায়, রেখেছিস? গদরেজ লকার কোথায়? চাবি কোথায়?

ধনেশ্বর — আমার কোনো গদরেজ নেই স্যার। ওই যে দেখছেন, ওটা টিনের বাকসো। আর ওইটা চামড়ার সিউয়েট্‌কেস অন্যটা কাঠের পেটড়া, ব্যস এই পর্যন্তই।

আগন্তুক— ভেবে দ্যাখ।

ধনেশ্বর — ওগুলো খোলাই আছে স্যার। তালাচাবিও নেই।

আগন্তুক — খোল। নইলে নিজেই লণ্ডভণ্ড করব।

টিনের বাকসো, চামড়ার সিউয়েট্‌কেস আর কাঠের পেটড়া তছনছ করার পর

মোচে তা দেন। তারপর রক্তচক্ষু করে ধনেশ্বরের দিকে চোখ পাকিয়ে বলেন — তোর রেফ্রিজারেটর কোথায়?

ধনেশ্বর — নেই।

আগন্তুক — টিভি?

ধনেশ্বর — নেই।

আগন্তুক — কুকিংরেঞ্জ?

ধনেশ্বর — বুঝলাম না স্যর।

আগন্তুক — ভাতের চরুস্থালী।

ধনেশ্বর — ওই যে। একটা ছছ্‌পেন, একটা কড়াই, থালবাটি আর গ্লাস, ব্যস।

আগন্তুক — কালোটাকা কী করেছিস, বল।

ধনেশ্বর — বুঝতে পারছি না স্যর।

আগন্তুক — আহা! বাপধন আমার ইচা মাছটি পুড়েও খেতে জান না। হোলার ভাই মোলা। ভাজা মাছও উলটিয়ে খেতে জানে না। অই, ধরে নিয়ে জেলে ভরাব। পায়ে বেঁধে ফেনে উল্টিয়ে ঝোলাব। ইলেকট্রিক শক দেব। মুখে রক্ত বেরুবে। চোখ ফুটে যাও যাও হবে। তখনই বলবি কালো টাকা কোথায় রেখেছিস। আজ আপিসে দশ টাকা ঘুস নিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলি তো?

ধনেশ্বর — বাপ, স্যর, কাটুনই বা মারুনই, দশটা টাকা খুঁজে নিয়েছি। ভিক্ষা চেয়েছি। নিজের মানুষ হলেই খুঁজি। নইলে যে স্যর ঘর চলে না। মাইনে খুব কম কিনা। হায় ঈশ্বর। (কাঁদতে আরম্ভ করে)

আগন্তুক — চুপ। ডান্ডা মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব। সত্যি করে বল কালো টাকা কোথায় রেখেছিস।

ধনেশ্বর — বাপ, স্যর, সি বি আই ইচর। ওই যে ওখানে। ওই বস্তায়। ব্যাগের ভেতর।

আগন্তুক — হে হে হে! সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না। অন্য ব্যাগে? খোল ব্যাগটা। উল্টে দে। আরে এসব কী বের করলি?

ধনেশ্বর — কালো টাকা।

আগন্তুক — কত?

ধনেশ্বর — মরে গেছি! মারলি রে। ডুবালি (বের হয়ে দৌড়তে থাকে)

আমার বাপ, স্যর সি বি আই ইচর!

ধনেশ্বর কাঁদতে আরম্ভ করে। স্ত্রী আর ছেলে বিছানা ছেড়ে ওঠে। দেখে —

ঘুমের ঘোরে মানুষটা কাঁদছে। বলছে — টাকা দশটা খুঁজে নিয়েছি, সাঁচ। ভিক্ষা চেয়েছি। ঘুস নয়। ওরা বুঝতে পারল ধনেশ্বর স্বপ্ন দেখেছে। স্ত্রী তাকে আলতো ধাক্কা মেরে বলে — হেই, কী হল?

ধনেশ্বর স্বপ্নে কেঁদেই যাচ্ছে।

ভারতীয় চরিত্রের একটা বড়ো দোষ — আমরা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কথায় কান দিই। লোকের ব্যক্তিগত মুহূর্তের বৃত্তিটিকে উঁকি মেরে দেখে আমরা আনন্দ আহ্লাদে আটখানা হই। এই দোষ আমারও যে নেই এমন কথা বলব না। তাই এই রাতে এখন এই মুহূর্তে সুকন্যা কী করছে তা জানতে তাঁর ব্যক্তিগত মুহূর্তটি উঁকিঝুকি দেখতে বড্ড ইচ্ছা করছে। দেখছি উঁকি মেরে। একটাই দৃশ্য। নিশীথিনী। নীরব নিথর। আর সুকন্যা। কী দেখলাম? কাউকেই বলব না। কারণ, এসব কোলাজের উপরই সুকন্যা হবে গিয়ে অন্য এক গল্পের নায়িকা।

।। অনুবাদ : জীবন নাথ ।।

মৃত্যুদাতা

হরেকৃষ্ণ ডেকা

আমার ষাট বর্ষীয় জন্মদিনে একজন যুবকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। যে সব অনুরক্ত পাঠক আমার এই জন্মদিনটিকে হীরক জয়ন্তী হিসেবে পালন করেছিল, তাঁদের মধ্যে এই চটপটে যুবকটি ছিল না। আমার হীরক জন্মজয়ন্তীর উদ্যোক্তা কয়েকজনকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। অনুষ্ঠানটির শেষের দিকে যুবকটি এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাইছি', আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়েছিলাম। মানুষেরে নজরে থাকতে আমি ভালোবাসতাম, এবং আমার অনুরক্তদের দ্বারা আয়োজিত এই জন্মজয়ন্তী আমার মনে খুশির জোয়ার এনে দিয়েছিল। কিন্তু যুবকের প্রথম প্রশ্নটিই ছিল অস্বাভাবিক এবং আমি প্রথমে খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার মৃত্যুভয় আছে কি?' এই প্রিয় দিনে এমন একটি অপ্রিয় প্রশ্ন! কিন্তু এই সুন্দর সময়টুকুর মধ্যে আমি অসন্তোষ প্রকাশ করতে চাইনি। আমি একটি উত্তর দিয়েছিলাম, 'না। মৃত্যুতে আমার কোনো ভয় নেই। একদিন তো মরতেই হবে।' উত্তরটি মিথ্যা ছিল। কিন্তু একটি সুন্দর হাসি দিয়ে আমি উত্তরটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলাম। আসলে যুবকটির প্রশ্নের পূর্ব মুহূর্তেও আমি মৃত্যুর কথা ভাবতেই পারিনি। সে মৃত্যুভয় শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটি সতেচন হয়ে উঠেছিল এবং আমারও যে একদিন মরতে হবে সেই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যুভয় জেগে উঠেছিল। আমার এই জন্মদিনটিকে যে উৎসব হিসাবে পালন করা হল, আসলে এইটি সৎকারের প্রাক্-অনুষ্ঠান কি না কে জানে — এ ধরনের একটি ভাব আমার মনে তৎক্ষণাৎ হয়েছিল এবং আমি অনুভব করেছিলাম যে আমার আয়ু একটি বছর কমার জন্য এই উৎসবের আয়োজন।

যুবকের দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরও অদ্ভুত। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মৃত্যুকে আপনি দৈবদত্ত বলে ভাবেন কি?' প্রথমে আমি প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি? জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে?', 'ধরুন আপুনি অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারেন বা রাস্তায় বের হয়ে মটর দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন অপটু গাড়িচালকের ভুলে বা ঘাতকের হাতে আপনার প্রাণনাশ

হতে পারে। কিন্তু তথাপিও আপনি ভাবেন কি যে মৃত্যু মানুষের নেই, ঈশ্বর যতটুকু আয়ু বেঁধে দিয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেনই।' আমি প্রশ্নটিতে স্বস্তি পেয়েছিলাম। আমি ভাবি যে কারও আয়ু কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দৈব মৃত্যু স্থির করে না রাখলে কারও মরণ নেই। আমি উত্তরটি সেইভাবেই দিয়েছিলাম। যুবকটি কোনো কথা না বলে কেবল হেসেছিল। তার হাসির অর্থটি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

যুবকের তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল, 'আপনি কাহিনি লেখেন, সেইগুলি এক একটি মনোরম কাহিনি, সুখপাঠ্য। আপনি যে একজন বেশ জনপ্রিয় লেখক আপনার অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। আজকের এই উৎসবমুখর সভাতেই দেখছি কত শুভাকাঙক্ষী অনুরাগী পাঠক উপস্থিত হয়েছে। আমার প্রশ্নটি হল, আপনি আপনার অনুরাগী পাঠককে খুশি করার জন্য এবং তাদের কল্পনার খেয়ালে রুচিসম্মত খোরাক জোগানের জন্য লেখেন না চারপাশের ঘটনাবহুল জগতের তাৎপর্য বিচার করে বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে লেখেন।' এ প্রশ্নটি আমার ভালো লাগেনি। আমি পাঠকের বাহবা আশা করি। সুতরাং বেশির ভাগ পাঠক যা ভালোবাসেন তাই লিখি, অন্যকিছু কেন লিখব? পাঠকের ভালো লাগা লেখা না লিখে এত জনপ্রিয় হলাম কীভাবে? সেখানে বাস্তব, তাৎপর্য ইত্যাদি কথাগুলির কী দরকার আছে? আমি বলোছিলাম, 'দেখ, আমার লেখা পড়ে পাঠক যদি তৃপ্তি পায় তবে সেখানেই আমার সার্থকতা। সেটাই আমার লেখার তাৎপর্য। পাঠকের রুচি পাঠকের খুশি আমার লেখার বেরোমিটার। তাঁরা মনোরম, মোলায়েম কাহিনি চায় আর আমি তা-ই দিই।

দেখেছিলাম যুবকটি আমার কথায় সম্মতি জানিয়েছিল। আমার কথায় সম্মতি প্রকাশ করে মাথা নেড়েছিল না অন্য কারণে, সেই কথা ঠিক বুঝতে পারিনি।

আরও অনেক ধরনের প্রশ্নই সে করেছিল। যুবকের একটি প্রশ্ন রহস্যময় যেন লেগেছিল। সেটাকে প্রশ্ন বলার চাইতে বরং উক্তি বলাই ভাল হবে। সে বলেছিল, 'মানুষ দু-বার মরে বলে আপনি বিশ্বাস করেন কি? একটি তো জৈবিক মৃত্যু। প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃত্যু হয়। আর একটি সামাজিক মৃত্যুও আছে। এই ধরুন একজন লেখকের জনপ্রিয়তা শেষ হয়ে গেল, তাঁর লেখা পড়াব মানুষ আর নেই, তাঁকে সবাই ভুলে গেছে। এইটি তাঁর সামাজিক মৃত্যু।' এই উক্তিটি করার পর সে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তেমন মৃত্যু আছে বলে ভাবেন কী?' প্রশ্নটিতে আমি বিব্রত না হয়ে থাকতে পারিনি। আমি তখনও আমাকে ঘিরে থাকা অনুরক্ত ভক্তদের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওরা আমাকে ভুলে যাবে কি? ভুলে গেলেই যেন আমি মরে যাব? যখন যা পাওয়া দরকার —

বিশেষ করে যশ ও ধন আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি। আমার স্বাস্থ্য ভালোই আছে। আমি পরিপূর্ণ জীবন যাপন করব বলে বিশ্বাস করি। সাফল্যের সঙ্গে একটি পরিপূর্ণ জীবন যাপন করার পর একদিন আমি মারা যাব। সেটাই আমার একমাত্র মৃত্যু। তার আগে কেন আমি মারা যাব? এইটুকু কথা আমি যুবকটিকে বলেছিলাম। দেখছিলাম মাথা নাড়ানো তার একটি স্বভাব। কিছু বিরক্তিকর। কিন্তু কোনো মন্তব্য করিনি।

এরপর সে শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। বলেছিল, 'দেখুন, আজ যাঁরা এখানে ভাষণ দিয়েছেন, সবাই আপনাকে শতায়ু হওয়ার আশীর্বাদ দিয়েছেন। আপনি নিজে কত বছর বাঁচবেন বলে ভাবেন?' আমি কোনো কিছু না ভেবেচিন্তে বলেছিলাম, 'নব্বই বছর। বুঝেছ, নব্বই বছর! আমি জানতাম যে উত্তরটি হাস্যকর। কিন্তু কেনই বা আমি নব্বই বছরই বলেছিলাম! কিছুদিন আগে আমি মারা গিয়েছি ভেবে ভুল ধারণা নিয়ে থাকা নব্বই বছর বয়স্ক মানুষ একজনকে সুস্বাস্থ্য ও খুশিমনে বসে থাকতে দেখেছিলাম। হয়তো সে জন্যই নব্বই বছরের কথা আমার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল। আমার নিজের স্বাস্থ্য ঠিকই ছিল। কোনো অসুখ বিসুখে আমি কখনও ভুগিনি। তদুপরি আমার লেখার অনুরাগী পাঠকরা লেখক হিসাবেও আমাকে এক নিরাপত্তার অভয় দিয়েছিল। আকস্মিক মৃত্যু ভাবনা আমার মনে একেবারেই আসেনি।

সাক্ষাৎকারগুলিতে সাধরণত কী হয়? প্রশ্নকর্তাই প্রশ্ন করে আর আমি মুখে যে উত্তরটি আসে তা-ই বলে দিই। পরে আর সেই প্রশ্নটির কথা ভাবিও না, উত্তরটাও না। অনুরক্ত পাঠকদের আমার উত্তরে চমৎকৃত করতে পারলেই আমার আনন্দ। আমার লেখা যেভাবে পাঠকের রুচির স্বাদ দিয়েছে, আমার নামটিও সেভাবেই তাঁদের খুশির মধ্য দিয়ে চিরজীবী হয়েছে, সেখানেই আমি লেখক হিসাবে সম্পূর্ণতা বোধ করি। বাকিটুকু উপরি পাওনা।

কিন্তু যুবকের প্রশ্নগুলি আমার এই প্রফুল্ল মনে কয়েকটি খোঁচা দিয়ে গেল। এই অদ্ভুত প্রশ্নগুলি আমার সুবিন্যস্ত মনে কয়েকটি জট লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে এবং প্রশ্নগুলি বারে বারে মনে পড়ছিল। অস্পষ্টভাবে আমি যেন বুঝতে পেরেছি, সাহিত্যের নামে আমি যে জালটি বুনেছিলাম আসলে তা কল্পনার জাল এবং বাস্তব প্রশ্নগুলির উত্তর সেখানে ধরা পড়ে, কারণ চেতনার বিলে সেই জাল ফেলা যায় না। সেখানে অনুরাগী পাঠকের হাততালি যত বড়ো করে শোনা যায়, ততই বাস্তব অবাস্তব হয়ে যায়।

এইসব এলোমেলো ভাবটা হয়তো ধুয়েমুছে যেত কিন্তু সেই দিনই আমাদের শহরে সবচেয়ে বড়ো বোমা বিস্ফোরণটি ঘটল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিটিতে ছিন্নভিন্ন

হয়ে বীভৎস রূপ নেওয়া মানব দেহটি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। আমার কাহিনিগুলিতে যেসব মনোরম জগত আমি সৃষ্টি করি, যেখানে সুন্দর চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে কথা বলে, রাগ-অনুরাগ, আবেগ-অনুভূতির নানা উপাদানে যে কাহিনিগুলি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, অজস্র অনুরাগী পাঠক যেখানে খুঁজে পায় আনন্দের খোরাক, যে জগতে আমি নিজেও বাস করে এসেছি, আজকের এই বীভৎস ঘটনাটি আমার এই মনোরম জগৎকে যেন বিকৃত করে দিল। ঘটনাটি অলীক না আমার মনোরম কাহিনির জগৎটি অলীক — এমন একটি বিভ্রান্তি আমার কেন হচ্ছে? বিস্ফোরণ আগেও ঘটেছে, তেমন কত নির্মম ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশও হয়েছে। কিন্তু আমার অনুরাগী পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী করে কাহিনি রচনায় মগ্ন হয়ে থাকার সময় আমি কোনোদিনও এমন ঘটনার দ্বারা বিচলিত হইনি। আজ জট লেগে গেল, কারণ এই ছিন্নভিন্ন নিষ্প্রাণ দেহটির মুখ আমি চিনতে পেরেছি। আমার অনুরাগী পাঠকদের আয়োজন করা আমার হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সপ্রতিভ যুবকটির জিজ্ঞেস করা প্রশ্ন একটির আমার দেওয়া উত্তরে সেখানে জট পাকিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, মৃত্যু দৈবের হাতেই থাকে। এই ছিন্নভিন্ন দেহটিকে দৈবই বিস্ফোরণের বলি করল কী?

আমার নব্বই বছর হয়েছে। আমি এখন বিছানায় লেপটে পড়ে থেকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। আসলে মৃত্যুকে আমি আগ্রহের সঙ্গে বরণ করতে চাই। আমার স্মৃতিশক্তিও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। যারা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখতে আসে, আমি তাঁদের চিনতে পারি না। একজন পাকাচুলওয়ালা ষাট বছর বয়স্ক মানুষ কখনও আমার কাছে এসে বসে। নম্রভাবে আমাকে সম্বোধন করে, 'বাবা'। আমি মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু চিনতে পারি না। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কেমন আছেন?' কেমন আছি কথাটির কোনো অর্থ নেই যেন মনে হয়। থাকা ও না থাকার মধ্যে থেকে আমার ভয় করে না। শেষ হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক যেন লাগছে এবং বুঝতে পারছি যে একটি পূর্ণ জীবন ভোগ করার পর এক মাত্র 'শেষ হওয়া' শব্দটি বাকি আছে। বড্ড আনন্দে দৈব নির্ধারিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করে আছি। দৈব শব্দটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল সেই সপ্রতিভ বুদ্ধিমান তরুণের মুখটি। আমার স্মৃতিশক্তি এখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আমাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করা এবং রোজ আমার সামনে বসে হাত ধরে নানান কথা জিজ্ঞেস করা মানুষটি আমার সম্পর্কে কী হয় জানি না, স্মৃতিশক্তি প্রখর করেও অনুমান করতে পারি না। কিন্তু সেদিনের ঐ যুবকের জিজ্ঞেস করা কথাগুলি

ও তার মুখটি ভুলতে পারব না বলেই আমার মনে গেঁথে আছে। তার করা দুটি প্রশ্নের আমার দেওয়া উত্তরে যে অমিল হয়েছিল এই কথা আমি এখন বুঝতে পারি। একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম যে, দৈবই মৃত্যু ঠিক করে রাখে। অথচ পরে আমি কত বছর বয়সে মারা যাব প্রশ্নটির উত্তরে বলেছিলাম যে, আমি নব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচব। দৈবকে স্থির করতে না দিয়ে আমি নিজেই আমার আয়ু স্থির করে নিলাম। সে তখন হেসেছিল— সে কথা মনে পড়ল। মৃত্যু-মুহূর্তে হাসিটির অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি সত্যিই নব্বই বছর বয়সে মরতে বসেছি। আমার নিয়তি আমাকে দেখছি এইটুকু আয়ু দিয়েছে। এখন বেঁচে থাকলে ছেলেটিকে বলতাম, দেখ দৈবই আমাকে এইটুকু আয়ু দিয়েছে। আমি উদ্বেগহীনভাবে এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে যারা আমাকে বাড়িতে দেখতে আসে, তারা সবাই নিশ্চয় আমার মৃত্যু মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করা বয়স্ক লোকটির সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্ক মহিলাকেও মাঝে মধ্যে দেখি। একটি ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে কৌতূহল নিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে দেখে যায়। সে মনে হয় এই বয়স্ক লোকটি ও সেই মধ্যবয়স্ক মহিলাটির নাতনি। একটি যুবতী মহিলা কখনও এসে আমাকে 'দাদু' বলে ডাক দিয়ে যায়। সেই ছোট্ট সুন্দর মেয়েটির মা হবে বলে মনে হয়। এইগুলি কী ধরনের সম্বন্ধ ভাবলে আমার গোলমাল লেগে যায়। কিছুক্ষণ আগে ৮০-৮১ বছরের বৃদ্ধা মহিলা একজন এসে আমার সামনে বসল। অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝতে পারিনি সে কী দেখছে। আগেও মাঝে মধ্যে সে আমার ঘরে এসেছে। আজকে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, 'আপনি ভালো আছেন। গুয়াহাটিতে কবে এসেছেন?' সৌজন্যের খাতিরে জিজ্ঞেস করেছি। কথাগুলি অত্যন্ত কষ্ট করে বলেছি। কী জানি অল্প পরেই হয়তো কথা বন্ধ হয়ে যাবে। গলার ভিতরে কিসের যেন ঘরঘরানি শুনলাম। আমার প্রশ্নটি শুনে বৃদ্ধা মহিলাটি চমকে উঠল। সে কোনো শব্দ না করে ভয়ে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরটির বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বয়স্ক মানুষটিকে বলছে, 'বাবা আমাকে চিনতে পারেনি।' বয়স্ক মানুষটি ভিতরে এসে বলল, 'বাবা, ইনি তো মা।' আমার সঙ্গে এই সম্পর্কটি কী বুঝতে পারিনি। এখন আর কোনো জটিল কথা চিন্তা করি না। এমনিই বলেছি, 'হ্যাঁ'। আসলে মৃত্যুর জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি। আমার কোনো ধরনের উদ্বেগ নেই। এই মানুষগুলি, যারা আমার কাছে আসে, আমাকে সম্বন্ধ ধরে ডাকে, তাদের আমি চিনতে পারি না। তাদের মুখে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন দেখতে পাই না। আমি যে মারা যাব সে জন্য নয়। কারণ ওরা

জানে আমি মারা যাব। আমি মারা যাওয়ার সময় আচার অনুষ্ঠানের জন্য কী কী জিনিস লাগবে সেই বিষয়ে ফিসফাস করে কথা বলতে শুনেছি। তাদের উদ্বেগ, কখন আমি মারা যাব সেই সঠিক সময়টি না জানার জন্য। তাদের কয়েকজন এসে আমাকে ভরসা দিয়ে যায়। আমি বল্‌তে চাই, আমাকে ভরসা দিতে হবে না। আমার ভয় করে না। আমার অন্তিম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না। এখন বুঝেছি, আমার ষাঠতম জন্মজয়ন্তীতে সেই প্রশ্নোত্তরে কোনো ফাঁকি দিইনি, আমার মৃত্যু ভয় নেই, যুবকের মুখটি আবার আমার মনে পড়েছে। তাকে পরে আবার দেখার সুযোগ না পেলে নয়। কিন্তু সেই মুখটি কেন আমার স্পষ্ট মনে থেকে গেল? জীবনটিকে সহজ রোমাঞ্চের কাহিনি হিসেবে নেওয়া লেখক একজনকে অদ্ভুত কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্যই কী? নিত্যদিন যারা আমার ঘরে থাকে তাদের তো আমি চিনতে পারি না, এদের পরিচয় আমার কাছে গোলমেলে বলে মনে হয়। অথচ সেই যুবকের ছবিটি আমার তো স্পষ্ট মনে আছে। সে আমাকে অন্য একটি প্রশ্নও করেছিল না! মানুষের দুবার মৃত্যুর কথা বলেছিল। একটি জৈবিক মৃত্যু অন্যটি সামাজিক মৃত্যু। আমার মতো লেখক একজন যদি সমাজের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় তাহলে সেটা সামাজিক মৃত্যু কী না সে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি জানি, কিন্তু বলিনি, মানুষ একবারই মরে। কিন্তু প্রশ্নটি আমার মনে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। আমার জন্মজয়ন্তী পালন করা উদ্যোক্তা ও সভার শ্রোতাদের দেখে আমি ভেবেছিলাম, এঁদের মনে আমি চিরজীবী হয়ে থাকব। এমনকী আমি মরে যাবার পরেও আমার নামটিকে এঁরা জীবিত করে রাখবে। আমি ভেবেছিলাম, জৈবিক মৃত্যু হলেও মানুষ এভাবে কৃতিত্বের মধ্য দিয়ে অমর হতে পারে। তথাপিও মনে জট লেগেছিল। আমি যেন ভাবিনি, যদি আমার পাঠকেরা আমাকে ভুলে যায়, তাহলে সামাজিক ভাবে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তাঁদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কী খোরাক প্রয়োজন তা আমি জানি বলেই আমি তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছি। যদি তাঁদের রুচি পরিবর্তন হয় তাহলে? মনে না আনার চেষ্টা করেও এইসব ভাবনা মন থেকে দূর করতে পারিনি। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে আমি দেখেছিলাম যে নতুন পাঠক আমার সামনে আর আসে না। আমার লেখাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কারণ কল্পনার উৎস শুকিয়ে গেছে। একদিন দেখেছি, সংবাদপত্রে কোনো এক প্রসঙ্গে আমার নামের আগে প্রয়াত লিখে দিয়েছে। তার মানে সমাজের স্মৃতি থেকে আমি ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছি। তথাপিও আমি উদ্বিগ্ন হইনি। প্রথম কথা আমি লেখালেখির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছি। কিন্তু অমর হয়ে থাকর ইচ্ছাও তো আমার ছিল না। এই দিকেই যুবকটি ইঙ্গিত দিয়েছিল কী?

এই ইচ্ছা না হওয়াটিও কী মৃত্যু? পরিপূর্ণ বয়সের জৈবিক মৃত্যুটিই দ্বিতীয় মৃত্যু। যুবকের প্রশ্নগুলি যে এত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তা এই নব্বই বৎসর বয়সে মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে বুঝেছি কী?

আমি যুবকটিকে বলেছিলাম, আমার মৃত্যু ভয় নেই। কিন্তু আমার মনের গভীরে মৃত্যুভয় কখনও দেখা দিয়েছিল কী? সেদিনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার ছবিতে ছিন্নভিন্ন ও বীভৎস হয়ে পরা মানব দেহটি দেখে আমি কেন শিউরে উঠেছিলাম? কেবলমাত্র ঘটনার নৃশংসতার জন্য কী? আমার মনে একটি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, আমার কাহিনিগুলির মধ্যে যে মনোরম জগৎ সৃষ্টি করি, যা পড়ে রোমাঞ্চিত হয়ে আমার ভক্ত পাঠক আমার পরের কাহিনির বিষয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, সেই জগতের ঘটনাগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি এবং কল্পনার সাবলীল প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তখন থেকেই তো আমি আর লিখতে পারিনি। আমার কল্পনার জাল বুনতে চেয়েছিল, আমার কলমে শব্দগুলি আঁকিবুকির বাইরে আর কিছুই নয়, বলে মনে হয়েছিল। ৭৫ বছর বয়সে আমি আমার নামের আগে 'প্রয়াত' শব্দটি দেখেছিলাম, কিন্তু তার আগের থেকেই আমি লেখক হিসাবে মৃত্যুমুখে পড়েছিলাম কী? তখন কী আমার মৃত্যুভয় হয়েছিল — যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি কেন শিউরে উঠেছিলাম এখন তা আমি বুঝতে পেরেছি। তেমন একটি বীভৎস মৃত্যু আমি আমার জন্য চাইনি। আগের কোনো বোমা বিস্ফোরণে আমি তো বিচলিত হইনি। কিন্তু এই বিস্ফোরণের ছবিটি এমন একটি বীভৎস মৃত্যুর সম্ভবনার কথা আমার মনে এসেছিল। আগের বিস্ফোরণগুলির সঙ্গে কী পার্থক্য আছে? পার্থক্য আছে, কারণ এইটি প্রত্যক্ষভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছিল এই বিস্ফোরণ আমার ষাট বর্ষীয় জন্মজয়ন্তীর দিনে ঘটেছিল। এবং মৃতদেহটি আমি চিনতে পেরেছিলাম দেহটি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তথাপিও আমি ভেবেছিলাম, সেই মৃতদেহটির মালিক আমাকে প্রশ্ন করা যুবকটি না হলে আমি অবহেলা করতে পারতাম তাহলে আমার ষাটবর্ষীয় জন্মদিনটিই আমার শেষ দিনটি হত। আমার জন্মজয়ন্তী সভা থেকে বের হয়ে আমাকে মৃত্যুর বিষয়ে প্রশ্ন করা যুবকটি অপঘাতে পরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমার স্তাবকেরা আমাকে ঘিরে না থাকলে আমি হয়তো বের হয়ে যেতাম এবং আমিও ঘাতকের বলি হতাম। ঘটনাটি আমার জন্মজয়ন্তীর উৎসবস্থল থেকে একটু দূরে হয়েছিল। আমাকে প্রশ্ন করে বের হয়ে যাওয়ার পরই নিশ্চয় যুবকটি মৃত্যুমুখে পড়েছিল। আমি অবশ্য পরদিন সংবাদপত্রে ছিন্নভিন্ন দেহটি দেখে চিনতে পেরেছিলাম। তারপর আমার কলম অচল হয়ে পড়েছিল। ঘটনাটি বার বার আমার মনে এসে আমার মনোমুগ্ধকর

কল্পনাগুলিকে বাধা দিতে শুরু করেছিল। যে জগতে আমি সশরীরে আছি এবং যে সুন্দর, আকর্ষণীয় জগৎ আমি আমার কাহিনিতে সৃষ্টি করি, এই দুয়ের মধ্যে কোনো সামাঞ্জস্য আনতে না পেরে আমার কলম যেন নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল। সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। এই অক্ষমতা অসহায় ক্রোধে পরিণত হয়েছিল। ঘটনার বীভৎসতা আমাকে বিচলিত করার থেকেও আমার সৃষ্টি ক্ষমতাকে এভাবে দুর্বল করে দেওয়ার জন্যই আমার মনে এমন ক্রোধের জন্ম হয়েছিল। কল্পনার মাকড়সার জাল থেকে বের হয়ে আমি অতি কঠোর ভাষাতে চিন্তা করেছিলাম তাদের, যারা এই ধ্বংসযজ্ঞতে জড়িত হয়েছিল। আমার স্তাবকেরা বলেছিল, আপনি এ কী করছেন? এত সুন্দর, মনোরম, সুখপাঠ্য কাহিনিগুলি আপনি লিখছেন না কেন? আপনার সুন্দর ভাষায় এখনকার লেখা কথাগুলি খাপ খায় না। ওরা বুঝতে পারছে না যে আমার গড়া গল্পের পৃথিবীটি আমি আর তৈরি করতে না পেরে অসহায়ের মতো সেই দানবীয় দুষ্কার্যকারিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে চেয়েছি। আমি যে কোনো বিশ্বাসের থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলম তুলে নিয়েছিলাম এবং তার মধ্য দিয়ে আমার কলমের হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতাকে ফিরে পেয়েছিলাম তা নয়। সেজন্যই আমার আস্ফালন কারও মনে রেখাপাত করতে পারেনি। আমার এইসব লেখার মধ্য দিয়ে আমি একটিও গুণমুগ্ধ স্তাবকের দল সৃষ্টি করতে পারিনি। আমি লেখা ছেড়েই দিয়েছি। আমার ৭৫ বৎসর বয়সে কোনো একজন সংবাদপত্রে মৃত বলে ঘোষণা করায় আমি বিরক্তও হইনি বা বিচলিতও হইনি। আমি সমস্ত জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছি এবং পৃথিবীতে কী ঘটছে তার খবরও রাখা ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো আমার মন এই কৌশলটি গ্রহণ করেছিল। তার ফলে আমি পেয়েছি একটি উদ্বেগহীন জীবন। এবং নব্বই বছর বয়সে পূর্ণ জীবন ভোগ করে আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। আমার অমরত্বের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। আমি কাউকে আর চিনতে পারছি না। অন্যরা আমার পরিচয় ধরে রাখবে তার কী দরকার? এমন একটি উদ্বেগহীন মৃত্যু আমি চাইনি বুঝি।

কিন্তু সেই যুবকটি, যার মৃত্যুর বিষয়ে করা প্রশ্নগুলি আমার মনকে তোলপাড় করেছিল, এই মুহূর্তে সেই যুবকের কথা আমার কেন বার বার মনে পড়ছে? তার করা প্রশ্নগুলির ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য কেন আমার মনে আসছে?

আমার বয়স এখন চৌষট্টি বছর। চৌষট্টি বছরের জন্মদিনটিতে আমি আমার বারান্দায় বসে আছি। আমার স্ত্রী আমার কাছেই। চার বছর আগের ষাট বর্ষীয় জন্মদিনের কথা মনে পড়ছে। সেই দিনটি ধুমধাম করে সর্বজনীন ভাবে পালন করা হয়েছিল।

আমার গুণমুগ্ধরা এখন কেউই আমার পাশে নেই। এই জন্মদিনটি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একান্তভাবে পার হয়েছে। গত চার বছরে আমি কোনো গল্প, উপন্যাস লিখতে পারিনি। লিখতে বসলেই বোমা বিস্ফোরণে মৃত যুবকের ছিন্নভিন্ন দেহটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং আমার সৃষ্টি করা কাহিনীর পৃথিবীটি অলীক ও অদ্ভুত বলে মনে হয়। আমি ক্ষোভ এবং দুঃখে গল্প লেখার পরিবর্তে এই কয়েক বছর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, কঠোর ভাষাতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে সমালোচনা করে আসছি, নিন্দা করে আসছি এবং তাদেরকে অসুর ও দানবের সঙ্গে তুলনা করেছি। আজ বারান্দায় বসে একটি সম্ভাব্য নব্বই বছরের মৃত্যু দিনটিকে নিয়ে আমি মনোরম কল্পনা করেছি। কী নিরাবেগ, নিরুদ্বিগ্ন ও কাম্য মৃত্যু! হ্যাঁ, আমার চৌষট্টি বছরের জন্মদিনে আমার মনের ভিতরে আমার নব্বই বছরের মৃত্যুর দিনটিকে নিয়ে একটি কাল্পনিক কাহিনি সৃষ্টি করেছি। এই কাহিনিটি আমার আগের মনোরম সুখপাঠ্য কাহিনিগুলির মতো নয়। এই কাহিনিটি আমার পাঠকের জন্যও নয়। আমার জন্যই। উদ্বেগের থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই একটি নিরুদ্বেগ কাল্পনিক মৃত্যুর কাহিনি মনের ভিতরেই আমি রচনা করেছি।

বারান্দায় আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে চেয়ারে বসে আছি। আমি অনুমান করছি, সে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'তোমার মুখটি এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? কিছু হয়েছে কি?'

আমি মুখে কোনো কথা বলিনি। শার্টের ওপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে আজ চিঠির বাক্সে কারও রেখে যাওয়া কাগজের টুকরাটা বের করলাম সেখানে একটি মাত্র বাক্য আছে। সেই বাক্যটি দিনের মধ্যে বহুবার পড়েছি। সেখানে কারও নাম নাই। দরকারও নেই। যে লিখেছে সেই জানে আর আমি জানি। সেখানে একটি অমোঘ বিধান নিয়ে একটি সংবাদ আমার কাছে এসেছে, 'আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।' দুদিন আগেও গল্প লিখতে চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়ে আমি উত্যক্ত হয়েছি। ফাঁসিকাষ্ঠে জনসমক্ষে হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে লাগে বলে সেইদিন ক্ষোভে যাদের বিরুদ্ধে আমি নিষ্ফল বিবৃতি দিয়েছিলাম, তারা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

আমার মুখটি নিশ্চয় ইতিমধ্যে মরা মানুষের মুখের মতো হয়েছে। স্ত্রী বিবর্ণ হওয়া বলে ভেবেছে। আমি কাগজের টুকরাটি তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

এক টুকরো সাদা কাগজ। খালি কাগজ। স্ত্রী বিস্মিত হয়ে কাগজের টুকরোটি দেখল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তাকে ভুলে মৃত্যুদাতার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

।। অনুবাদ : তিমির দে ।।

ভালোবাসার অর্থ

ড° পরাগ কুমার ভট্টাচার্য

ভালোবাসার একটা মাত্রা থাকা উচিত। অনাদির প্রতি যজ্ঞচরণের সেই ভালোবাসা আজও শেষ হয়নি। দাদা দিব্যনাথ বারান্দায় বসেছিলেন। পেছন থেকে যজ্ঞচরণ দাদা শুনতে না পাবার মতো আস্তে করে ডাকল অনাদি, অনাদি। অনাদি ঘুরে তাকিয়ে কাকা যজ্ঞচরণকে দেখতে পেয়ে ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল। বারান্দায় হুঁকো খেতে থাকা দিব্যনাথ এসবের কিছুই জানতে পারল না। সে আপনমনে হুঁকো টানাতেই ব্যস্ত।

অনাদির হাত ধরে যজ্ঞচরণ পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সারাটা দিন অনাদির সঙ্গে এর বাড়ি ঘুরে ফলমূল খাওয়া, বড়শির টোপ জোগার করা, সুবিধে বুঝে মধু পেড়ে খাওয়া, বাঁদরকে খ্যাপানো ইত্যাদি সমস্ত কাজেই যজ্ঞচরণের ডানহাত ছিল অনাদি। গ্রামের মানুষ এই নিয়ে দিব্যনাথের কাছে নালিশ করে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে দিব্যনাথ কাকা ভাতিজাকে খুঁজে বেড়ায়। হাতের কাছে পেলে ভলোভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

বিকেলে এসে দুজনেই বারান্দায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওত পেতে থাকা দিব্যনাথ যজ্ঞচরণের হাত থেকে অনাদিকে কেড়ে এনে গুম গুম করে দুটো কিল বসিয়ে দিল, যজ্ঞচরণ দাদা দাদা বলে চিৎকার করে উঠল। অনাদিকে ছেড়ে দিয়ে দিব্যনাথ হাতে লাঠি নিয়ে যজ্ঞচরণের পেছন পেছন ধাওয়া করল। যজ্ঞচরণ পালাল না। দাদার মারের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। পিঠে একটা আঘাত বসিয়ে দিয়ে দিব্যনাথ বিড়বিড় করতে লাগল — মা মরা মেয়েটাকে এভাবে সঙ্গে নিয়ে সারাটা দিন টো টো করে পুকুর পারে, নদীর পারে ঘুরে বেড়াস। রাতের বেলা ভূত প্রেতের উৎপাতে থাকতে পারবি না। সারাটা রাত স্বপ্ন দেখে চিৎকার করবে। তুই মেয়েটার সর্বনাশ করে ছাড়বি।

স্বগতোক্তির মতো দিব্যনাথ অনেকক্ষণ একা একা কথা বলতে থাকে। দিব্যনাথ এখন নিজেই নিজের সঙ্গী। অনাদিকে ছোট রেখেই তার মা মরেছে। যজ্ঞচরণ এদিকে

ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়। অনাদিও তার কথা শুনতে চায় না। সে কার সঙ্গে কথা বলবে। তাই নিজেকেই প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়ে থাকে। দিব্যনাথ নিজের সঙ্গে এভাবে কথা বলে শান্তি লাভ করে। অনাদিকে দিব্যনাথের চেয়ে যজ্ঞচরণ বেশি ভালোবাসে। শৈশব থেকেই যজ্ঞচরণ অনাদিকে তার মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে অনাদির সমস্ত কিছুরই তদারকি করেছে। অনাদি কষ্ট পাবে ভেবে দিব্যনাথ যজ্ঞচরণকে মাঠের কাজেও নিয়ে যায় না। যজ্ঞচরণও অনাদিকে খাওয়ানো দাওয়ানো, গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো এ সমস্ত করেই সময় কাটিয়ে দেয়। দাদা তাকে মাঝে মধ্যে কাজ কর্মের কথা বললেও সে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। তার কেবল একটা কাজেই গভীর মনোযোগ — অনাদির যত্ন নেওয়া। সেই অনাদি আজ দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। তার প্রতিটি পরিক্রমা যজ্ঞচরণের চোখের সামনেই অতিক্রান্ত হয়ে এখন সে নয় দশ বছরে পা রেখেছে। কিন্তু যজ্ঞচরণের কাছে সে শিশুমাত্র। এখনও যজ্ঞচরণ তাকে কোলে নিয়ে ভাত খাইয়ে না দিলে খেতে চায় না। তার খেলার একমাত্র সহচারও তার কাকু। তাকে সঙ্গে নিয়ে সারা দিন সে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এই নিয়ে দাদা-ভাইয়ের মধ্যে যখনই ঝগড়া রূপ লাভ করে যজ্ঞচরণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। প্রতিবেশী পরশু হয়ে উঠে তার সঙ্গী। মনের দুঃখের কথা খুলে বলতে গিয়ে অনাদির কাছে সে কেঁদে ফেলে। পরশু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার আড্ডায় নিয়ে যায়। পরশু, বৃন্দে এবং পাকা চোর হেমোর আড্ডা। রাত দুপুর পর্যন্ত সেখানে গাঁজার আড্ডা চলে। যজ্ঞচরণ গাঁজার আড্ডায় যোগ দেয়। পরশু তাকে গাঁজা খাবার আদব কায়দা শিখিয়ে দেয়।

যজ্ঞচরণের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এখন ঝগড়া হলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। গাঁজা খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের বাড়ি ঘুরে খাবার চেয়ে খায়। দাদা দিব্যনাথ ভাত দেয় না বলে মানুষের কাছে অভিযোগ করে। গাঁজার নেশায় কখনও 'মা অনাদি মা' বলে চিৎকার করে উঠে।

অনাদি দৌড়ে এসে তার গালে মুখে হাত বুলোয়। সে তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। হঠাৎ সে চোখ মেলে তাকায়। যজ্ঞচরণ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। সকালবেলা নেশা কেটে গেলে দেখতে পায় কারও গোয়ালঘরে শুয়ে রয়েছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে পাশেই পরশুদের বাছুরটা। মাঝে মধ্যেই তার গাল চেটে দিচ্ছে। লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো যজ্ঞচরণ বাড়ি ফিরে আসে। দিব্যনাথ বারান্দায় মুখ গুমড়ো করে বসেছিল। যজ্ঞচরণ দাদার মারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য

পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে একেবারে অনাদির কাছে এসে হাজির হয়।

দিব্যনাথ পুনরায় স্বগতোক্তি করার মতো বলতে থাকে — অনাদি গতকাল থেকে কিছুই খায়নি। একবার তার কথা তো ভাবা উচিত। যজ্ঞচরণ আর থাকতে পারল না। অনাদি, অনাদি করে চিৎকার করে সে ভেতরে ঢুকে গেল। দেখে অনাদি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। একলাফে যজ্ঞচরণ তাকে কোলে তুলে নিল। অনাদি জেগে ওঠে কাকাকে দেখতে পেয়ে তাঁর কপালে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তাঁর শুকনো দুটো ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। যজ্ঞচরণ যার খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তাকে হাতের মুঠিতে পেয়ে আত্মহারা হয়ে পড়ল। তার হাত ধরে অনাদি বলল — 'তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেও না কাকু।'

যজ্ঞচরণের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে। সে বেল ওঠে — 'না যাব না, মা আমার, আমি তোকে ছেড়ে যাব না।' দিব্যনাথ সেদিন নিশ্চিন্তমনে মাঠের চাষবাসের কাজে বেরিয়ে যায়। আসলে মাঠে থাকতে সে ভালোবাসে। চাষবাসে লেগে থেকে সে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে। মাঠের ফসল, সেও তো অনাদির মতোই। অজস্র অনাদির মধ্যে দিব্যনাথ স্ত্রীকে ভুলে যায়। অনাদি যে ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে কাকার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছে সেটাও ভুলে থাকে। যজ্ঞচরণ মাঠের প্রেমে ধরা দিল না। কতদিন তাকে জোর করে মাঠে নিয়ে এসেছে। দাদাকে না জানিয়েই যজ্ঞচরণ চুপিচুপি সেখান থেকে কেটে পড়ে। যৌবনে পা রাখলে কী হবে এখনও মতিগতি অনাদির মতোই। শিশুমতি। গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা তাকে নিয়ে মজা করে। মূর্খ যজ্ঞচরণ কিছুই বুঝতে পারে না।

দাদা তাকে কঠিয়াতলিতে পাঠিয়েছিল। সঙ্গে সে অনাদিকেও নিতে চেয়েছিল কিন্তু দাদার এক ধমকে সে মত বদলাতে বাধ্য হয়। কঠিয়াতলিতে গিয়ে দেখে অশ্বত্থ গাছের নিচে অনেক মানুষের সমাগম। গাছের নিচে বিশাল সিংহাসন পেতে বাবা গিরিধারী মহারাজ বসে রয়েছেন। বাবা কথা কম বলেন। চেলা দুইজনের মতে হিমালয়ের পাদদেশে তাঁর বসবাস। মানব দর্শনের জন্য সেখান থেকে পদব্রজে এসেছেন। একজন চেলা বিশাল এক রসিদ বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে হিসেব করে চলেছে। একজন পাতায় করে গাঁজা বিতরণ করে চলেছে। গ্রামের পরশুরা ধুনি জ্বালাচ্ছে।

গ্রামের প্রায় সব যুবক ছেলেরাই বাবাকে মাঝখানে রেখে চক্রাকারে বসে রয়েছে। যজ্ঞচরণ দ্রুতপায়ে বাবার পাশে গিয়ে উপস্থিত হল এবং ভক্তদের শেষের সারিতে বসে পড়ল। একের পর এক হাত বদল হয়ে গাঁজার ছিলিম যজ্ঞচরণের কাছে পৌছাল। যজ্ঞচরণ ছিলিম ফিরিয়ে দিল। মা অনাদির কাছে সে শপথ করেছে এই সমস্ত খারাপ

জিনিস সে আর স্পর্শ করবে না। বাবা ইতিমধ্যে চোখ মেলেছেন। অশ্বত্থ গাছের নিচে থেকে উদাত্ত আহ্বান ভেসে এল — 'পিয়ো বাচ্চা পিয়ো। অ্যা অমৃত হ্যায়। সংসার এক ভয়ানক যাত্রা হ্যায়। হা পিলে বাবা। সব আসান হো জায়গা।

কাঁপা কাঁপা হাতে যজ্ঞচরণ গাঁজার ছিলিম হাতে তুলে নেয়। ব্যোম ভোলা বলে ভগবানের চিন্তা করতে করতে ছিলিমে টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফটফট শব্দ হতে শুরু করে। ধোঁয়ায় সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার শিক্ষাগুরু পরশুও যজ্ঞচরণের এই কৃতিত্বে চমকে যায়। এই অবোধ বালকের দিকে ততক্ষণে বাবার চোখ পড়েছে। বাবা তার আসন থেকে ডেকে পাঠালেন — 'বাচ্চা মেরা সামনে আও।' যজ্ঞচরণ বাবার চরণে লুটিয়ে পড়ে। বাবা তাকে স্পর্শ করেন। তার সমগ্র শরীর মন মুক্তির আকাঙক্ষায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। পাগলের মতো বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে সে চিৎকার করে ওঠে — 'আমাকে মুক্তি দিন বাবা।'

বাবা বললেন — 'সব ঠিক হো জায়গা। হাম হ্যায়না তেরা পাস।' বাড়ি ফিরে আসার পরে যজ্ঞচরণকে প্রহার করা হল। দাদা কখন যে বেতের লাঠি নিয়ে এসে তার পিঠে দুয়েক বসিয়ে দিল তা সে ভালো করে বুঝে উঠতেই পারল না। মার খেয়ে তাঁর হুঁশ ফিরে এল। দাদা তাকে মেরে শেষে নিজেই কাঁদতে শুরু করল আর বলতে লাগল — 'তুই কতদিন আর আমাকে এভাবে জ্বালাবি। তুই কী করতে চাস। কঠিয়াতলি গিয়ে সেখান থেকে পাগলের মতো ফিরে এলি। দরজাটাও বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিস। সমস্ত বীজধান যে গরু খেয়ে ফেলল সেই সম্পর্কে তোর কোনো চিন্তা ভাবনা আছে?

অনাদি দৌড়ে এসে চিৎকার করতে লাগল। দিব্যনাথ লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিতে যেতেই সে বাবার হাত ছাড়িয়ে কাকুকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। যজ্ঞচরণ তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেতে লাগল। দিব্যনাথ চিৎকার করে বলতে লাগল — 'তুই মর। তুই মর। তোর মতো ভাই আমার চাই না।'

যজ্ঞচরণকে সবাই মৃত বলে ধরে নিল। কারণ দুদিন ধরে সে বাড়ি ফিরেনি। কেউ বলল পুকুরে মরে পড়ে রয়েছে। পুকুরে জাল ফেলে দেখতে হবে। ভবকান্ত গণক গণনা করে ঈশাণ কোণের দিকে নির্দেশ করলেন। সেদিকেই সে অদৃশ্য হয়েছে। হ্যাঁ, পুকুরটাও ঈশাণ কোনেই অবস্থিত। জানকি বুড়ি কড়ি চালান দিয়ে জানাল যজ্ঞচরণ গাছে উঠে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। সকলেই যখন পুকুরের দিকেই নির্দেশ করলেন, গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ যজ্ঞচরণের খোঁজে পুকুরটা একেবারে তচনচ করে ফেলল।

বিকেলে যজ্ঞচরণের হদিশ পাওয়া গেল। কিন্তু পুকুরে নয়। যজ্ঞচরণ বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। বিবেকানন্দ মাস্টার স্কুল থেকে ফেরার সময় বাবার চেলাদের সঙ্গে তাকেও দেখতে পেয়েছে।

যজ্ঞচরণ এখন বাবার চেলা। পথ চলার সময় পায়ে কাঁটা বেঁধার অজুহাতে যজ্ঞচরণ একটা গাছের নিচে বসে পড়ল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেখানে বসে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মা আমার অনাদি মা বলে সেই যে কান্না জুড়ে দিল তা আর কিছুতেই থামতে চায় না। শেষ পর্যন্ত চেলারাও বাবার মতোই তাকে বোঝাতে লাগল। এ সবই মায়া, ভ্রম। মন স্থির কর। দিব্যনাথ তোকে আবার তাড়িয়ে দেবে। অনাদি কাল পরশু কারও বাড়ি বিয়ে হয়ে চলে যাবে। তোর কে আছে। একমাত্র বাবা ছাড়া। বাবা গিরিধারী মহারাজ।

গিরিধারী মহারাজ তার দিকে আড়চোখে তাকালেন। বাবা তার কপালে হাত রেখে বললেন — বিষয়ের নাম নিও না। তুমহারা অনাদি বিষয় হ্যায়। মুক্তি কা লিয়ে বিষয় কো ছোড়না হোগা।

— না বাবা আমি অনাদিকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কাকুতি মিনতি করে যজ্ঞচরণ বাবার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

— এই সমস্তই তোর মায়া, ভ্রম যজ্ঞচরণ। দিব্যনাথ তোকে পুনরায় তাড়িয়ে দেবে। অনাদির সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তোকে আবার মারধোর করবে। একজন চেলা তাকে কোনোভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করল।

এর কিছুদিন পরে যজ্ঞচরণ সশরীরে এসে উপস্থিত হল। সে কেবল একা নয়। সমস্ত পার্টিটা, একেবারে সমানের দিকে সাধু বাবা, পেছনে পুলিশ। সাধুবাবার দীর্ঘ ঝোলার ভেতর থেকে বেরিয়েছে গাঁজা, হেরোইন এবং অন্যান্য অলংকার। সাধুবাবা বেরিয়ে যাবার পরেই গ্রামের দুই একটি বাড়ি থেকে জিনিস পত্র উধাও হতে শুরু করেছিল। গ্রামে চোরের প্রাদুর্ভাব মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। সাধুবাবা যজ্ঞের দ্বারা গ্রামের সমস্ত অমঙ্গল উপদ্রব দূর করবেন বলেছিলেন। কিন্তু সাধুবাবা নিজেই পুলিশের জালে পড়লেন। সঙ্গে নিরপরাধ যজ্ঞচরণ।

পুলিশের হাতে পায়ে ধরে যজ্ঞচরণ কোনোভাবে নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল — 'মা আমার অনাদি মা, একবার দেখা দে মা।' দিব্যনাথ বেরিয়ে এসে ভাইকে দেখে দরজা বন্ধ করে দিল। অনাদিকে কোনোমতেই বাইরে বেরোতে দিল না। পুলিশকে বলল — 'এই নরাধমকে নিয়ে যাও। এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

পুলিশ তাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। ক্রোধে উন্মত্ত একজন পুলিশ তার হাঁটুর নিচে লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল দোষ করে এখন আবার কাঁদছিস। চল থানায় নিয়ে গিয়ে কিছু উত্তম মধ্যম দিলেই সমস্ত লুকোনো কথা বেরিয়ে পড়বে। গ্রামের সবাই যজ্ঞচরণকে দেখার জন্য বেরিয়ে এল। কয়েকজন বলাবলি করল — ছেলেটি আসলে খারাপ নয়। সঙ্গদোষে খারাপ হয়েছে।

এই ধরনের মন্তব্য কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল না। পুলিশ সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। এটা একটি সর্বভারতীয় ঠগের দল। স্থানীয় ছেলেদের হাত করে নিয়ে এরা অঞ্চলে দুষ্কার্য করে বেড়ায়। যজ্ঞচরণকে অবশ্য তারা কোনো আপত্তিকর কাজে লাগানোর সুযোগ পায়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে কাজে লাগানো যাবে ভেবেই তাকে দলে সামিল করতে চেয়েছিল।

যজ্ঞচরণকে ধরে নিয়ে যাবার দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। ভাইকে ধরে নিয়ে যাবার পরে দিব্যনাথ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যজ্ঞচরণের খোঁজ করতে লাগল। মাঠের কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে ভাইকে খুঁজে বেড়ায়। অনেকেই তাকে থানায় গিয়ে যজ্ঞচরণকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছিল। অনেকদিন পরে সে থানায় গিয়ে খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছিল ভাইকে ইতিমধ্যে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেই প্রকৃতপক্ষে দিব্যনাথের যেন হুঁশ ফিরে এল। একদিন ভাইকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল বলে আজ সে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল। কাকুর আসার পথ চেয়ে থাকতে থাকতে দশ দিনের দিন অনাদি অসুস্থ হয়ে পড়ল। শেষের দিকে কাপড়ের স্তূপে, ঘরের কোণে কাকুর খোঁজে হাহাকার করে বেড়াতে লাগল। দিব্যনাথ নিজের চোখে আর এই অসহনীয় দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। অনাদির তাড়নায় দিব্যনাথ শেষপর্যন্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাইয়ের খোঁজ করতে লাগল। এর কিছুদিন পরে অনাদি দিব্যনাথকে কাঁদিয়ে ইহসংসারের মায়া ত্যাগ করল।

দিনের পর দিন দিব্যনাথ যজ্ঞচরণের খোঁজে হাহাকার করে বেড়াতে লাগল। গ্রামের মানুষ তাঁর দুঃখে দুঃখী হলেও তাকে সাহায্য করার যে কোনো পথই তাদের জানা নেই। যজ্ঞচরণ কোথায় আছে তা কেউ জানে না। অবশেষে গ্রামেরই নতুন উকিল সর্বানন্দ জানাল যে যজ্ঞচরণ জেল থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। তবে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

যজ্ঞচরণ বেশিদিন রহস্যে আবৃত হয়ে রইল না। দিনের আলোর মতোই যজ্ঞচরণ পুনরায় ঝলমল করে উঠল। হাতি ঘোড়া নিয়ে রাজার ফিরে আসার মতোই যজ্ঞচরণ ফিরে এসেছে। বহুদিন কোনো একজন ধনী ব্যক্তির আশ্রয়ে ছিল। তারপর সেই

মানুষটিই তাকে বোঝাতে লাগল — সংসারে মানুষ কেবল ভালোবাসার ব্যবসা করেই থাকতে পারে না। অর্থের ব্যবসাই হল প্রকৃত ব্যবসা। অনাদিকে ভালোবাসার মতো একটা অন্তর থাকলেই হবে না, অর্থও থাকতে হবে। তুই প্রথমে মানুষ হয়ে ওঠ। পরে অনাদিকে সুখি করতে পারবি। এভাবে স্রোতে ভেসে বেড়ালে চলবে না। সেই মানুষটিই তাকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয়। যজ্ঞচরণ গ্রামে প্রবেশ করার পর অনেকেই অবশ্য তাকে চিনতে পারেনি। পরে চিনতে পেরে তার পেছনে মানুষের স্রোত বয়ে চলল। সে কাউকে কিছু না বলে বাড়ির দরজার সামনে এসে উপস্থিত হল। দরজার সামনে থেকেই সে চিৎকার করতে লাগল — 'অনাদি মা, অনাদি মা।'

দাদা দিব্যনাথ অস্থিচর্মসার হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সে উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। যজ্ঞচরণ দাদার একটা হাত ধরে ছোট ছেলের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

— দাদা আমার অনাদি মা কোথায়? এই দেখ্ আমি অনাদি মায়ের জন্য কতকিছু নিয়ে এসেছি। যজ্ঞচরণ অলংকার আর কাপড়ের বাক্স দুটো খুলতে যেতেই দিব্যনাথ হাত দিয়ে বাধা দিল। বাগানের এক কোণে হাতের ইশারা করে দিব্যনাথ যজ্ঞচরণের কোলে ঢলে পড়ল। যজ্ঞচরণ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল — অর্থ নয়, অন্তরটাই সত্য। মাকে ছেড়ে আমার অর্থের পেছনে দৌড়ানো ঠিক হয়নি।

যজ্ঞচরণ এখনও গ্রামে আসে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। দীর্ঘ চুল দাড়িতে তাকে যাত্রা পার্টির অভিনেতার মতো মনে হয়। দাদা একদিন আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দেওয়া অনাদির সমাধিক্ষেত্রে সারাটা দিন বসে থেকে বিকেলে কোথায় যেন চলে যায়। ভালোবাসার একটা মাত্রা থাকা উচিত। সমগ্র বিশ্বকে একপাশে সরিয়ে রেখে সে যেন কেবল অনাদির স্মৃতির কাছে দাঁড়িয়ে জীবনের গূঢ়ার্থ বোঝার চেষ্টা করছে। এভাবেই সে সযত্নে পালন করে চলেছে একজনের প্রতি প্রেম।

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

ব্যর্থ প্রয়াস

পরমানন্দ রাজবংশী

বসিরুদ্দিন অবশিষ্ট বান্দরছাপ বিড়ির টুকরোটি ছুড়ে ফেলে দিল। বাসের সিটে বসে তার বেশ ভালো লাগছে। পিছনদিকে একটু হেলান দিয়ে বসলে বেশ আরাম হয়। তন্দ্রায় ঘুম চলে আসে।

সে এর আগেও বাসে উঠেছিল। কিন্তু খারুপেটিয়া পর্যন্ত নিজের ঘর থেকে হেঁটে মঙ্গলদৈ শহর পর্যন্ত যাতায়ত করা লাইন বাসগুলির অবস্থা অনেকটা রোগক্লিষ্ট মরতে বসা বুড়া হালের মতোন। বসিরুদ্দিন এই প্রথম গুয়াহাটি যাবে বলে বাসে উঠেছে। কোনো দিনও দেখেনি অথচ সব সময় শোনা সেই স্বপ্নপুরি গুয়াহাটি আজ সে দেখবে। ঘরে ফিরে আসার সময় হাফিজ তাকে দেড়কুরি টাকা দেবে। দুপুরবেলা ভাত তো খাওয়াবে। যতবার খুশি চা খেতে পারবে। শুধু লাইনে দাঁড়িয়ে মাত্র শহরের অলি গলি ঘুরতে হবে। এক ঘণ্টা মাত্র সভায় বসে থাকতে হবে। ব্যস!

ঘর-দোর, গাছপালা পাহাড় করিম মোল্লার ঘরটির মতো সব কিছু পিছনে ফেলে দৌড়াচ্ছে। বসিরুদ্দিনের সামনে বসে থাকা তমিজুর নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। যা প্রকাণ্ড সুন্দর নতুন বাস! বসার সিটগুলি যেন খারুপেটিয়া শহরের মারোয়ারির বসে থাকা গদি। ফাতেমাকেও সঙ্গে নিয়ে এলে ভালো হত। ওরও গুয়াহাটি দেখার প্রবল ইচ্ছা। পেটের অসুখের জন্য সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। ও এলে তিনিকুড়ি টাকা পেত। হাফিজ জোর করেছিল। কিন্তু গত দুদিন ধরে পেটের ব্যাথা ওকে বেশ কষ্ট দিয়েছে বলে আনা হল না।

আগে মকবুলকে কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। খোদা আল্লাই দোয়া করলে ও গুয়াহাটি কেন, দিল্লি, বোম্বাই দেখতে পারবে। ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পারে তাহলে কী জানি হয় তো একদিন মক্কাও!

তমিজুরের মাথাটি হঠাৎ তার কাঁধে ধাক্কা মারে। বসিরুদ্দিন ঘুমে ঢলে পরা তমিজুরের মাথাটি সোজা করে দেয়।

মোট এক হাজার টাকা হতে আর মাত্র ত্রিশ টাকা বাকি। আজ যদি দেড়কুরি

টাকা পায় তাহলে আরও দু শ লাগবে। হাফিজ বার বার সাবধান করে দিয়ে বলেছে গুয়াহাটিতে যদি কেউ টাকার কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে আড়াইকুড়ি টাকা পেয়েছে বলে বলবে। আড়াইকুড়ি পেলে তো কথাই ছিল না। তাহলে মাত্র একশ চারকুড়ি টাকার চিন্তা করত। বসিরুদ্দিন বাইরে তাকিয়ে দেখল আজ আকাশ পরিষ্কার। শুধু নীল আর নীল। সেজন্য রোদটি বেশ কড়া।

যেদিন থেকে মকবুল মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করার খবরটি পেয়েছে সেদিন থেকে বসিরুদ্দিনের দুচোখে ঘুম নেই। খারুপেটিয়া শহর থেকে পাশ করা খবরটি দিতে আসা মকবুলের মাস্টারকে বসিরুদ্দিনের কেমন যেন সেদিন পয়গম্বর বলে মনে হয়েছিল। খবরটি অরণ্যবহ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে। দু-তিন দিন ধরে বসিরুদ্দিনের ঘরে মানুষে মানুষ। চর অঞ্চলের গ্রামের ছেলে, তাতে আবার বসিরুদ্দিনের মতো হতরিদ্র ঘরের ছেলে মেট্রিক পাশ করছে। সুদূর খারুপেটিয়া পর্যন্ত নৌকায় উঠে এবং প্রায় পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়া মকবুল গোটা অঞ্চলের মধ্যে প্রথম মেট্রিক পাশ করা ছেলে। তাতে দ্বিতীয় বিভাগে। ঘরে আসা মানুষগুলি মকবুলকে আশীর্বাদ করে বসিরুদ্দিন ও ফাতেমাকে ভাগ্যবান বলে মন্তব্য করে।

বসিরুদ্দিন ও ফাতেমার দুচোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়েছিল আনন্দে। পাটের দড়ি লাগানো হাফপেন্ট তাও তালি-টাপ্পি দেওয়া ও একটি মাত্র শার্ট পরে, কখনও আধপেট কখনও বা না খেয়েই স্কুলে আসা যাওয়া করা ছেলেটি এত বড়ো ভালো কাজ করবে বলে বসিরুদ্দিন ফাতেমা কখনও ভেবেছিল? বরঞ্চ আউস, আমন শালিধান অথবা মরাপাট আধা ঝেড়ে স্কুলে পালিয়ে যাওয়া মকবুলকে বসিরুদ্দিন গালিই দিয়েছিল। ধমকি দিয়েছিল। দু একদিন হাতও উঠিয়েছিল। মিঞার বাদশাহকে হাকিম হতে হবে না। নিজের মতো বানাতে চেয়েছিল। বসিরুদ্দিনের গালি-গালাজ, শারীরিক নির্যাতনে মকবুল নীরবে চোখের জল ফেলেছিল। তাকে না জানিয়েই মা ফাতেমা লুকিয়ে চুরিয়ে খারুপেটিয়া স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল। বসিরুদ্দিন বুঝতে পারেনি তা নয়, পেরেছিল। কিন্তু নিজের সন্তানকে আর কত গালি-গালাজ করা যায়।

আকাশের হালকা সাদা মেঘের টুকরোগুলি যেন পিছনে দৌড়ে পালাচ্ছে। কোনো দুষ্ট ছেলে যেন নাল আকাশে দুধ ছিটিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ঝলসানো রোদ বসিরুদ্দিনের গায়ে পড়ে। জানালার পাশের সিটে বসার জন্য হয়তো রোদের উত্তাপ অনুভব করেনি। হুড়হুড় করে বাতাস তার গাল ও মুখে আঘাত করেছে। মাঝে মাঝে তার অসংলগ্ন লম্বা দাড়ি ঠিক করে নেয়। এই তামিজ কি রাতের বেলা কারও বাড়িতে শিদ কাটতে গিয়েছিল! ও দেখি ঘুমে একেবারে কাদা ও বলতেই পারে না গাড়ি কখন

মঙ্গলদৈ, চিপাঝাড় পার হয়ে এখন বাইহাটা চারআলি পাবে।

আজ তিন চার দিন ধরে একনাগাড়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হওয়ার জন্য সামনের প্রান্তগুলিতে জল থৈ থৈ করছে। সকাল বেলাও একঝাক বৃষ্টি হয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বন্যা হবে। কিন্তু বর্ষার মাস কয়টি চর অঞ্চলে বন্যা বলে কোনো আলাদা পর্ব নেই। নৌকা, ভেলার উপরই তাদের জীবন নির্ভর। শুধু বন্যা বেশি হলে বাঁধের উপরে নতুবা খারুপেটিয়া কোনো শিবিরে আশ্রয় নেয়। এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও যে তাদের ছেলে মেট্রিক পাশ করেছে! সুতরাং তাকে মঙ্গলদৈ শহরে রেখে পড়াতেই হবে কিছুটা পড়ার সুবিধা করে দিলেই সে ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলিতে ভালো ফল করবে। এভাবেই হয়তো সে একদিন স্বপ্নের অগোচরে হাকিম-মুন্সিফ হয়ে যাবে!

বসিরুদ্দিন এদিক সেদিক দেখল। না, তার দিকে কেউ লক্ষ করেনি। সে সামনের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুকে লুঙ্গির একটি প্রান্ত দিয়ে লাউডগা সাপের মতো গালে নেমে আসা আনন্দ আশ্রুটুকু মুছে নিল।

মকবুলের স্কুলের হেডমাস্টার বসিরুদ্দিনকে ডেকে পাঠানোয় সে গিয়েছিল। ভয় সংকোচ-গৌরবে বসিরুদ্দিন কার্যালয়ে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে ঢুকেছিল। হেডমাস্টার হলধর কলিতা বসিরুদ্দিনের হাতে দুশ টাকা গুজে দিয়ে বলেছিল তাকে মঙ্গলদৈ ও ভাড়া ঘরে রেখে হলেও পড়াতে পড়ার তার প্রবল ইচ্ছা। একদিন সে বড়ো মানুষ হবেই। আমার তরফ থেকে এই দুশো টাকা দিলাম। কলেজ ভর্তি করতে, শার্ট পেন্ট, বিছানা পত্র ইত্যাদি কেনা কাটিতে কমেও এক হাজার টাকা লাগবে। বাকিটুকু তুমি কোনো প্রকারে জোগাড় করো।

সেদিন টাকা দু শ ফাতেমার হাতে দিয়ে বসিরুদ্দিন তার সঙ্গে আলোচনা করেছিল। বাকি আট শ টাকা কী ভাবে জোগার করা যায়? এমন সময় মকবুল ওদের আলোচনায় অংশ দিয়ে বলল সে নিজের চেষ্টায় দু শ টাকা জোগাড় করবে। কলেজে ভর্তি হতে এখনও বিশদিন বাকি আছে। এই কয়দিন সে দিন হাজিরা করবে। ফাতেমা বসিরুদ্দিন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার দৃঢ়তা দেখে। ফাতেমাও দিন হাজিরা করবে বলে মত প্রকাশ করাতে বসিরুদ্দিন ধমক দিয়েছিল। সে জীবিত থাকতে তার মতো একজন পেটরোগীর দিন হাজিরা না করলেও চলবে।

বাকি ছয় শ টাকার চিন্তায় বসিরুদ্দিন অধিক পরিশ্রম করতে লাগল। বাপ-বেটার অবস্থা দেখে ফাতেমা শঙ্কিত হল। ছেলেকে শুধু পড়ানোর জন্যই যদি এত কষ্ট করতে হয় তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে?

মকবুল কলেজে পড়তে শহরে গেলে মানুষটির একা উপার্জন করতে হবে। এভাবে কষ্ট করলে দেখি মানুষটি অকালে অসুস্থ হয়ে পড়বে। কথাটি বসিরুদ্দিনকে বলাতে সে রাগে গর্জন করে ওঠে। আরে বসিরের এই কর্মই দুহাত যতদিন আছে ততদিন অযথা চিন্তা না করলেও চলবে! সে তার ছেলেকে পড়িয়ে বড়ো মানুষ করবেই। বসিরুদ্দিনের কথায় জোর থাকায় ফাতেমা সেদিন নিশ্চুপ ছিল। ইতিমধ্যে ছয়কুড়ি টাকা এক জায়গায় হয়েছে বাপ বেটার দিন হাজিরার ফলে। দিদারুদ্দিন মহাজন দেড়শ টাকা দেবে বলে বলেছে। শুধু বসিরুদ্দিনের পাঁচ কাঠা মাটির দুকাঠা মরাপাটগুলি তাকে দিলেই হবে। সে রাজি হয়েছে। দুদিন পরেই হাফিজ তার কাছে এল। সে গুয়াহাটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বসিরুদ্দিনের সঙ্গ ধরে। খাওয়া-দাওয়ার পরেও দেড়কুড়ি টাকা দেবে। বিনা পয়সায় গুয়াহাটি দেখার উপর খেতেও পারবে। এবং তার সঙ্গে পাবে দেড়কুড়ি টাকা! বসিরুদ্দিন তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। ওদের গ্রামের প্রায় দুকুড়ির মতোন মানুষ যাবে। হাফিজ শহরে থাকে। মাঝে মধ্যে মিছিল মিটিং হয় যার জন্য মানুষ নিতে অথবা ইলেকশনে ছাপ মারার জন্য সে তাদের কাছে আসে।

হাফিজের থেকে দেড়কুড়ি টাকা পেলে এক হাজার টাকা হতে তার মাত্র দু শ ত্রিশ টকার প্রয়োজন।

অইটাই কি ব্রহ্মপুত্রের ব্রিজ?

তমিজুরের ডাকে বসিরুদ্দিন যেন চমকে উঠল। বিশাল একটি নদীর উপরে বাসটি ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। লোহার রেলিংগুলি পিছন দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ এটাই এতদিনের শোনো বিখ্যাত শরাইঘাটের ব্রিজ!

বসিরুদ্দিন তমিজুরের প্রশ্নোত্তরে মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিল।

গাড়ির ভিতরে ড্রাইভারের সামনে দাঁড়িয়ে হাফিজ। সবাইকে নামতে হবে। একজন একজন করে যেন নামে। বাসের সবাই যাতে একসঙ্গে থাকে। হাফিজের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন অন্য কোথায় না যায়। প্রথমে গুয়াহাটির রাজপথে মিছিল হবে। শান্তি সম্প্রীতির। ডি.সি কে স্মরকপত্র দেওয়ার পরই একটি সভা হবে। সেখানে নেতারা ভাষণ দেবেন তারপর খাওয়া দাওয়া করে গাড়িতে উঠতে হবে।

গাড়িটি মহানগরের মধ্যবর্তী জর্জফিল্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। হাফিজের কথা মতো গাড়ি থেকে লোকগুলি নামে। বসিরুদ্দিন নেমে দেখে মাঠটিতে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। যেন মানুষের বন্যা। মাইকের ঘোষণা মতে মানুষগুলি একজন আরেকজনের পিছনে শারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। বসিরুদ্দিনও তমিজুরের

পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাফিজ মোটা কাগজে আঁকিবুকি কিছু লেখা একটি ফেস্টুন বসিরুদ্দিনের হাতে দিল। সে হাফিজের শিখিয়ে দেওয়া বুলি চিৎকার করে বলতে লাগল। ওদের চিৎকার শুনে বাকিরাও তার স্বরে চিৎকার লাগাল। অনেকটা যেন ওদের গ্রামের জঙ্গলে থাকা শিয়াল-কুকুরের মতো। চিৎকারী চিৎকার করতে থাকুক। খেতে না পেলেও কোনো কথা নেই। শুধু দের কুড়ি টাকা পেলেই হল। হঠাৎ সম্মুখে গণ্ডগোল শুনে বসিরুদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘাড় তুলে বার বার দেখে একটু দূরে অফিস ঘরের সামনে মানুষগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে পিছনের মানুষগুলি ঘিরে থাকায় সারিগুলি অসলগ্ন হয়ে গেছ। গাড়ি মটরসহ যানবাহানগুলি বন্ধ হয়ে গেছে।

তার পর কী হল কে জানে! মানুষগুলির চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। একটা সময় মানুষগুলি যে যেদিকে পারে দৌড়াতে শুরু করে। কোনো একজন বসিরুদ্দিনকে হঠাৎ ধাক্কা মারে। বসিরুদ্দিন সেই জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। অতি কষ্টে উঠার চেষ্টা করার সময় দেখে পুলিশ সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই বেঘোরে মারছে। গায়ের উপর দিয়ে বহু লোক তাকে পিষে চলে গেছে। এমন সময় একজন বন্দুকধারী পুলিশ ওর যে হাতে ফেস্টুন ধরে ছিল সেই হাতে বন্দুকের নল দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে তাকে বিশ্রী ভাবে বলল — এই মিঞা ভাগ যাও, ভাগ যাও।

অসহ্য যন্ত্রণায় বসিরুদ্দিন চিৎকার করে উঠে। ও মরলাম গো মকবুলের মা।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে বসিরুদ্দিন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখে সে একটি বিছানার উপর শুয়ে আছে। সামনে ফাতেমা চোখ ছল ছল করে বসে আছে। মকবুল কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

বসিরুদ্দিনের সব কথা মনে পড়ল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথার বালিশের কাছে সব ঔষধ পত্র জল বাটি গ্লাস।

ফাতেমার চোখের দিকে বসিরুদ্দিন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। অর্থাৎ ওরা কী ভাবে এল? এত ঔষধপত্র কীভাবে এনেছে?

মকবুল সামনে এগিয়ে এল। তুমি ভালো হয়ে উঠ আব্বা। আমি এ বছর কলেজে ভর্তি হব না। পরের বছর হব। তুমি কোনো চিন্তা করো না।

ফাতেমা ফুঁপিয়ে উঠে।

বসিরুদ্দিন বুঝতে পারল — মকবুলকে কলেজ পড়ানোর জন্য যত টাকা ফাতেমার হাতে জমা ছিল সেই টাকা দিয়ে ওরা গুয়াহাটি এসেছে। ঔষধ পত্র কিনেছে।

চিন্তা করবা না মকবুলের মা। যখন আমার এই দুহাত আছে।

বসিরুদ্দিনের কথায় ফাতেমা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে। বসিরুদ্দিন অবাক হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করে যে দুটি হাতের কথা গৌরবের সঙ্গে ফাতেমাকে বলেছে তার ডান হাতটিতে কোনো শক্তি নেই হাতটি যেন নিথর নিশ্চল হয়ে আছে। কিন্তু বাঁ হাতে সে হাফিজের দেওয়া কিছু একটা ধরে আছে। এবার সে অনুভব করল ডান দিকের হাত তার নেই।

দ্রুত সে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের গোড়ার কম্বলটি সরিয়ে দিয়ে বসিরুদ্দিন আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ডান হাতটি তার সত্যি সত্যিই আধা নেই।

হায় আল্লা!

একটি ছোটো সরল শিশুর মতো অসহায় ভাবে বসিরুদ্দিন কাঁদতে থাকে।

সনচিঙের লড়াই এবং মানুষের ঘরবাড়ি

ধ্রুবজ্যোতি বরা

'আমরা এবার লড়াইয়ে যাব বলে ঠিক করেছি।'

লোকটি বেশ ভাবলেশহীনভাবে বলেছিলেন। কিন্তু বীরত্বের ব্যঞ্জনা থেকেও লোকটির কথায় যেন দুঃখের সুর ফুটে উঠেছিল বলে আমার মনে হল।

মানুষটি আমার দিকে মাথা তুলে তাকাননি।

আমরা ঘরের বাইরে বসেছিলাম। আমাদের ভাড়া ঘরটির সামনে একটুখানি খোলা জায়গা ছিল। বারান্দার একটা চেয়ারে আমি বসেছিলাম এবং উঁচু একটি মোড়াতে তিনি বসেছিলেন।

'কেন যুদ্ধে যেতে চাইছ? কার সঙ্গে লড়াই করবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটি আমাদের মাঝের গ্রামের মরিগাঁওয়ের বরগুাবাড়ির। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ঘরোয়া কথাবার্তায় নিজের অঞ্চলের ভাষা বেরিয়ে আসে — কিন্তু বাইরের মানুষের সামনে শুদ্ধভাবে বলে। তথাপিও কখনো-কখনো কথ্য ভাষা বেরিয়ে পড়ে। যুগ যুগ ধরে প্রতিবেশী তিওয়া (লালুং-চলতি ভাষা) ও কার্বি মানুষ সঙ্গে থাকার ফলে একধরনের বিশেষ রূপ পেয়েছে, সেভাবেই তাঁরা বলতে চান। কিন্তু আমার ধারণা ভিন্ন। আমার ধারণা হল, এদের বেশিরভাগ মানুষই তিওয়া, কার্বি উপজাতির থেকে বৈষ্ণব (অঞ্চল বিশেষে চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ সনাতনপন্থী) ধর্মমত গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ অসমিয়া সমাজের মূলস্রোতে মিশে গেছে। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে মঙ্গোলীয় প্রজাতির উপজাতীয় লোকজন কয়েক শ বছর আগে থেকেই ক্রমে কোচ এবং তারপর কলিতা বলে নিজেদেরে পরিচয় দেয়। ধনী মানুষেরা তো বরকলিতাই হল। এভাবেই এই মানুষগুলি ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা বৃহত্তর অসমিয়া কৃষক সমাজের অংশ হয়ে পড়ে। মধ্য অসমের সমাজের এটা একটা সাধারণ প্রথা। শারীরিক গঠন, চোখের গড়ন ইত্যাদি থেকে কখনো আলাদা হয়ে পড়ে, আর আলাদা হয় মুখের ভাষাও। আমাদের বংশের মানুষদের এই কথা বললে আপত্তি করে প্রতিবাদ করে — 'আমরা এ ধরনের নই।'

প্রশ্নটি করে তাঁর উত্তরের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম। আমি শুধুমাত্র একটি অনুমান করেছিলাম, তাঁর উত্তরটি কী হতে পারে।

'বাংলাদেশিগুলি এসেই যাচ্ছে কেবল। কিছু একটা না করলে নয়।'

'বাংলাদেশি আসছে বলে যে বলছ, দেখেছ কী?'

'দেখেছি।'

'কোথায় দেখেছ?'

'চর অঞ্চলে ওদের দেখেছি। আগে কিছু জায়গায় কয়েকঘর মানুষ ছিল মাত্র — দশ ঘর হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মাত্র কয়েকবছরে পঞ্চাশ ষাটটি ঘর হয়ে গেছে। ঘরের গায়ে ঘর বানিয়ে বসে আছে।'

'যুদ্ধে গিয়ে কী করবে?'

'তাড়াতে হবে না ওইগুলিকে?'

'মারামারি কাটাকাটি করতে লাগবে না?

সে কোনো উত্তর দিল না।

'জালুগুটির মুসলমানগুলিকে কাটতে যাবে তোমরা?' কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিলাম। মরিগাঁওয়ের একেবারে কাছে এক প্রাচীন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হল জালুগুটি।

'না না ওরা নয়,' লোকটি সজোরে বলেছিলেন। 'ওদের নয়, বাংলাদেশিগুলিকেই কাটব।'

আসলে সনচিং জালুগুটির মানুষগুলিকে বাংলাদেশি বলে মনে করেন না যদিও তারা মুসলমান।

সনচিং — সন্তসিং। ঠাকুর্দাদের গ্রামের মানুষই চিং বা সিং নামের আগে লেখে। সনচিং, রত্নচিং, ধনচিং। বহু তিওয়া মানুষও চিং লেখে, আবার কার্বি মানুষও। পীতচিং কোঁওর, ধরমচিং তেরন, বিদরচিং ক্র, বিদ্যাচিং ইংলেং। একটা সময় প্রচুর কার্বি মানুষ নগাঁও-মরিগাঁওয়ের সমতল অঞ্চলে বসবাস করেছিল। গ্রামের পর গ্রাম। এখনও বহু মানুষ আছে। কিন্তু আগের মতো নেই কপিলি, কলং, কিলিং দিয়ে শুরু হওয়া নদীর নামগুলি কার্বি থেকেই নেওয়া — মিকিরহাট, মিকিরভেটা — এইসব অঞ্চলের নামও পাহাড়ের গায়ে নয়, সমতলের মধ্যেই। একসময় মানুষগুলি দলে দলে মিকির পাহাড়ে চলে গেছে বলে অনেকে মনে করেন। মানের আক্রমণের সময় জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে বহু মানুষ দিহিঙে দিপাঙে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং পাহাড়েও গিয়েছিল। কিন্তু সমতল থেকে পাহাড় পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ কার্বি বা তিওয়া প্রব্রজনের কথা কেউ

জানে না। তাহলে এই কার্বি মানুষগুলি গেল কোথায়। দুটো কথা হতে পারে, হয় অসুখে-বিসুখে মারা গেল (এক সময় কালোজ্বর, ম্যালেরিয়া এবং কলেরা অঞ্চলগুলোকে মুছে দিয়েছিল) নতুবা বেশিভাগ মানুষ বৃহত্তর অসমিয়া সমাজে মিশে গিয়েছিল। হয়তো সবই কম বেশি পরিমাণে লিখেছিল, কিন্তু প্রধান ভূমিকা হয়তো ছিল শেষেরটির অর্থাৎ মিশে যাওয়ার।

'কোথায় আছে তোমার বাংলাদেশিগুলি?'

'চর অঞ্চলে আছে না।'

'এই যে বাংলাদেশিগুলি তাড়ানোর কথা বলছ, সেই বাংলাদেশিগুলি হিন্দু না মুসলমান?'

'মুসলমান-মুসলমান।' সনচিং আগ্রহের সঙ্গে বলেছিলেন।

'সবগুলি লুঙ্গি পড়া মিঞা?'

'না, এরা আমাদের মৈমনসিংহের মিঞাদের মতো নয়।'

'আমাদের ময়মনসিংহের?'

'এদের কয়েকটি ভাষাই বলতে পারে না। বিকৃত উচ্চারণ। বাঙালিরাও এদের কথা ভালো করে বুঝতে পারে না।'

সনচিঙের কথা যে একেবারে সত্যি না, তা নয়। ১৯৭১ সালের আগেই বেশিরভাগ মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসে অসমে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের যুদ্ধের পর যখন একদিন ভারত সরকার রিফিউজি ক্যাম্প অর্থাৎ শরণার্থী শিবিরগুলি বন্ধ করে দেয়, তখন কিন্তু সেখানে থাকা সব বাংলাদেশি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিল কি না তার কোনো খবর কেউ রাখেনি। সুতরাং অসমের অনুন্নত অঞ্চলগুলোয় ঢুকে পড়ে, বিশেষ করে আগের পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ-বসবাসকারী অঞ্চলগুলির আশেপাশে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে এই মানুষগুলি প্রবেশ করেছিল।

এবং সনচিঙের মতো মানুষরা তা দেখেছিলেন। ভালো করে অসমিয়া বলতে না পারা মানুষগুলিকেও দেখেছিলেন, আর নিঃস্ব সেই মানুষগুলির বিরুদ্ধে সনচিং যুদ্ধে যেতে প্রস্তু হয়েছিলেন। 'এবার যুদ্ধে যাব বলে ঠিক করেছি রে' — আমাকে এসে তিনি বলেছিলেন।

এই কথায় আমি তখন বেশি গুরুত্ব দিইনি। সনচিঙের মতো একটি অলস মানুষ বাংলাদেশি কাটতে যেতে পারবেন? কোথায় যাবেন তিনি?

কিন্তু সনচিঙের পরের কথাগুলি একটু ভাবিয়ে তুলল।

'কার্টুজ পাওয়া যাবে নাকি?'

'কার্তুজ? কীসের কার্তুজ?' আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছিলাম।

'বন্দুকের টোটা', সনচিং কার্তুজকে কার্টুজ বলছেন।

'কী করবে।'

'কয়েকটা বন্দুক আছে। কার্তুজ বেশি নেই। তোদের আন্দোলনের নেতা-টেতাদের সঙ্গে এত পরিচয়, তাঁদের বলে বা অন্য কারো থেকে পঞ্চাশটার মতো কার্তুজ এনে দে না। মুসলমানগুলিকে রক্ষা করার জন্য হোজাই, নীলবাগান থেকে মুসলমান গুন্ডা এসেছে। তাদের হাতে ঢের বন্দুক, অসংখ্য গুলি। হাতে আমাদের গুলি না-থাকলে জীবন রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়বে একদিন।'

সনচিঙের কথাগুলি শুনে আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। অসম আন্দোলনের সব থেকে কঠিন সময় সেটি — চারদিকে পুলিশ, মিলিটারি, সিআরপি গিজগিজ করছে। যে কোনো মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে — সনচিঙকে কোত্থেকে গুলি জোগাড় করে দিই।

সেদিন সনচিং আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছেন। কার্তুজ জোগাড় করে দিতে না পেরে তাঁকে বেশি করে জ্ঞান দিতে লাগলাম।

'বাংলাদেশি তাড়ানোর পর দেখবি আবার হিন্দু মুছলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হবে।'

'তুমি তো গুয়াহাটিতে বসে থেকে অন্যদিকে কী হচ্ছে তার খবর রাখো না। আজকেই অবস্থা কী হয়েছে দেখেছ! বহু স্থানে মেয়ে বউ-রা বাইরে বের হতে পারছে না। তোমরা এইগুলি কিছুই জানো না!' যাবার সময় সে বলে গেল।

তখনও আমি অনুমান করতে পারিনি যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিচিত ছবিই প্রস্তুত হচ্ছে।

এসব কথাই বেরোয় — মানুষ এসে এসে ভর্তি হয়ে গেল। হিন্দুর থেকে মুসলমান বেশি হল। সর্বত্র বাংলাদেশ থেকে মানুষ এসে অনুপ্রবেশ করছে — ঘরের কাছে ঘর হচ্ছে এবং ঘরের উপরে ঘর আর মেয়ে বউদের জন্য বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে ... মানুষের মনে হিস্টিরিয়ার মতো ভয় দেখিয়ে এ ধরনের কথাই মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয় সংঘর্ষের পটভূমি।

এই কথাগুলি তখন আমি ধরতে পারিনি। এত দ্রুতগতিতে ঘটনাগুলি ঘটেছিল যে, সে সময়ের সব কথা মনে রাখা সম্ভব ছিল না। সনচিঙের লড়াইয়ের কথা মনেই ছিল না।

তারপর একদিন — একমাসও হয়নি কী জানি ঘটল নেলিতে।

(২)

আগের দিনই মানুষগুলি নাকি একজোট হয়েছিল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছিল তারা। হাতে হাতে তাদের ছিল শাণিত অস্ত্র। লম্বা নলের মতো দা, রামদা, কারও হাতে তরোয়াল — বাড়িতে পড়ে থাকা মরচে ধরা তরোয়াল ঘষে মেজে ধার দিয়ে নেওয়া হয়েছে কারও হাতে লোহার রড়, শাবল, কাস্তে... । তবে বেশির ভাগের হাতে লম্বা বঁটি-দা। কয়েকজনের হাতে বন্দুকও ছিল। প্রতিটি দল একটি করে বন্দুক এনেছিল। এখন এ ধরনের বন্দুক চালানোর মানুষ দেখাই যায় না। পাহাড়ে থাকা লালুং (তিওয়া) এবং কার্বি শিকারিরা অবশ্য এখনও এ ধরনের বন্দুক ব্যবহার করে। সেদিন আনা বন্দুকগুলোর প্রায় সবকটিই ছিল মৃত।

কথাগুলি আমি বহু দেরি করে বুঝতে পেরেছিলাম। নেলির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পরেও আমি ভাবতে পারিনি সনচিঙের যুদ্ধক্ষেত্র সেটাই ছিল বলে।

আমি জানতে পেরেছিলাম বহু পরে।

নেলির সারি সারি শিশুর মৃতদেহগুলির ছবি দেখার পর সব জায়গার মানুষের বুক কেঁপে উঠেছিল। ইস, মানুষ এত নির্দয় হতে পারে? এমন ভাবে হত্যা করতে পারে না কি কোমল নিষ্পাপ শিশু, অসহায় মহিলাকে।

নিরপরাধ, অসহায় শিশু মহিলার হত্যাকারী হিসাবে পৃথিবীর মানুষ অসমের দিকে আঙুল তুলেছিল। তখনও ইউরোপে বসনিয়া ঘটেনি, আফ্রিকার রায়ান্ডায় টুটু এবং হুটসি সংঘর্ষও হয়নি।

অভিযোগেরে সম্মুখে আমাদের মন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। আমি মৌন হয়ে গিয়েছিলাম। অসম আন্দোলনের সেই বন্ধ্যা, অভিশপ্ত সময়ে আমাদের বুদ্ধি বিবেক সব যেন স্থবির হয়ে পড়েছিল। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল।

নেলির ছবিগুলি দেখতে আমাদের সবার ভয় লেগেছিল... । আমি নিজেও এক ধরনের অজানা ত্রাসে আতঙ্কে মূক হয়ে পড়েছিলাম। এখনও সেই ছবিগুলি দেখলে সে ধরনের মনোভাব হয়। আত্মা যেন ধড়ফড় করে ওঠে।

তারপর আমি ছবির অন্তরালের কাহিনিগুলি শুনেছিলাম। শুনেছিলাম সেই নরসংহার যজ্ঞের ভয়াবহ কাহিনি — সেই সংহারে অংশ নেওয়া মানুষের নিজের মুখ থেকে... । এটাই নরসংহারের কাহিনি। সনচিঙের যুদ্ধের কাহিনি। নেলির হত্যাকাণ্ডের কাহিনি।

সেবার কন্‌কনে ঠান্ডা পড়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাস, মাঘের শেষ, ফাল্গুনের আরম্ভ।

বিদায় নেবার আগে আগে সেবার বেশ জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ। অভিশপ্ত ১৯৮৩ সাল। সেই সময় যাঁরা অসমে ছিলেন না, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না, সেই ভয়াবহ অভিশপ্ত দিনের কথাগুলি কেমন ভয়ংকর ছিল।

আগের দিন, এবং তারও আগের থেকে মানুষগুলি এসেছিল।

বিভিন্ন দিকে থেকে এসেছিল। পাহাড় থেকে, পাহাড়ের গা থেকে, সমতল থেকে। এখনও ভাবলে বা বললে সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে সাংঘাতিক ধরনের সংগঠিত বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে ঠিক সে ধরনেরও ছিল না। বিরাট এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে এই কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিছু মানুষ মিলে মিশে কাজটি ঠিকঠাক ভাবে করেছিল। বিভিন্ন স্থানে খবরও দিয়েছিল। গ্রামে গ্রামে গোপনে। অনেকবার কথাবার্তার পর ঠিক হয়েছিল কোন গ্রামের মানুষ কোথায় আসবে — এসে কোনদিক থেকে অভিযান আরম্ভ করবে...। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সংঘটিত কাজ নয়, সেটি ছিল 'গ্রামীণ উপজাতীয়' সাংগঠনিক ঘটনা। 'গ্রামীণ উপজাতীয়' শব্দদুটিকে এমনভাবে ব্যবহার করার ঐতিহাসিক দিকটি ভুললে চলবে না। যুদ্ধই হোক, ভোজই হোক, যে কোনো কাজেই হোক, এভাবেই স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে আসছে। আগে গোপন কাজে মানুষের একজোট হবার ক্ষেত্রে মুখে খবর পাঠানোর রীতি ছিল না। বাঁশের সরু কাঠি জরি দিয়ে বেঁধে পাখার মতো করে তা নির্দিষ্ট মানুষের কাছে পাঠানো হতো। সেই পাখায় বাঁধা কাঠিগুলি একজন মানুষ হাত দিয়ে খুলে খুলে সাংকেতিক কথা নির্ভুল ভাবে বুঝতে পারতো। মধ্য অসম, নগাঁও, মরিগাঁওয়ের কার্বি, তিওয়া এবং অসমিয়া গ্রামে এই পরম্পরা ছিল।

জরির পাখায় খবর পাঠানোর কথা অবশ্য শুনিনি এই ঘটনার সময়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে মানুষ গিয়ে খবর দিয়ে গিয়েছিল — অমুক তারিখে, অমন সময়।

দিনটি ছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে মানুষ জমা হয়েছিল। যে যেখানে আছে এসে জমা হতে লাগল। বরঙাবাড়ি, বঘরা, দন্দুয়া, জাগি, ধরমতুল এবং আরও বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছিল। অনেক আগেই এসেছিল তারা। নির্দিষ্ট স্থানে এসে রাত কাটিয়েছিল।

মানুষগুলি নীরবে এসেছিল। নীরবে এসে ঘিরে ধরেছিল ঘুমন্তগ্রামকে। পা টিপে-টিপে এসেছিল সাপের মতো। মাথায়, মুখে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিল প্রায় সবাই। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে জ্বলজ্বল করে দেখা যাচ্ছিল বিস্ফারিত দুটি নেত্র ... উত্তেজনায় চিক্‌মিক্ করছিল একজোড়া উজ্জ্বল চোখ।

পণ্ডিতেরা পরে বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন মানুষগুলি কেন এভাবে নরসংহার করতে এসেছিল, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে। নিজেদের ভূ-খণ্ডে বাইরের মানুষ এসে বসবাস করলে স্থানীয় মানুষ জমি হারায় (বেশির ভাগ স্থানীয় মানুষ কিন্তু মাটি, বাইরের মানুষের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল), উপজাতীয় ব্লক, বেল্টগুলিতে বহিরাগতরা অবাধে বসে স্থানীয় মানুষদের তাড়িয়ে দিয়েছে, সরকারও নির্বিকার এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল।

এখন ভাবলে মনে হয়, অ্যাকাডেমিক আলোচনায় মূল কথাগুলি যে ধরা যায়নি তা নয়, আংশিক ধরা পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা আংশিকই। এ শুধু মাটি, জমি হারানোর ক্ষোভ এবং ক্ষোভের জন্ম দেওয়া যুগপৎ ক্ষোভ আর ঘৃণার কথাই নয় — এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে এবং তার ওপরে স্থানীয় লোকের গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক দাবি আর নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা — HISTORICAL PERROGATIVE যা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই সব থেকে বেশি সকলের দুশ্চিন্তা। পরম্পরাগত গৃহভূমির ভাগ্যনিয়ন্ত্রক কে হবে? স্থানীয় লোক না প্রব্রজনকারী? স্থানীয় লোকজন অনুন্নত (?) হলেও তাঁদের HISTORICAL PERROGATIVE কে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারও নেই, থাকতেও পারে না। আন্তর্জাতিক আইন মতেও এটি সিদ্ধ কথা। এর মধ্যেও প্রব্রজনকারীদের স্বাগতম জানানো হয়। কিন্তু বল্গাহীন প্রব্রজনের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে না। 'নেলি' - র অন্তরালে এ ধরনের প্রবণতাগুলি শক্তিশালীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

জলা-জঙ্গলের মাঝে বসবাস করা মানুষগুলোকে ঘিরে ধরেছিল তারা, আর ঘিরে ধরে নীরবে দা চালাতে শুরু করেছিল। বেশির ভাগ দা-র আক্রমণ, কোথাও ত্রিশূলের আঘাত, কোথাও বন্দুকের গুলি ঝাঝড়া করে দিয়েছিল, পাশবিক উল্লাসে মত্ত হয়ে পারেনি ওরা, বরং এক ধরনের নীরব জিঘাংসা, একধরনের grim determination সেই মানুষগুলিকে একঘর থেকে আরেকঘরে নিয়ে গিয়েছিল, শিশু-মহিলা, বৃদ্ধ কোনো বাছবিচার না করেই যাকেই হাতের সামনে পেয়েছে তাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। বড় মানুষ কয়েকজন পালিয়ে বেঁচেছিল। খেতের মধ্য দিয়ে, ধানকাটা শূন্য খেতের মধ্য দিয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাওয়া সহজ কথা ছিল না।

যেদিক দিয়েই ওরা পালাতে চেয়েছিল, সেদিক থেকেই এক ঝাঁক মানুষ ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল। ছোট ছেলে মেয়েরা, মহিলারা পালাতে পারেনি — ওরাই সহজে শিকার হয়েছিল এবং নীরবে প্রতিবাদহীন হয়ে মরেছিল। বিকট চিৎকার, আর্তরব, মরণকাতর আর্তনাদ এসব কিছুই হয়নি নেলির আকাশে বাতাসে। মানুষগুলি নাকি

নীরবেই মরেছিল। মূর্তিমান মৃত্যুর সম্মুখে ক্রমে নীরব হয়ে পড়েছিল নিরপরাধ নিষ্পাপ ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা...। দিনের আলোতে বহু সময় পেয়েছিল আক্রমণকারীরা — বেছে বেছে, তাড়া দিয়ে, পালিয়ে থাকা, লুকিয়ে থাকা মানুষগুলিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল...

নেলির হত্যাকাণ্ডে মোট ১৭৭০ জন (অনেকের মতে ২০০০ জনের ওপর) মানুষের হত্যা হয়েছিল। একই দিনের ভিতরে ১৭৭০ জন! দিল্লির শিখ নিধন, গুজরাটের মুসলমান বিরোধী দাঙ্গার আগে স্বাধীন ভারতে বোধকরি এত বৃহৎ মাত্রার নরসংহার ও হত্যালীলা আর হয়নি।

না, তখন তাদের এই কাজ করতে নাকি কোনো খারাপ লাগেনি। মানুষগুলিকে মারাটা যেন শত্রুনিধনের মতো লাগছিল। পরে কখনো ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়লে মন খারাপ লেগেছিল। কিন্তু সেই ঘটনার স্মৃতি সেখানে অংশগ্রহণ করা মানুষের মনে এখন অস্পষ্ট ধোঁয়াশার মতো। ঝড়ের স্মৃতির মতো এখন কথাগুলি প্রায় ভুলে যাওয়ার মতোই।

মরিগাঁও-এ সেবার সাহিত্য সভার অধিবেশন হয়েছিল। মঞ্চের ওপর সাহিত্যিকরা অসমিয়া সাহিত্যের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সময় আলোচনা করেছিলেন, ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেই সময় মঞ্চের পেছনে বানানো স্টেজের কোনো একদিকে বসে সনচিং, আমি এবং আরো কয়েকজন কথা বলছিলাম। কার্তুজ জোগাড় করে দিতে না পারার রাগ সানিচিঙের আর ছিল না। মরিগাঁও এর সাহিত্য সভার ওই মঞ্চে বসে আমরা নেলির হত্যাকাণ্ডের রক্তস্নাত দিনটির কথা স্মরণ করছিলাম। ধোঁয়ার মতো ধোঁয়াময় স্মৃতির পৃষ্ঠা একটি একটি করে সরিয়ে সেই রক্তমাখা অভিশপ্ত দিনটিতে পৌছতে বহু সময় লেগেছিল। সময় লেগেছিল স্মৃতিপটে ধোঁয়ার পর্দা ছিড়ে মূল বিষয়টিতে আসতে।

শুধু ঘৃণা নয়, ঘৃণার অনুভবও নাকি তাদের হয়নি। যাদের আক্রমণ করা হয়েছিল, সেই মানুষগুলির বিরুদ্ধে ঘৃণার অনুভূতিও তাদের ছিল না। আবেগিক উত্তেজনা আর ঘৃণার অনুভূতিতে মিশে ছিল অন্য একটি বোধ— কর্তব্যবোধ! মাতৃভূমি থেকে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীদের এমনভাবে বিতাড়ন করাকে একটি কর্তব্যানুভূতি বলে মনে হয়েছিল তাদের। আবেগের উষ্মা আর ক্ষোভের ঘৃণা থেকেও এ জাতীয় ভয়ানক কর্তব্যবোধ অধিক ভয়াবহ, অধিক ভয়ংকর।

নিষ্ঠুর কাজ শেষ করার পরও আক্রমণকারী মানুষগুলি যেভাবে নীরবে এসেছিল ঠিক সেভাবে নীরবে নিজের নিজের স্থানে চলে গিয়েছিল। ফিরে গিয়েছিল নিজের

গ্রামে। বহু আশা ও আনন্দে ঘর ধ্বংস করে মানুষগুলি ফিরে গিয়েছিল নিজের নিজের ঘরে উষ্ণ আনন্দের মধ্যে।

গ্রামের বহু লোক পুলিশ মিলিটারির ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের দিকে। বহু দূর দূরান্তে পালিয়ে গিয়েছিল পুরুষ ও যুবক ছেলেরা। রক্তমাখা দা গুলি অনেকে ডোবা বা পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। সেই দা, ত্রিশূল, শাবল ইত্যাদি বেশির ভাগই ঘরে নিয়ে আসেনি কারণ পুলিশ মিলিটারির হাতে ধরা পড়ার ভয়ও ছিল।

এই ঘটনা মানুষগুলিকে কি একেবারেই বিব্রত করেনি। সাহস, কর্তব্য এইসব সত্ত্বেও। একজন বলেছিল, মাঝে মাঝে একটা অজানা ভয় তাকে বিব্রত করে তোলে, বিশেষ করে রাতে। একটা অচিন পাখির পাখার ছটফটানি ও শুনতে পায়। ছটফটানি শব্দটি তার বুকের ভেতর, মাথার ভেতর ঢপ ঢপ ঢপ ঢপ করে বাজে।

একটি ভয়ংকর বিশাল পাখি যেন আকাশের দিক থেকে নেমে এসেছিল। তার বিশাল ডানা দুটি দিয়ে রোদ, আলোর পথ বন্ধ করে পৃথিবীর বুকে ফেলেছিল একটি বিশাল নৃত্যরতা ছায়া। একটি কালো ছায়া। পাখিটির লাল চোখ দুটি থেকে যেন স্ফুলিঙ্গ অবিরত বের হচ্ছিল। পাখির ডানার সাঁ সাঁ শব্দ হয়েছিল, খড়-ঘাসগুলি ডানার ঝাপটায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। সেই বিশাল ছায়াময় পাখিটি পৃথিবীর উপরে নেমে যাকে যেখানে পায় তাকেই শাণিত ঠোঁট দুটি দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে একটি বিকট কর্কশ শব্দ তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসছিল ... নেলি বলতে আমার মনে বারে বারে এ ধরনের একটি দুঃস্বপ্নই ভেসে আসে। ভেসে ওঠে সেই ভয়াবহ বিকটাকৃতির সেই পাখির ছবি...।

নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহতা কিন্তু এ ধরনের কাল্পনিক ছবিতে সব সময় বোঝানো যায় না। সনচিং এখন মারা গেছে। আমি মাঝে মাঝে নিজেকে তার জায়গায় রেখে তার আচ্ছাদনের নিচে নিজেকে রেখে উপলব্ধি করতে চাই সেই সময়কার নর হত্যালীলার প্রতিটি কথা। কীভাবে মানুষগুলি সংঘটিত হয়েছিল, তারা কী কথা বলেছিল। আবেগ থেকেও তৎকালীন ঘৃণার থেকেও অন্য কোনো কথা? আন্দোলনের ওপরের নেতাদের না জানিয়ে (একেবারে স্থানীয় পর্যায়ের কয়েকজন নেতা জানতে পেরেছিল আগে, কিন্তু বেশির ভাগেরই অজানা ছিল) বহুদিন ধরে গোপনে এই মানুষগুলি কেন এবং কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল? কী তাদের মনের মধ্যে এনে দিয়েছিল নরসংহার করতে পারার মতো দৃঢ় অনমনীয়তা — কী তাদের শিশু হত্যাকারী করে তুলেছিল অকাতরে ...

না! সনচিঙের ছাউনিতে আমি সেদিনও প্রবেশ করতে সফল হয়নি, আজও হতে

পারিনি।

সনচিঙের দু-একটি কথা মনে এসেছিল বারে বারে - 'বাংলাদেশিগুলি এসেই যাচ্ছে কেবল, কিছু একটা না করলে নয়।'

'দেখেছ?'

'দেখেছি'

'কোথায় দেখেছ?'

'সব জায়গায় দেখেছি ওদের'...

দেখাটা অনেকেই দেখেছে কিন্তু দেখার পর গিয়ে শিশু হত্যা করতে পারার মানসিকতা ... না, সনচিঙের শিবিরে আমি প্রবেশ করতে আবারও ব্যর্থ হলাম।

(৩)

হুমায়ুন আহমেদেরই হবে। এই মুহূর্তে আমি খুব নিশ্চিত না হলেও আমার যতটুকু মনে পড়ছে কথাটি আমি হুমায়ুন আহমেদের কোনো একটি উপন্যাসে পেয়েছিলাম। হুমায়ুন আহমেদ বোধকরি বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত লেখা তাঁর। আমি কয়েকজন বাংলাদেশি লেখকের উপন্যাস পেলে নিয়মিত পড়ি। তাঁদের মধ্যে হুমায়ুন অন্যতম। বর্তমান প্রসঙ্গটিতে হুমায়ুন আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর একটি উপন্যাসের বক্তব্যের অংশটুকু। উপন্যাসটিতে বাংলাদেশের একটি প্রচলিত পঙ্‌ক্তির কথা লেখা ছিল। কথাটি হল — 'মেয়ে হারালে বাজারে খুঁজবে, আর ছেলে হারালে অসমে।'

বেশিদিন আগের লেখা উপন্যাস নয়। ১৯৭০ সালের আগের তো নয়ই।

আমরা হুগলির পারে বসেছিলাম। আমাদের পেছনদিকে ছিল বেলুড় মঠ। আমার সঙ্গে বসেছিল আমার এক ডাক্তার বন্ধু। কলকাতার একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। হুগলির পারে বসে, মাল বোঝাই নৌকোগুলিতে চার-পাঁচজন মাঝির দাঁড়িয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে আগুপিছু করে বৈঠা মেরে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি আমাকে একটি কাহিনি বলেছিলেন। গত তিন বছর ধরেই মানুষটিকে তিনি লক্ষ করেছিলেন।

উত্তর কলকাতার বনেদি পাড়ায় তাঁদের বাড়ির সামনেই লোকটি থাকে। একটি প্রায় পরিত্যক্ত ঘরের পিছন দিকে মালিক তাকে পচে যাওয়া চালের কোঠাতে থাকতে দিয়েছিল। লোকটি দিন মজুরির কাজ করে। খুব পরিশ্রম করে এবং খুব কষ্টও করে। তার স্ত্রীও কাজ করে। স্বামীর নাম সদাশিব, স্ত্রীর নাম জবা। দুজনেরই কাজ, কথাবার্তা,

ব্যবহার এত ভালো যে সেই বিরাট পুরনো পাড়াতে ঘরে ঘরে কাজ পেতে তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। মানুষ নিজে এসে এই দুজনকে কাজ করার জন্য ডেকে নিয়ে যায়। কয়েকমাস দেশে থেকে এসে আবার সেই ঘরে ফিরে আসে এবং তার স্ত্রী ডাক্তারের বাড়িতে দুবার কাজ করেছে। অসুখ বিসুখে তিনি কয়েকবার বাড়িতেই দেখে দিয়েছেন, শুধু তাই নয় ফ্রি স্যাম্পলের ওষুধও দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিনেও লোকটির সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়নি। লোকটি বাগানের কাজ বেশ সুন্দর করে করে, বেশ নাম আছে তার।

আমার ডাক্তারবন্ধু তিন-চারদিন আগেই সদাশিবকে ডেকে এনেছিলেন, তাঁদের পুরনো ঘরের ছোট বাগানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেবার জন্য। গাছপালা বেড়ে গিয়ে প্রায় জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল।

সদাশিব নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলা বাঁকা একটি দা নিয়ে হাজির। এসেই বাড়িতে কোথায় কী বাগান পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আছে সেইগুলি ঠিক করে নিল। দুদিন ধরে বাগান সাফ করতে করতে ডাক্তারের সঙ্গে সদাশিবের কথাবার্তা হল। ডাক্তার তাকে দেশের কথা জিজ্ঞেস করলেন — তিন চার মাস ধরে এত দীর্ঘদিনের জন্য সে কেন দেশের বাড়িতে যায়। লোকটি দেশের কথা বলাতে অল্প থতমত খেল দেখে ডাক্তার অনুমান করে নিয়েছিলেন যে সদাশিব নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষ হবে। জিজ্ঞেস করতেই বেরিয়ে পড়ল যে সদাশিবের ঘর বাংলাদেশে। বছরের চারমাস ঘরের জমিতে ধান চাষ করতে চলে যায়। সীমান্ত পার হয়ে যাতায়াত করতে দু-চার পয়সা খরচের বাইরে তার আর কোনো অসুবিধা হয় না ...।

ডাক্তারের হঠাৎ কী সন্দেহ হল, কেন হল ঠিক জানেন না, তিনি সদাশিবকে জিজ্ঞেস করলেন 'সদাশিব তোমরা মুসলমান?'

সদাশিরের শরীর যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। অল্প সময় নির্বাক হয়ে থেকে লোকটি মাটিতে বসে পড়ল। মুখ দিয়ে সে কী বিড়বিড় করতে লাগল। ডাক্তারের বহু অভয় দেওয়ার পর লোকটি বলল, 'আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারব না। ডাক্তারবাবু, আপনি ভগবানের মতো। হ্যাঁ, আমরা মুসলমান। মিথ্যা কথা বলে হিন্দু সেজে আমরা কলকাতায় কাজ করি — হিন্দু হলে কাজকর্ম পেতে সুবিধা হয় বেশি, হিন্দু মানুষেরা খারাপ পায় না। এখন আমাদের প্রাণ আপনার কাছে — শুধু আমাদের দুজনের নয়, চারটা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং তাদের পাগল এক কাকার প্রাণ আপনার হাতে। তারপর যে কাহিনিটি বের হল তা আমাদের শিহরণ জাগায়।

বাংলাদেশের গ্রামে এত জমিজমা নেই যে সম্পূর্ণ একটি পরিবার বছরভর বসে

খেতে পারে। জমিও ভালো নয় আবার ফসলও কম হয়। তার থেকেও বড় কথা হল যে বাংলাদেশে মৌলবাদীরা মহিলাদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ কর্ম করতে বাধা দেয়। শহরে এসব নেই। বাংলাদেশে মেয়ে বউরা বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না — ঘরে পর্দার আড়ালে থাকতে হবে। শুধু চাষ করে একজনের উপার্জনে ঘর চলে না। ফলে ঘরের মানুষেরা একবেলা কোনোমতে খেতে পারে, কলকাতায় এসে কাজ করলে, স্বামী স্ত্রী দুজনেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, উপার্জনও করতে পারে। কলকাতায় মজুরিও বেশি, তা ছাড়া ভারতীয় টাকা উপার্জন করে বাংলাদেশে নিয়ে গেলে সেখানে অনেক বেশি হয়ে যায়। বছরে আট নয় মাস কলকাতায় থেকে কাজ করে উপার্জন করে গেলে গোটা পরিবারটি বছরভর স্বচ্ছন্দে চলতে পারে — ছেলেমেয়ে কয়েকটি পড়াশোনাও করতে পারে ... মা থাকার জন্য, স্বাস্থ্য এখনও ভালো থাকায় — ছেলে মেয়ে কয়েকটিকে দেখতে পারে — পরে মানুষটির কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল।

এখন কী হল সদাশিব? তুমি কী করতে।

এই ঘটনাটি মাত্র গত বছরের। লোকটি আছে। কাজকর্ম করছে। কিন্তু কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাকে রাস্তায় দেখলে আমার এখন ভয় লাগে — টেনশন হয়। মানুষটিকে ধরিয়ে দিতে পারি — পুলিশকে ফোন করলেই হয়। আমাদের এখানে অসমের মতো বাংলাদেশি ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের জন্য আইন বাধা নেই, সেখানে কিন্তু হিন্দু সাজা মুসলমান বাংলাদেশি পেলে জেলে পুরে দেয়। স্ত্রী-র নামটি কিন্তু আসল নামই। জবা-ই তার নাম। জবা খাতুন, জবা ঘোষ নয়। ধরিয়ে দেওয়াটা অতি সহজ। কিন্তু পরিবারটির কী দুর্দশা হবে... যেখানে তার ছেলে মেয়েরা আছে — ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা...।

।। অনুবাদ : তিমির দে ।।

ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে একটি আড্ডা

দেবব্রত দাস

আমি পার্কে মামাদের কবি সম্মিলনীতে এসেছিলাম। আজকাল একধরনের হুজুগ উঠেছে। কবি-সম্মিলনগুলি কোথাকার কোন জঙ্গলে, কোন চিড়িয়াখানায়, কোন পার্কে আয়োজন করে। মামাদের কবিগোষ্ঠী আয়োজন করা কবি সম্মিলনীতে আমি কবিতা পাঠ করতে আসিনি। মামার নির্দেশমতো আমাদের ক্লাবের মাইকটা ফিট করতে এসেছিলাম। কবিতা-টবিতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমানে আমি নিজের জন্য একটা চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত। আর বিকেলে গোধূলি ক্লাবে নাটকের রিহার্সাল, আড্ডা আর তার মাঝে-মধ্যে একটা-দুটো ছোটখাটো টিউশ্যনি। কখনও কখনও এ ধরনের অগতানুগতিক কাজ পেলে ভালোই লাগে। সময়টাও কেটে যায়। আমি মাইকটা ফিট করে নিয়ে আসা ক্লাবের চৌকিদারের জিম্মায় মাইকের ভার সঁপে রেখে পালাতে চেয়েছিলাম। মামা বললেন — একটু সময় থেকে যা — বিকেলে চা-মিষ্টি আসবে — খেয়ে যাবি। চা-মিষ্টির লোভে থেকে গেলাম। কুড়ি-পঁচিশজন কবি, মহিলা কবি এসেছে। শ্রোতার সংখ্যাও প্রায় তাই। উদ্বোধনী সংগীত শুরু হল। সভাপতি নির্বাচন করা হল। একজন-দুজন করে কবি কবিতা পড়তে লাগল। সাড়ে তিনটার সময় একটা নতুন অ্যামবাসাডার গাড়িতে চা-মিষ্টি আসতে দেখলাম। আমি সেদিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকতেই শুনতে পেলাম মাইকে কোনো একজন একটা তৃতীয় শ্রেণির হিন্দি কবিতা পড়তে শুরু করেছে। ভারতমাতা নেহেরুজিকা পয়গাম — খুন কী পুকার এই ধরনের বাক্য কানে এল। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম অসমিয়া কবিতার সম্মেলনে এই শক্ত-সমর্থ নন-অসমিয়া ব্যবসায়ীটিকে কোথা থেকে মামারা কবিতা পড়ার জন্য ধরে আনলেন। ঠিক তখনই গোমস্তা জাতীয় একজন আমাকে আর আশেপাশে বসে থাকা সবাইকে সিঙাড়া, মিষ্টি, আর চা পরিবেশন করে গেল। কবিতা পাঠ করতে থাকা বয়স্ক ব্যবসায়ীটি এমন সময় এসে আমার পাশে ধপাস করে বসে পড়লেন। বসেই জিগ্যেস করলেন — ক্যায়সা হুয়া? আমি সিঙাড়ায় কামড় বসাতে বসাতে বললাম, বহুত আচ্ছা। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন,

কবিতা-টবিতা লিখতে ভয় লাগে — কে জানে কোথায় সাবস্ট্যান্ডার্ড মাল চলে যায়। কিন্তু সাহিত্যে —

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই সামনের সারিতে বসে থাকা সভাপতি মহোদয় ঝুঁকে ব্যবসায়ীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। অভিনন্দন গ্রহণ করে ব্যবসায়ী পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে উৎসুকভাবে জিগ্যেস করলেন চা, তো আচ্ছা হ্যায় না? ঘরকা বনায়া হুয়া হ্যায়। দোকান কা নহী। আমি বুঝতে পারলাম মামারা আজকের চা-মিষ্টির বিনিময়ে একজন সফল ব্যবসায়ীর কাছে কবিতা সতীত্ব বিক্রি করেছেন।

চা খেয়েই আমি উঠে পড়লাম। আমি পার্কের গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই ধরা পড়ে গেলাম। মামা পেছন থেকে ডাকছেন — ঐ, কোথায় যাস? একটু অপেক্ষা করে যা। মাইক গণ্ডগোল করতে পারে।

সামনেই কয়েকটি ছেলেমেয়ে খেলাধুলো করছিল। আমাদেরেই প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে। আমি মামার অনুমতি নিয়ে তাদের কাছে গেলাম। আমাকে পেয়ে ওদের খেলাধুলোয় উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। ছোট্ট, পাতলা রঙচঙে একটা বলের পেছন পেছন আমরা সবাই দৌড়াতে লাগলাম। আমাদের চিৎকার-চেঁচামিচি মামাদের কবি-সম্মিলনিতে অসুবিধের সৃষ্টি করছে কিনা তা ভাবতেও আমার কোনো আগ্রহ হল না। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করার সময় হঠাৎ একবার পার্কের মাঝখানের ছোট রাস্তাটি দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে হেঁটে যাওয়া ক্ষিতীশের দিকে চোখ পড়ল। ক্ষিতীশ আমাদের বয়সী ছেলে। এম. এ, পাশ করে বসে রয়েছে। আমার মতো এরকম নিষ্কর্মা বেকার নয় অবশ্যে। ইতিমধ্যে গল্প-টল্প লিখে নাম করে ফেলেছে। রেডিয়োতে তার গল্প পাঠ হয়। একটি নাটকও ব্রডকাস্ট হয়েছে। আমি খেলা বাদ দিয়ে তাকে ডাকলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আমরা দুজনে একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

ক্ষিতীশের অন্যমনস্কতার কারণ হল, সে মনে মনে একটা গল্পের পরিকল্পনা করছে। গল্পের মূল চরিত্রগুলি বা ঘটনাগুলি তার মগজে ঠিকই রয়েছে। কিন্তু গল্পের আকৃতিটা কী ধরনের হবে, শেপটা শেষ পর্যন্ত কীরকম দাঁড়াবে, সেটি ভেবে এখনও স্থির করে উঠতে পারেনি। তাই এটা ভাবার জন্যই সে পার্কের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে নাকি বড় হৈ-হল্লা। জ্যাঠার মেয়ে বিয়ের পর প্রথমবারের জন্য বরকে সঙ্গে নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে। খবরটা দেবার পরেই তার মনে পড়ল, আমি যে গতমাসে তার কাছ থেকে তিনশো টাকা সাত-দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেব বলে ধার করেছিলাম

— টাকাটা তো ফিরিয়ে দিইনি। আমি তাকে অভয় দিলাম। আমি তাকে বললাম এবার টিউশ্যনির টাকাটা পেলেই পুরো টাকাটা তার হাতে তুলে দেব। গতমাসে মায়ের বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছিল। ডাক্তার, মেডিসিন করতে করতেই অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। তাতে আবার বহাগি আদরণি, বহাগি বিদায়ে বিহু নাচ নাচা আমার বড় বোনের ব্লাউজ, প্লাস্টিকের কপৌ, হাতের সস্তা অলংকার, গালের রুজ পাউডার, এই সমস্ত কিছুর জন্য খরচ করতে হল। আজকেই তার গ্রুপের কোথায় যেন প্রোগ্রাম রয়েছে। আমি সকালবেলা তাকে জিগ্যেস করতে শুনেছিলাম — প্রথমটার জন্য সে কত টাকা পাবে। বোনও আজকাল চালাক হয়ে গেছে। বিহু নাচের পুরো টাকাটা আজকাল মায়ের হাতে দেয় না সে। কিছুটা চালাকি করে সরিয়ে রাখে। বিহুর সময়ে আমার সিগারেটের খরচটা তার কাছ থেকেই পাই।

আজ সকালবেলা ভাত খাবার সময় মা প্রস্তাব দিয়েছিল যে প্রোগ্রামের পরে বোনকে নিরাপদে ঘরে নিয়ে আসার ভারটা আমারই নেওয়া উচিত। বোন এ ব্যাপারটা পছন্দ করে না। ওদের গ্রুপের প্রধান ঢোলবাদকেই এই কাজটা করে থাকে। আমি তাই এক কথাতেই মায়ের প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলাম — না না, আমি ওর চৌকিদারি করে বেড়াতে পারব না।

মা ক্ষীণস্বরে আপত্তি জানাল — দিনকাল দেখতেই পাচ্ছিস কত বদলে গেছে। একটি যুবতী মেয়ে রাতবিরেতে বিহু নেচে একা একা ঘরে ফিরবে, ভাবতেও যেন কেমন লাগে। বোন বারান্দা থেকেই কথাটা শুনছিল। সেখান থেকেই সে হুংকার দিল — যুবতী মেয়ের বিহু নেচে রোজগার করা টাকাটা হাত পেতে নিতে তো কোনোরকম দ্বিধা হয় না। আমি ভাত খেতে খেতেই বলে উঠলাম — এই, চুপ কর।

সকালবেলা ঘরে মা আর বোনের ঝগড়া, দুপুরবেলা মামাদের কবি সম্মিলনীতে ব্যবসায়ী লোকটির চা-জলপানের উপঢৌকন সহ অনধিকার প্রবেশ, বিকেলে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমার নিষ্কলুষ খেলাধুলো, এই সমস্তর খতিয়ান দিয়ে আমি ক্ষিতীশের সঙ্গে পার্কের ভেতরে ঘুরে বেড়ালাম। অবশেষে আমি যখন সে লিখতে চাওয়া নতুন গল্পটির বিষয়ে জিগ্যেস করতে চাইলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সৌমিত্রকে আবিষ্কার করলাম। পার্কের সবচেয়ে নির্জন ঝোপে ভরা অংশটিতে সে ঘাসের ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে। আমার অন্য একজন বেকার বন্ধু। ক্ষিতীশ জিগ্যেস করল — কী মিত্র, একেবারে মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়ে আছ দেখছি? সমস্ত সাম্রাজ্য দান করে শেষে ভারমুক্ত হয়ে মুক্তকচ্ছ হতে চলেছ নাকি?

সৌমিত্রকে আমরা মিত্র বলে ডাকি। সে প্রশ্নটা শুনে উল্টে জিগ্যেস করল —

মুক্তকচ্ছ মানে কী বে?

জানস না? শালা — না জানার ভান করছিস — মুক্তকচ্ছ মানে লেংটা। সৌমিত্র পার্কে গাঁজা খেতে এসেছিল। ঈশ্বর নামের একটি বন্ধুও নাকি তার সঙ্গে ছিল। দুপুর থেকেই তারা নির্বিবাদে গাঁজা খেয়ে আসছিল। মাঝখানে দিয়াশলাই আনতে গেছে। মিত্র এখন ঈশ্বরের জন্য এখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে। ঈশ্বর এখনই এসে যাব। একথা বলে মিত্র আমার থেকে দিয়াশলাই নিয়ে গাঁজা ভরা চারমিনার একটা জ্বালিয়ে নিল। ঈশ্বরকে আমরা চিনি না। সে গাঁজায় টান দিতে দিতে আমাকে আর ক্ষিতীশকে ঈশ্বরের পরিচয় দিতে লাগল।

ঈশ্বর সৌমিত্রের নতুন বন্ধু। রেল লাইনের ওপাশে বস্তিতে থাকে। বড় রিসোর্সফুল বন্ধু। যখন যা চাই ঈশ্বর জোগাড় করে দেবে। টাকা ধার লাগে — ঈশ্বরকে বল। রেশন কার্ড চাই — ঈশ্বর দুদিনের মধ্যেই জোগাড় করে দেবে। ট্রেনে আজই থ্রি-টায়ারে রিজার্ভেশন দরকার, ঈশ্বরই পারবে। আজ সকালবেলা মিত্র নাকি গিয়ে দেখেছে যে গাঁজা-কেনা পান দোকানটা বন্ধ। দোকানি বিহারের দেশের বাড়িতে গেছে। পথে ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হল। ঈশ্বরই তাকে গাঁজা বিক্রির একটা নতুন ঠিকানা দিয়ে দিল। সে ঈশ্বরের নির্দেশমতো রেললাইনের ওপরে ওপরে কিছুদূর গিয়ে একটা গুমটি ঘর দেখতে পেল যেখানে ল্যাংড়া বুড়ো কেবল গাঁজা কেন, নেশার অন্যান্য সমস্ত জিনিসই বিক্রি করে। আজ সকলবেলা ঈশ্বর এই উপকারটা করাতেই মিত্র এখন গাঁজা টেনে স্বর্গসুখে বিরাজ করছে।

আমি আর ক্ষিতীশ মিত্রের পাশে বসলাম। কিছুক্ষণ আমরা সকলেই চুপচাপ। মামাদের কবি-সম্মিলনীতে মাইকটা নিয়ে আসা ছেলেটি আমার থেকে অনুমতি নিয়ে নিজেই যন্ত্রপাতিগুলি, ব্যাটারি রিকসায় তুলে আমাদের ক্লাবে ফিরে গেল। তার মানে মামাদের কবিতা পাঠ শেষ। অন্ধকার নেমে আসছে। আমি দূর থেকেই দেখতে পেলাম বল খেলতে থাকা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দলটা পার্ক থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পৌছেছে। তারাও ঘরে ফিরবে। আমাদের সেরকম কোনো তাগিদ নেই। আমরা তিনজনেই পার্কে বসে রইলাম। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। দূরের রাজপথে আলোগুলি জ্বলে উঠল। ওপাশে নদীর সামনে বড় বড় অশ্বত্থ গাছগুলি থেকে অসংখ্য বাদুড় শব্দ করতে করতে আমাদের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল। সৌমিত্র আমাদেরও গাঁজা অফার করেছিল। আমরা খেলাম না। আমি একটা চারমিনার জ্বালিয়ে নিলাম। ক্ষিতীশ নাকি সাময়িক ভাবে সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। গলার অসুখ। আমি মাঝখানে একবার ক্ষিতীশকে ওর নতুন গল্পটির কথা জিগ্যেস করলাম। সে তাচ্ছিল্যের

সঙ্গে জবাব দিল — না হে খুব একটা সাংঘাতিক গল্প নয়। এই আজকালের ঘটনাগুলিই। একজন বুড়ো কেরানি থাকবে। তার পেনশনের সময় হয়ে গেছে। ঘরে এক মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। যৌতুক গহনা দেবার জন্য বুড়ো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাগুলির আশায় দিন গুনছে। একটা ছেলে আছে। আমাদের মতোই বেকার। বুড়োর অসুখও আছে। হার্টের ট্রাবল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। মানে ধরে নে, একটা পা কবরে। বুড়োর শারীরিক অবস্থার জন্যই অফিসের সহকর্মীরা বুড়োকে বেশি কাজ করতে দেয় না। অফিসের বেতন আনার জন্য ট্রেজারিতে, ব্যাঙ্কে বুড়োর নিজেই যাওয়ার নিয়ম, একটা পিয়নকে সঙ্গে নিয়ে। পিয়নটা আজকাল একাই যায়। বিশ্বাসী পিয়ন। ঘটনার দিন পিয়নটা বেতনের টাকা নিয়ে অফিস ফেরার পথে দুর্বৃত্ত গুলি করে হত্যা করে টাকাটা নিয়ে যাবে। কেউ বলবে টাকাটা আলফা নিয়েছে। কেউ বলবে, না, বুড়োর ছেলের সঙ্গে বেকার যুবকরা নিয়েছে। খবর শুনে বুড়োর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। শেষ অবস্থায় এখন বুড়োর চাকরি নিয়ে টানাটানি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কোথায় পাবে? ব্যাঙ্কে না যাবার গাফিলতিতে চাকরি চলে যাবে দেখছি। মেয়ের বিয়েও ক্যান্সেল হয়ে যাবে। পুলিশ সন্দেহ করে বুড়োর ছেলেকে অ্যারেস্ট করবে। বুড়োকে এইসব দুঃখের অজুহাতে হার্ট অ্যাটাক করে মেরে ফেলব নাকি?

মিত্র বলল — বেসিক গল্পটা খারাপ নয়। তবে আসল কষ্টটা, আসল দুঃখটা, মানে আসল যে থ্রেটটা তোকে ভালো করে বোঝাতে হবে।

আসল কথাটা কী?

মানে এই যে আজকাল লাইফের কোনো সিকিউরিটি নেই। চারপাশে অরাজকতা, গুলি, বোমা, বন্দুক, চুরি, হত্যা, বলাৎকার এইগুলির মধ্যে আপাত সুরক্ষার বসবাস করা বেচারা কেরানি বুড়োর সংসারটা কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, তার মূল কারণই হল এসব।

আমি বললাম — তার সঙ্গে বেচারার ছেলের চাকরি না পেয়ে কুপথে যাওয়া বা মেয়ের বিয়ের জন্য যৌতুক হিসেবে টাকা জোগাড় করার কষ্ট।

হিন্দিতে একটা কথা জানিস, মিত্র বলল — কথাটা হল বিন মাঙ্গে মোতি মিলে, মাঙ্গে মিলে না ভিখ। মানে, মানুষ না চাইতেই কখনও বা হিরে-জহরৎ পেয়ে যায়, আবার কখনও বা হাজার চাইলেও ভিক্ষে পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

একথা কেন বললি?

আজ সকালবেলা ঈশ্বরের কথামতো রেলালাইনের বস্তিতে গিয়ে গাঁজার পুরিয়া

কিনে ফিরে আসছি। রেললাইনে কয়েকটি ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরা ছেলেমেয়ে কয়লা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এমন সময় একটি মেয়ে কি একটা জিনিস খুঁজে পেয়ে পাশের একটা ঝুপড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোককে এনে দেখাল। ঠিক তখনই আমি গিয়ে উপস্থিত হই। লোকটি জিনিসটা আমাকে দেখাল। একটা ইয়ারিং। মাঝখানের পাথরটা জ্বলজ্বল করছে। লোকটি আমাকে হিন্দিতে জিগ্যেস করল — সাহেব এটা হিরের ইয়ারিং কিনা দেখুন তো। আমি ঘুরিয়ে ফিরেয়ে দেখলাম। আমি কখনও হিরের অলংকার দেখিইনি। আমি কী মন্তব্য করব? তবুও আমি সবজান্তার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে ইয়ারিংটা ফিরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

তারপরে?

তারপরে কিছুটা দূরে আসার পরে আমার খেয়াল হল যে যদি ইয়ারিঙটাতে সত্যি সত্যিই হিরে থাকে তাহলে সেটা বিক্রি করলে টাকার একটা অংশ আমিও তো পেতে পারি। আমি ফিরে গেলাম। আমাকে ফিরে যেতে দেখে সেই লোকটি দৌড়ে পালাতে গেল। আমিও দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, বুঝেছিস লোকটি দৌড়ে দৌড়ে উড়ে উড়ে পালিয়ে গেল। বিশ্বাস কর, আমার চোখের সামনে লোকটি বাজারের ওপর দিয়ে উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

তোর ঈশ্বর দেখছি আর এল না দিয়াশলাই নিয়ে?

আসবে আসবে। কেন চিন্তা করছিস? ঈশ্বর আসবেই।

ক্ষিতীশ দেখ তো। কে যেন সত্যি সত্যিই এদিকে এগিয়ে আসছে। ও-ই ঈশ্বর নাকি?

ও একা নয়। সঙ্গে অপেশ্বরী একজনও রয়েছে। আঁধারে-অন্ধকারে ওরা কোথায় যায়?

বোকা! বুঝতে পারছিস না ওরা কোথায় যায়? তোরও এরকম একজন চাই নাকি? পাশাপাশি বসার জন্য? পার্কের গেটের সামনে চানাচুরওয়ালাটাকে বললেই হল। কিছু টাকাও লাগবে কিন্তু।

ছেলেমেয়ে দুটি আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসল। মেয়েটিকে দেখে কেন জানি হঠাৎ বোনের কথা মনে পড়ল। এখানে-সেখানে বিহু নেচে পাওয়া পঞ্চাশ-একশো টাকা আমাদের সংসারে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এই মেয়েটি, পার্কের ঝোপে একা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সন্ধেবেলা কাটানো মেয়েটি এবং বোনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য খুঁজে বের করতে চাইলেও পাওয়া যাবে না। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করলাম — শালা সব মেয়েরাই চরিত্রহীন

হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষিতীশ আমার কাঁধে হাত রেখে বলল — আমি বুঝতে পেরেছি দোস্ত, তোর দুঃখ কোথায়। সব নারী পৃথিবীতে কলুষিত হয়ে যাচ্ছে আর সব উদ্যান ইতিমধ্যেই কলুষিত। সমস্ত সুন্দর জায়গাগুলি এই পার্কটার মতোই কুকার্যের বাগান হয়ে পড়েছে। আমাদের এই পৃথিবীটাও। কী করা যায় বল তো?

আমার মনে পড়ল এই পার্কটার এই জায়গাটিতেই আগে এত জঙ্গল ছিল না। এখানে আমরা একটা ফুটবল খেলার মাঠ তৈরি করে নিয়েছিলাম। এখানেই আমি প্রথম ফুটবল খেলতে শিখেছিলাম। আমি বলে যেতে লাগলাম — আমি প্রথম যেদিন খেলতে এসেছিলাম, সঙ্গের ছেলেরা আমাকে বলল, তুই হাফ-এ খেল। গোল দিতে হবে না। গোল বাঁচাতেই হবে না। বলটা লাথি মারতে শেখ। একটু পরেই কে যেন আমার দিকে বলটাকে মেরে পাঠাল। বলটা আমার সামনে দিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে, প্রায় ফ্যাসিনেটেড বুঝলি, বলের গতিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার পেছন পেছন ছুটে চলেছি। বলটাকে যে পা দিয়ে মেরে পাঠাতে হবে সেটা একদম ভুলে গেছে। সঙ্গের সবাই চিৎকার করছে — মার মার নাহলে বলটা ড্রেনে পড়বে। আমার কিন্তু সেসবে কান নেই। আমি শুধু ঘূর্ণ্যমান বলের গতিতে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছি। তখনই হঠাৎ দেখতে পেলাম আমি যদি বাধা না দিই তাহলে বলটা সামনের নোংরা জলে গিয়ে পড়বে। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বলটায় লাথি মারতে হবে। বলের গতিতে বাধা দিতে হবে। নাহলে বলটা নোংরা হবে। আমাদের পাগুলির নোংরা হবে। তাই বলটাতে লাথি কষাতে হবে।

হঠাৎ আমার নস্টালজিক রোমন্থনে বাধা দিয়ে ক্ষিতীশ চিৎকার করে উঠল — একজ্যাকটলি — বলটাতে লাথি কষাতে হবে। ঠিক বলেছিস — বলটাতে লাথি কষাতে হবে। পেয়ে গেছি। আমরা চুপচাপ বসে থাকলে হবে না। বলটাতে লাথি কষাতে হবে। চল ফিরে যাই। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে গল্পটা শেষ করতে পারব।

সন্ধে অতিক্রান্ত হয়ে রাত হতে চলেছে। অনেক সময় পার হয়ে গেছে। আমিও ক্ষিতীশের আহ্বানে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সৌমিত্র কিন্তু শুয়েই থাকল। আমি জিগ্যেস করলাম —

ঐ মিত্র। চল। ঘরে যাবি নাকি?

তোরা যা। আমি একটু অপেক্ষা করি। ঈশ্বর আসবে। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। তোর দিয়াশলাইটা দিয়ে যা।

ঘরে ফেরার পথে ক্ষিতীশ তার গল্পটা বলতে লাগল। পার্কে আমরা কথা বলার

সময়ই নাকি সে আমাদের কাছে বলা গল্পটা ক্যান্সেল করে আমাদের তিনিজনের কথা নিয়েই একটা গল্প লিখবে বলে ঠিক করেছে। গল্পের শেষে সৌমিত্র গাঁজা খেয়ে পার্কে শুয়ে থাকল ঈশ্বরের অপেক্ষায়। ঈশ্বর কিন্তু আসবে না। অর্থাৎ তার সামনে দিয়ে বলটা নর্দমার দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু সে বলটা দেখতেই পাবে না। তার কাছে বলটির কোনো অস্তিত্বই নেই।

ক্ষিতীশ ঘরে ফিরে দেখবে, তার জামাইবাবু, বড় সরকারি জামাইবাবু, ওর এম.এ পাশ করে দুবছরেও একটা চাকরি না পাওয়া নিয়ে ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা আর উপহাস করছে। তার জ্বালায় সে রাতে আত্মহত্যা করার মনস্থ করবে। সব কিছুই অবশ্য গল্পে ঘটবে। সত্যি সত্যিই নয়। অর্থাৎ তার দিকে ছুটে আসা বলটাকে সে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারবে না। বলটা তার চোখের সামনে দিয়ে নর্দমার দিকেই যেতে থাকবে।

আর আমি, রাতে বাড়ি ফিরে জানব যে, বোন বিহু নেচে তখনও ফিরে আসেনি। মা বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আমি বোনকে খুঁজতে রাত দ্বিপ্রহরে রাস্তায় বেরিয়ে আসব। অর্থাৎ আমার পাশ দিয়ে, এগিয়ে যাওয়া বলটাকে দেখে আমি বুঝতে পারব যে, বলটাতে আমাকে লাথি কষাতে হবে। বলটাকে নর্দমায় পড়ে নোংরা হতে দেওয়া যায় না। বলটাকে আমায় আঘাত করতে হবে।

আমি ক্ষিতীশের কথাগুলি শুনে বললাম — বাঃ, সুন্দর গল্প হবে।

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

গান্ধী উদ্যানে একরাত্রি

বিতোপন বরবরা

এক অনন্য অনুভব বুকে নিয়ে বহু ঈপ্সিত একটি বিশেষ লক্ষস্থানের দিকে এলোমেলো হেঁটে আসছিল বিভু। খানিকক্ষণ পূর্বে গলাধঃকরণ করা মদ তার স্নায়ুগুলিকে ক্রমশ অবশ করে ফেলছিল। তবু অনেক প্রচেষ্টায় সে তার পদচারণা অব্যাহত রেখেছিল। কোনো এক উত্তেজনায় তার অপ্রশস্ত কপালে বারবার জমে উঠছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম আর গাড়ির রেইন দিমভারের মতো বিভুর হাত মুহূর্তেই তা মুছে ফেলছিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য বিভুর সঙ্গে জড়িত এই সমস্ত শ্লথ অথচ সবেগ প্রক্রিয়ার ছন্দ ব্যাহত হল। হঠাৎ বিকট শব্দে আকাশ বেজে উঠল এবং সমধিক বেগে বিস্তৃত অন্ধকার চিরে, ছিটকে, চমকিত বিজলির আলো। আকস্মিক ঝড়ের সবেগ স্রোত পথের শায়িত ধুলোকে সাগরের ঢেউরের মতো উড়িয়ে নিয়ে এল এবং চারপাশের গাছপালাকে কাঁপিয়ে সৃষ্টি করল এক অনন্য শব্দের কোরাস। বিভু হাত দিয়ে দুচোখ ঢাকার চেষ্টা করল।

হঠাৎ বিভুকে চমকে দিয়ে তার কানের কাছে একটি অনুচ্ছ নারীকণ্ঠ বলে উঠল — 'ইস্! ঝড় উঠছে। বৃষ্টি আসবে।' বিভুর মনযোগ ব্যাহত হল। মুহূর্তেই সমস্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিস্পৃহ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'না, না। আসবে না। এরকমই থাকবে। একইরকম।' এক অদ্ভুত অনুভূতি তার পুরো শরীরকে সংকুচিত করে দিতে চায়। কিন্তু সে আমল দেয় না। সে ঠিকঠাক এগিয়ে যাবার প্রয়াস করে। হাতের এক ইঙ্গিতময় টানে সঙ্গীকে টেনে নিয়ে সে প্রায় টালমাটাল পায়ে এগিয়ে যায়। অতিরিক্ত মদ্যপানে আড়ষ্টপ্রায় শরীরটাকে বিভু কোনোক্রমে টেনে হেচড়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে সে তার নির্দিষ্ট লক্ষস্থান উদ্যানের কাছাকাছি উপস্থিত হয়। দেখে দামাল বাতাস যেন উদ্যানকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। এই সময় বিভু খাণিকক্ষণ দাঁড়ায়। অন্ধকারে উড়ন্ত ধূলি ও শুকনো পাতার ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টি হরিধন চৌকিদারের ঘরের ওপর নিবদ্ধ হবার প্রয়াস পায়। তার ধারণা এতক্ষণ হয়ত হরিধন জেগে নেই। কিন্তু যে ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে যেভাবে আকাশ ক্ষণে ক্ষণে গর্জে

উঠছে — তাতে তার ঘুম ভাঙেনি তো। এমন এক সম্ভাবনার দুশ্চিন্তা বিভুকে কয়েকপল স্তব্ধ করে রাখে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সাহস সঞ্চয় করে অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে তীব্রবেগে আপন উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়। ধীরে ধীরে উদ্যানের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত জলাশয়ের তীরে সে উপস্থিত হয়। যে-জলাশয় থেকে দিনভর ছিটকে পড়ে ফোয়ারার জল, আজ এই বিদ্যুচ্চমকের রাতে তার পারে থাকা কাঠের বেঞ্চটির দিকে চোখ পড়ে বিভুর। সুপরিচিত আত্মীয়ের মতো ওই বেঞ্চ যেন তার দিকে চেয়ে কুশল বিনিময় করে। কলেজে পড়ার সময় সে এখানে প্রায়ই বসত লীনার সঙ্গে। কেন আত্মহত্যা করল লীনা? কেন? উফ! কী অসহায় ছিল লীনার সেই চাহনি, যখন তার মুখ ঢাকা ছিল গোলাপি ওড়নায়। লীনার ললাট যখন লালে লাল হয়ে গিয়েছিল সিঁদুরে, তখনও যেন সে তাকিয়েছিল বিভুর দিকেই। সে কি মূর্তি হয়ে গেছিল তখন? সেই চাহনি! উফ! মুহূর্তের জন্য বিভুর সব রক্ত যেন হিম হয়ে *গেল। এক অজানা বিমর্ষতা* পলকে তাকে জবুথবু করে দেয়।

'এই তোর হয়েছে কী? বোবা হয়ে গেলি নাকি! ইস্ মদের অ্যাতো গন্ধ, ...। আমার একদম ভাল্লাগে না এই গন্ধ ...।' বিভুর গা জ্বলে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে অদ্ভুত ভাবে চিৎকার করে ওঠে — 'চুপ! একদম চুপ। একরাতের দাম তোকে দিয়েছি। আজ রাতের জন্যও তোকে কিনে নিয়েছি। সব ভালো লাগতে হবে তোর। সব। এই গন্ধ, এই শরীর ...।'

'এই আস্তে ...। চৌকিদার শুনে ফেললে ...।'

হঠাৎ যেন বিভুর চেতনা হয়। উত্তেজনায় তার চোখ খুলে যায় এবং বিস্ফারিত ঠোঁট আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসে। বিভু খু-উ-ব সন্তর্পণে হরিধন চৌকিদারের বাড়ি অতিক্রম করার চেষ্টা করে। আকস্মিক বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং গান্ধিবাগে অনাহুত প্রবেশের ভাবনায় ভীত বিভুর মুখ চমকানো বিজলিতে দেখা যায় — যেন এক অসাধারণ অনমনীয়তায় সে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। এই মুহূর্তেও, এমন সময়েও — যে-সময় বিভুর একহাতে আঁকড়ে ধরা তার রাতের রমণী লীনার মুখ তার চোখের ওপর পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে। প্রায়ই এক নির্দিষ্ট বিরতির পর সে যখন এই উদ্যানে রাতের অনাহুত ব্যক্তি হয়ে শরীরের ক্ষুধা মেটাতে আহার হিসাবে সঙ্গে নিয়ে আসে একরাত্রির একটি নারী, লীনার স্মৃতি ওই বিশেষ সময়ে তার জীবনের এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। লীনার মাথায় দগ্‌দগে সিঁদুর সেই গোলাপি ওড়নি — এই সমস্ত সযত্নলালিত দুঃখবহ স্মৃতি নিমেষে তার মনশ্চক্ষুর ওপর চলচ্চিত্রের সুন্দর মন্তাজের মতো উঁকি মেরে যায়। তারপর সে অভিপ্রেত স্থানে গতি

করে। স্মৃতি কুঠুরির এক কোণে লীনার স্মৃতি মেঘের ভেতর চাঁদ ঢুকে পড়ার মতো ইতস্তত লুকিয়ে পড়ে।

বিভু ধীর গতিতে টলতে-টলতে উদ্যানের এককোণে উপস্থিত হয়। মাঝে মাঝে বিভুর মনে হয় যে পুরো উদ্যানে একমাত্র এই স্থানটিকেই সে সবচেয়ে ভালোভাবে চেনে। জায়গাটুকুর চারদিকের গাছ-গাছড়া এমনকী পতাকা হাতে গমনোদ্যত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো গান্ধীজির মূর্তিটিও যেন তার বহুরাতের বহুবর্ণ গোপন অভিমানের নির্বিশেষ সাক্ষি। তার আগ্রহী বাহু বেষ্টিত নারীশরীরের সঙ্গেই সে এইসময় গান্ধীজির মূর্তির নিচে এসে থামে। এই মুহূর্তে তার মনে হয় যে মদের নেশায় তার দেহ সত্যিই অবশ হয়ে পড়েছে। এমনকী চোখ দুটো মেলে রাখতেও যেন খুব কষ্ট হচ্ছে। যেন যথেষ্ট চেষ্টা করে তার চোখ দুটো খুলল এবং চতুর্দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখার পর গান্ধীজির মূর্তির ওপর তার চোখ এসে স্থির হল। নেপথ্যে চমকিত বিদ্যুতের আলো আর চারপাশের ঝড়ে ছিন্নভিন্ন গাছপালার শব্দের মধ্যে স্থির ভঙ্গির স্ট্যাচুর দিকে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। হঠাৎ তার বাহুর বন্ধন ছাড়িয়ে সঙ্গীনি নারীটি উৎফুল্লিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল — 'এই যেএএএ, এদিকে তাকা! অ্যাতো ফুল!'

অদ্ভুতভাবে বিভুর ক্ষেত্রে এর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ওই মূর্তিটির দিকে। ক্ষণকাল পরেই অবাক কণ্ঠে বলে উঠল — 'গুলি মার তোর ফুল! এদিকে দ্যাখ, এদিকে ... আয়! এখানে এই দ্যাখ, ওপরে! দেখেছিস! সারা দুনিয়া বাতাসে কাঁপছে, গাছ, পাতা ... ফুল! আর দ্যাখ, ... এই পতাকা। দ্যাখ দ্যাখ ... ওই ওপরে। বুড়োর হাতে। আশ্চর্য! একদমই কাঁপছে না।' স্থান কাল ভুলে বিভু চেঁচিয়ে ওঠে — 'এই বুড়ো, তোর পতাকা কেন নড়ছে না ... কেন নড়ছে ...?' এমন সময় সঙ্গের নারীটি বিভুর মুখ চেপে ধরে। 'তুই কি পাগল হয়েছিস? হারামজাদা! এরকম বেপেরোয়া চিৎকার যে করছিস, জানিস না, ওখানে চৌকিদার আছে।' নিমেষেই বিভুর চেতনা হয়। যেন বুঝতে পারে যে বড় ভুল করে ফেলেছে। যন্ত্রবৎ তার মুখ ঘুরে যায় হরিধনের ঘরের দিকে। 'না, না, সব ঠিকই আছে' — সে আশ্বস্ত হয়। 'এই, আয় ওখানে বসি' প্রায় জোর করেই বিভুকে নিয়ে যায় ওই নারী। তোর কী হয় রে? কেন এমন হাল্লা করিস্।' বিভু চুপ থাকে। এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে আকাশের দিকে চেয়ে দুহাতে বিক্ষিপ্ত ভিজে ফুলগুলিকে খামচে ধরে। 'লছমি দেখেছিস এই ফুল! এখানে আজ এত ফুল কেন, তুই জানিস? কী করে জানবি শালা! রোজ রাতে শুধু বিক্রি হবি দুনিয়ার পুরুষের হাতে। তোর এসব জেনে কী

লাভ?' লছমির অন্তরের কোনো স্পর্শকাতর অংশে এই কথাগুলো যেন আঘাত করল। লছমি রাগে গজগজ করে উঠল — 'শালা শরম নেই। বেইমান কাঁহিকা। শালা, রাতে মাগিবাজি করবি আর দিনের আলোয় স্যুট্ টাই পরে ভাল মানুষ বনে থাকবি, ধোকবাজ শাল্লা। হারামখোর...।'

এই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায় বিভু হকচকিয়ে যায়। তারপরই তাকে কথা শোনানো দায়ে লছমির মাথার চুল ধরে টেনে আনে — 'তোর টুঁটি টেনে ছিঁড়ে নেব বুঝ্লি। আর একটা কথাও না। একদম চুপ।

ওপরে বিশেষ দিনে উপহৃত ফুলের মালা গলায় পরে গান্ধি বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। একবারও কাঁপেনি তাঁর পতাকা। এই বাতাসেও। আশ্চর্য। সারা দুনিয়া কাঁপছে। কেন নড়ছে না তাঁর পতাকা? জবাব দে তুই, জবাব দেএএএ...।' বিভু আবার চিৎকার করে ওঠে। সহসা ত্রস্ত হাতে বিভুর মুখ চেপে ধরে লছমি। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেও যেন কিছুক্ষণ দুজনের চোখ দুজনে মগ্ন হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে দুজনের মুখ আরও কাছে আসে ... আরও কাছে আসে ...।

... বহুদিনের অভুক্ত, তৃষ্ণার্তের মতো এক উদ্দাম আবেগ এগিয়ে নিয়েছিল বিভুর মুখ। কোনো এক দুর্নিবার ক্ষুধায় বিভুর কাঁপা কাঁপা রক্তিম ঠোঁট দুটো এগিয়ে এসেছিল বাসনা পূর্ণ করতে। আর হঠাৎ ওই মুখ, ওই ঠোঁট ছিটকে এল লছমির সমর্পিত মুখের ওপর থেকে। এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিভুর দেহে বইছিল রক্তের গরম স্রোত — তা-ও যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ সে গভীর দৃষ্টিতে লছমির মুখের দিকে চেয়ে রইল এবং হঠাৎ এক অদ্ভুত ভাবাবেগ বলে উঠল — 'এই। ইস্। একেবারেই তোর মতো মুখ ... তোর মতো ঠোঁট। আমার একটা বোন আছে। ওর শরীরে রক্ত আছে। তোর মতো রক্ত ...।'

অজ্ঞাত রসবোধে লছমি খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে। 'শালা, বেকুব কাঁহিকা। মানুষের শরীরে রক্ত থাকবে না তো কি দুধ থাকবে?' অদ্ভুত ভঙ্গিতে বিভু চোখ মেলে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। লছমির কথায় তার কোনো ভাবান্তর ঘটে না। শুধু তার গলা দিয়ে এক করুণ স্বর কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে আসে মাত্র।

'লছমি তুই জানিস, প্রায়ই রাতে মা বাবার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।'

'কাঁদে? তোর বাবা কি তোর মাকে মারে?'

'না রে, না। মারে না। কাউকে মারার মতো শক্তি এখন আর বাবার হাতে নেই। সারাদিন বাবা সামনের উঠোনে আরাম চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে। মাসের শেষে পেন্সনের কয়েকটি টাকা আমি এনে দিই — তা দিয়েই সংসার চলে। ননী — আমার ছোট বোন, বাবা ওকে খুব আদর করতেন। ননীর বিয়ের জন্য নেওয়া টাকার সুদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সঙ্গে কুৎসিত একটি মুখ নিয়ে বেড়ে চলেছে ননীর বিয়ের বয়সও।

'... আঃ। তোর হয়েছে কী রে? এইসব কী বলছিস? আমি কিস্যু বুঝি না ... বুঝতে পারছি না।'

এবারও বিভুর কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। নিজের ঋজু মুখের গজিয়ে ওঠা দাড়ির ওপর হাত বুলিয়ে সে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থাকে। তারপর দরদ ভরা কণ্ঠে সে বলতে শুরু করে — 'কেউ বোঝে না, লছমি। শালা, ছেলেগুলো একটার পর একটা এসে ননীকে দেখে যায়। ওর সুঠাম, সুন্দর, সুবর্ণ দেহের ওপর লোভী চোখ বুলিয়ে চোখগুলো যেখানে এসে থামে, — সেটা একটা কুৎসিত মুখ। এবার বাবা ও মার মুখের রং বদলানোর সময়। আর ননী গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে দেখে রাগে মুখ ভাঙবে না আয়না ভাঙবে ঠিক করে উঠতে পারে না। আর আমি? এই সেদিন, সরকারি চাকরি পাবার শেষ সময়টুকুও চলে গেল। রয়ে গেল শুধু বি.এ-র সার্টিফিকেট। আমার পায়ের নিচে এখন শুধু জল আর জল।'

'উফ্। কী হয়েছে তোর। মদের নেশা কী এখনও কাটেনি? মদ খাবার পর মরগদুলোর যে কী হয়।'

এক বিচিত্র ভঙ্গিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে আছে বিভু। আর তার মাথার চুলের মধ্যে লছমির নরম আঙুল বিলি কেটে দিতে থাকে। এবার বিভুর মাথা লছমি নিজের কোলে টেনে নেয়। অজানা এক স্নেহবোধে লছমি বিভুর মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে দেয়। এই অন্ধকারেও পরস্পরের চোখ উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। নেশাগ্রস্ততায় আড়ষ্ট বিভুর হাত দুটো একসময় লছমির অসমতল দেহে অস্থিরভাবে বিচরণ করতে থাকে। চারপাশে গাছ, বন হু হু করে কাঁপতে থাকে, ঝড়ের দাপটে। উড়ে উড়ে লছমির শাড়ি একসময় বিভুর মুখ ঢেকে দেয়। এবং এই ঝড়ে অকম্পিত পতাকাটি নিয়ে গমনোদ্যত গান্ধীমূর্তির গলায় বিশেষ দিনের উপহার হিসেবে ঝুলন্ত মালাটি ছিঁড়ে পড়ে আছে। সেই ছিন্ন ফুলের ওপরে ক্রমশ কাছাকাছি আসার প্রয়াসী একজোড়া নর-নারী অন্ধকার ছুঁয়ে থাকা বিষধর সর্পের মতো অবিকল, এই সমস্ত দৃশ্য-পরিদৃশ্য চমকিত বিদ্যুতালোকে থেকে থেকে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

অকস্মাৎ বিভু চমকে ওঠে এবং তার তৎপর হাত লছমিকে স্পর্শ করে। আবেগে বুজে আসা লছমির চোখে বিভু তার গাল ছুঁইয়ে নেয়, যেখানে সে বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে বলে অনুমান করেছিল। এখন হাত দিয়ে দেখল যে তা বৃষ্টি নয়। তৎক্ষণাৎ

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল যে, এই প্রচণ্ড তুফানেও অকম্পিত গান্ধির হাতের কংক্রিট-পতাকার উপর বসে রয়েছে একটি চড়ুইপাখি। কিছু একটা অনুমান করে লছমি হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল। দস্তুরমতো বিব্রতবোধ করল বিভু। একটু সময় সে চুপ করে রইল এবং তারপরই অনতিদূরে ডালপালাভরা একটি গাছের দিকে ছুটে গেল উন্মাদের মতো। গাছটির চারদিকে ঘের দেওয়া ইটগুলির মধ্যে থেকে একটা ইট হাতে নিয়ে সে চিৎকার করে উঠল — 'এ পতাকা — এ পতাকা। এমন দমকা বাতাসেও নড়ছে না। আর সে তার মাথায় একটা জীবন্ত পাখি পুষছে। আর ওই শাল্লা মানুষের মুখে ...।' এই মুহূর্তে হরিধনের কথা একবারও না-ভেবে বিভু বিকটভাবে চেঁচিয়ে উদ্যান কাঁপিয়ে দিল ও একসময় হাতের ইটটি পতাকার দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারল। পলকেই কংক্রিটের সেই বিশাল পতাকা নিচের পাকা মেঝেতে পড়ে ঠং ঠং শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ঝড় তখনও বইছিল, আকাশে বেজে চলছিল মেঘের দুন্দুভি। ইতিমধ্যে উদ্যানে বেজে ওঠা সেই অদ্ভুত শব্দে সজাগ হরিধন চৌকিদার শুধু দেখল যে গগনে সঘন বিচ্ছুরিত বিদ্যুতালোকে বাগানে উদভ্রান্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে একজোড়া নর-নারী।

।। অনুবাদ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য।।

লিয়াকৎ

মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য

যখন আমি স্কুলে পড়তাম আমাদের স্কুলে লম্বা, বেঁটে, কালো-সাদা, শক্ত-ক্ষীণ অনেক ছেলে-মেয়েরা পড়ত। বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। স্কুলটির নামটাও ছিল মক্তব। একটি ক্ষীণ অথচ সুগভীর নদীর পারে সকাল-দুপুর আজানে মুখরিত হয়ে থাকা একটা মসজিদ আর তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল আমাদের আদরের স্কুলটি। দরজা-জানালা না থাকা একেবারে সাধারণ স্কুল — মক্তব। স্কুলটির প্রতি আমার আদরের ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না, কিন্তু স্কুলের নামটির জন্যেই আমি কিছুটা অসুবিধেয় পড়েছিলাম।

আমরা হিন্দু, তাতে আবার ব্রাহ্মণ। কর্মসূত্রে আমার বাবাকে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল বলেই হয়ত তিনি কিছুটা উদার মুক্তমনা ছিলেন। কিন্তু আমার কাকা, জ্যেঠা বা মামার বাড়ির দিকের আত্মীয়-স্বজনরা যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য হিন্দুরের থেকেও তারা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। কোচ, কেওট, কৈবর্ত ইত্যাদিদের থেকেও তারা বেশ দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। সে জায়গায় মুসলমান হলে তো আর কোন কথাই নেই। তাই আমার স্কুলটাকে নিয়ে তারা এক ধরনের চিন্তাতেই ছিলেন। কারণ, বাবার চাকরিস্থল সেই অঞ্চলটির আশে পাশে আর কোন ভাল স্কুল ছিল না। বড় নিরুপায় হয়ে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কখনও কখনও তারা বলে ফেলতেন — 'মক্তবেই পড়তে হল, মিএগদের স্কুলে!'

তীক্ষ্ণ একটা শেল যেন আমার বুক ভেদ করে আমাকে আহত করে তুলত। আমি রীতিমত অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছিলাম। আমার আদরের দাদুর আধি ক্ষেতির মিএগ-কৃষকদের কৃশ মুখগুলি আমার চোখের সামনে পেন্ডুলামের মত দুলতে থাকত। ভাবতে ভাবতে মনে বড় দুঃখ হত। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু শরীররে, হৃদয়ের, স্নেহ-ভালোবাসার কোন পার্থক্যই দেখতে পেতাম না। মনে মনে আমি আমার আত্মীয়স্বজনের এই মনোভাবকে মেনে নিতে পারছিলাম না।

হ্যাঁ, নিজের অজান্তেই সেই শৈশবে বুকের মধ্যে রোপিত হয়েছিল জাত-পাতের

অনেক ঊর্ধে মানবপ্রেমের বীজ। নিজের অজান্তেই মক্তবকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। শুনেছিলাম, অন্ধকারে সাপের মাথার মণি থেকে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। আর সে রকম এক স্বর্গীয় জ্যোতিকেই কল্পনা করে মাঝে মধ্যে আমি আমার হাতের তালুতে একটা মটরদানার মত গোল মুক্তার মণি উজ্জ্বল রোদে তুলে ধরার কল্পনা করতাম। তার থেকে কিচ্ছুরিত হওয়া সর্পমণির মত স্বর্গীয় রূপের চোখ ঝলসে দেওয়া জ্যোতি। ধীরে ধীরে সেই মুক্তার আকার বেড়ে গিয়ে আমার স্কুলঘরের আকার নিচ্ছিল। মক্তবের প্রকৃত অর্থ আমি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জানতে চাইনি। রোদে তুলে ধরা মুক্তার যে স্বর্গীয় রূপ আমি কল্পনা করেছিলাম, মক্তব মানেও আমি সেই অর্থেই ধরে নিয়েছিলাম।

মক্তবে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করত আব্দা। সেই শৈশবে তার যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল, তাতে আমি অত্যন্তপ্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে তাকে অনুসরণ করতাম। সেই ছোট শহরের একজন নামি ব্যবসায়ী আব্দার আব্বাজানের সঙ্গে আমার পিতার সহৃদয়তা গড়ে উঠেছিল। উৎসবাদিতে আমরা একত্রিত হতাম। সম্পূর্ণরূপে রুচিবান সেই মানুষটির কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তাম। আর তেমনই কোন আনন্দঘন মুহূর্ত আমি আব্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম — 'তোমার আম্মা কেন সিঁদুর পরে না?'

— 'উচিত কী হবে?'

— 'কিছুই হবে না, কিন্তু আমার ধর্মে নিষেধ রয়েছে বলেই পরে না।'

তার ধর্মজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নিজেকে বড় অবোধ, বোকা বলে মনে হচ্ছিল। আর ধীরে ধীরে আমার নিজেরও আমার ধর্ম সম্পর্কে ঔৎসুক্য বেড়ে চলছিল। ধর্মীয় উপাখ্যানগুলি পড়ার পরে আমিও আমার পিতাকে অজস্র প্রশ্ন করে আমার ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলাম।

আমাদের স্কুলটা মসজিদের পাশে বলেই দুপুরের টিফিনের ঘণ্টা বাজলেই নামাজের জন্যে একদল ছাত্র সবসময়েই মসজিদে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকত। শুক্রবারে সেই সময়টা আরও বেশিক্ষণের জন্য হত। এমন কী আশ্চর্য আকর্ষণীয় রূপ আল্লার, যা দেখার জন্য ছেলেরা তাদের প্রিয় খেলাধুলা ছেড়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়? আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। খুব ইচ্ছে করত মসজিদের ভেতরে থাকা আল্লাকে দেখার জন্যে। কিন্তু আমি যে হিন্দু। মসজিদের মধ্যে কোন হিন্দু প্রবেশ করলে কোন জনাব টিটকিরি দেবে ভেবে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে এসেছিলাম।

আরও একদিন অনুচ্চস্বরে আমি আব্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের

মসজিদের ভেতরে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে? ...সবার অজান্তে আমি একবার আল্লাকে দেখব। মাত্র একবার ...।'

আব্দা শুধু আস্তে করে হেসেছিল। কোন উত্তর দেয়নি। হায়, আব্দার মাধ্যমে মসজিদের ভেতর ঢোকার আশা আমি একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু বড় সঙ্গোপনে বুকের বুকের মধ্যে লালন করছিলাম সেই আশা। খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সোনালি সুযোগ।

অবশেষে একদিন সেই সুযোগও এসে গেল। স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষার শেষদিন আমরা সব ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের বাইরে খোলা জায়গায় খেলতে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটা ভ্যাবলা ছেলে পড়ত। যেখানে সেখানে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। কেউ আস্তে করে একটা ধমক দিলেও সে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিত। সেদিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার আনন্দে, কি জানি কি ভেবে তাকে ক্ষেপানের জন্যে তার হাত থেকে পিচবোর্ডটা কেড়ে নিয়ে আমি উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ঘুরে গিয়ে পাশের মসজিদের সীমানার ভেতর পড়েছিল। ছেলেটির চিৎকার করে কান্না শুনে চৌকিদার দাঁত কড়মড় করে তাড়া করে এসেছিল — 'কে? কে ফেলেছে ওটা?'

'আমি। এখনই আমি ওটা এনে দিচ্চি। বলেই আমি মসজিদের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগিয়েছিলাম। পেছন থেকে করুণ চিৎকার করছিল — 'ঐ যাস না, চলে আয়। ওখানে ভূত আছে। চলে আয়, চলে আয়। কিন্তু আমি এহেন সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়তে চাইছিলাম না। কারো কোনরকম ওজর আপত্তি না শুনে মসজিদের সীমানায় পা রেখেছিলাম। পিচবোর্ডটা ঘাসের উপরে পড়ে থাকতে দেখেও সেটাকে পেরিয়ে আমি এক নিঃশ্বাসে মসজিদের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ...নাই। কোনকিছুই ছিল না। ভগবানের মাথার পেছন দিকে স্বর্ণাভ রশ্মিতে চোখ ঝলসে দেওয়া সাইকেলের রিঙটার মতো উজ্জ্বল একটা রিঙের কথা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। আর মসজিদের ভেতর কোন ধরনের প্রতিমা বিগ্রহ না থাকলেও চরকির মতো অবিকল একটা রিঙ শূন্যের মধ্যেই ঘুরতে থাকার উদ্ভট একটা কল্পনা আমার মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

স্কুল থেকে মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ে যেতে ধুপপুক করতে থাকা আমার বুকটা যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। কিছুই যে ছিল না সেখানে। আঃ শূন্যের মধ্যেই ঝুলে থাকা স্বর্ণাভ রশ্মি ছড়ানো চরকির মতো ঘুরতে থাকা সাইকেলের রিঙটার মত রিঙ একটা তো থাকতে পারত তাতে। যে দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রিয় খেলধূলার আকর্ষণ ছেড়ে

সমবয়সী ছেলেরা স্কুলের বিশ্রামের সময় মসজিদের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। বার বার। বড় হতাশার সঙ্গে আমি আমার দৃষ্টিটাকে মেঝের মধ্যে নামিয়ে এনেছিলাম। কোথাও কিছু ছিল না। কেবল বারান্দায় উঠে দুটো শালিখ পাখি কথা বলছিল তখন।

এই বিষয়ে আমি কাউকে যদিও কিছুই বলিনি, আব্দাই যেন আমার মনের হতাশার কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদের ঘরে যাবার জন্যে ঘনঘন তাগাদা দিচ্ছিল।

লিয়াকৎ নামে আব্দার এক ভাই ছিল। সূঁচলো নাক, গোলাপি ঠোঁটের সেই ভাইটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর ভাঙা ভাঙা স্নেহময় সুরে সে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আব্দার নানি ভিজে কাপড় রোদে শুকোতে দেবার মত করে সেওয়াই মেলে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে ধূপকাঠিও তৈরি করত। নানির খাটিয়ার আশেপাশে একটা ছোটখাটো ধূপকাঠির ব্যবসাই গড়ে উঠেছিল। কণ্ঠা বের করা ছেঁড়া গেঞ্জি পরা দুটো লোক সাইকেলে বোঝাই করে সেগুলিকে বেচার জন্যে নিয়ে যাবার দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ধূপের প্যাকেটের উপর লেখা উর্দু না আরবি অক্ষরগুলিকে উড়তে থাকা এক ঝাঁক পাখির মতো মনে হয়েছিল আমার। আগরের ব্যবসা করা আব্বাজানকে প্রায়েই আগ্রাতে থাকতে হত। তিনি কথার মধ্যে উর্দু শব্দ ব্যবহার করতেন। আর দুচোখে সুর্মা এঁকেছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী সেই লোকটির সঙ্গে আমার পিতার সহৃদয়তা ছিল অত্যন্ত গভীর। সেই ছোট শহরটিতে দুয়েক বছর থাকার পরে আমরা অসম ছেড়ে চলে এসেছিলাম। দিল্লি, বেনারস, তারপর আগ্রায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর একদিন পুনরায় অসমের বাইরে আব্দাদের পরিবারটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সময় এগিয়ে যাচ্ছিল। পরিবর্তিত হয়েছিল বিভিন্ন ঋতুর উৎসব। আব্দার নিকাহ হয়ে গিয়েছিল। সে সাহারানপুরে থাকতে শুরু করেছিল। নানির মৃত্যু হয়েছিল। আর লিয়াকৎ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে ছিল। অনেক বছর পরে ঈদের সময় তার সঙ্গে আমার তাদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল। তার সেই সুকোমল রাজকুমারের মত চেহারা পরিবর্তিত হয়ে পেশীবহুল পৌরুষদীপ্ত চেহারায় পরিণত হয়েছিল। বুকের অতল গহ্বর থেকে তার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছিল। মুখমণ্ডলে তার সবসময় সন্তোষের আভা ছড়িয়ে থাকত। ... গ্রিক দেবতার মতো দুচোখের পাতা নমনীয় করে হঠাৎ সে একদিন তার দুহাত দিয়ে আমার দুই বাহু খামছে ধরে বলে উঠেছিল — 'আমি তোমাকে ভালোবাসি নয়না। ... দেখ, আমার চোখের দিকে তাকাও। আমি তোমাকেই ভালোবাসি।' দুরন্ত গতিতে যেতে থাকা গাড়ির ক্লাচ-ব্রেক সজোরে থামিয়ে দেওয়ার মতো আমি চমকে উঠে মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে দিয়েছিলাম। আর

সেই হেলানো মাথা যে কখনো সোজা করতে পারব, সে আশাটাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে তুফান বইছিল। মাঝে মাঝে মন্দির এবং মসজিদের মধ্যে একটা কংক্রিটের দেওয়াল গড়ে উঠেছিল। হায়, কেবল পারব না। তুফানই ছিল। আর কখনও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি আমার হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারব না। আর কখনও বা প্রেম-ভালোবাসার স্নিগ্ধ অনুভবে সেই তুফান মলয়-বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। একটা স্বর্ণালি জ্যোতির সাইকেলের রিং, গ্রিস মাধব মন্দির এবং পোয়া মক্কার মধ্যে অহরহ আসা যাওয়া করছিল।

হায়, ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে যমুনার বালুকাবেলায় লিয়াকৎ বড় উদগ্রীব তার সঙ্গে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সজারুর মতো কান খাড়া করে পরম উৎসুক্যতার সঙ্গে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। যমুনার বুকে সূর্যাস্তের কোমল আভায় বর্ণময় ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে আমি ডাইনে বাঁয়ে ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়ছিলাম। আঃ হঠাৎ যেন মরালী। খোলা জামার ফাঁক দিয়ে জ্বল জ্বল করতে থাকা গ্রিক দেবতার মতো তার প্রশস্ত বুকটার দিকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে সে পাগলের মতো না না করে তার অনুরাগের তীব্রতার দোহাই দিয়ে কীসব বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনও অন্য হাতটা দিয়ে আমার হাতটা খামচে ধরেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা যেন সত্যিই ...। উত্তেজনায় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দূরের একটা বালির স্তূপ প্রচণ্ড লাথিতে ভেঙে রেখে তারপরেই ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার হৃদয়ের বিধ্বস্ততার অনুমানে আমার ভেতরের মানুষটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। হায়, লিয়াকতের অনুরাগে রঞ্জিত হতে চেয়েও আমি জ্বলে পুড়ে গিয়েছিলাম। হাড়ে হাড়ে, ধমনি শিরায় দুরন্ত গতিতে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল ধর্মের দোহাই। আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকা লিয়াকৎ ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে আমার পা দুটিতে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আর ভেঙে ছিঁড়ে জ্বলে পুড়েও তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। সন্ধ্যার যমুনার স্নিগ্ধ সমীরে আমার শাড়ির নীল আঁচল লম্বা চুলের সঙ্গে মুক্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

গভীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, লিয়াকতের ভালোবাসাকে গ্রহণ করেও কার জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। ধর্ম, হায় ধর্মের জন্যেই। পিতা নিয়মিত জপ করতেন। দুবেলা কালীর সহস্র নাম জপ করতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মা উপোস করতেন। প্রত্যেক শুক্রবার সন্তোষী মা'র, প্রত্যেক মঙ্গলবার হনুমান চালিসার দস্তুর মতো শ্রবণ কীর্তন হত আমাদের বাড়িতে। প্রত্যেক সোমবারে উপোস থেকে আমি শিবপুজো করতাম। বাড়ির একমাত্র সন্তান বলে আমার উপরেও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছিল আর তা কখনও ছাড়তে না পারা অভ্যাসে পরিণত কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কালী, তারা, সরসী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গি, কমলা, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মা কালীর এই দশনাম সব সময় জিহ্বার অগ্রভাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। 'নমঃ তাম্বকম যজামহেঃ সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম, উর্বরোকামিদং বন্ধনাৎ মৃত্যুমুখীনাং মা মৃতৎ স্বাহা।' আহা, কী অপূর্ব সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। যা আমার শিরায় শিরায় রক্ত হয়ে টগবগ করছে। পারব না, পারব না নিরাকার আল্লা, মক্তব, লিয়াকৎ সবাই সঙ্গে থাকলেও সেই রক্ত হারিয়ে গেলে আমি যে বেঁচে থাকতে পারব না। একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে হবে যে।

লিয়াকতের অনুরাগ কানে বাজলেই জোরে জোরে আমি ইষ্টদেবতার নাম নিতে শুরু করেছিলাম। আমার হৃদয়ের সকাতর আতুরতাকে অগ্রাহ্য করা এক ধর্মভীরু কঙ্কাল হয়ে পড়ছিলাম আমি। আর, আর বুকের মধ্যে তুফানের তাণ্ডব নিয়েই আমি আগ্রা থেকে পিতার কর্মসূত্রে কাঞ্চিপুরমে পৌছেছিলাম। দিনগুলি গতানুগতিক ভাবে পার হয়ে যাচ্ছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম.এ পাশ করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের সামাজিক পরম্পরাতেই আমার অপরিচিত কোন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল।

বিয়েতে লিয়াকৎ আসেনি। একটা জরির কাজ করা নীল শাড়ি আর এক বাক্স ফিরোজ মণির অলঙ্কার আম্মির হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। হাত পেতে প্রসাদ নেবার মত করেই লিয়াকতের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেই আমি দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। বোঝতে না পারা এক অব্যক্ত অনুভূতিতে আমার ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছিল। মোম হয়ে আমি যেন ধর্মের নামে জ্বলছিলাম। আর হৃদয়টা গলে গলে ছাই হয়ে গিয়েছিল পোড়া ম্যাগনেসিয়ামের ছাইয়ের মত। আঃ কী যে অবর্ণনীয় হাহাকার সেটা। দুহাতে মুখ ঢেকে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। প্রথমদিন এসেই বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় যেন আজান দিচ্ছিল। সুরটা যেন আগ্রা থেকে একটু অন্য ধরনের। পরের দিন সকালবেলাতেও শুনেছিলাম। মাঝে মাঝে আমি বড় অবাক হয়ে যাই যে আজান দেয় তার কণ্ঠে কোন ধরনের জড়তা থাকে না। অডিশনে পাশ করা কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়। হাড় কাঁপনো ঠান্ডাতেও কি জড়তাবিহীন কণ্ঠস্বর! আজান শুনলেই আমি পাথর হয়ে যাই। রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চল হয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে আজান শুনতে থাকব, দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাতেই। এটা আসলে কী হলদে করবীর কলি ছিঁড়ে এনে চুষে চুষে আকণ্ঠ মধু পান করার মত

এক অনন্য শ্রুতিমাদকতা। তা যে স্বর্গীয় বন্দনা। যেখানে একাকার হয়ে যাবে সমস্ত মানুষের প্রার্থনা।

তবে তা সম্ভব নয়। কোন সুললিত বন্দনা মানুষকে বিভোর করে রাখতে পারলেও একাকার করতে পারে না। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই তা পারে না। রাম জনমভূমি, বাবরি মসজিদের ইস্যু নিয়ে লোকেরা পাগল হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর ধর্মীয় বোঝাবুঝি তথা প্রতিষ্ঠানগুলি যেন কোথাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। খবরের কাগজগুলি অশান্তিতে ভরে উঠেছিল। পৃষ্ঠাগুলিতে বাদানুবাদ ছাড়াও সর্বসাধারণের দুঃখ দুর্গতির সংক্ষিপ্ত আভাসাও প্রকাশিত হচ্ছিল। তার মধ্যে প্রধানত তিনটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি নিহতের, দ্বিতীয়টি আহতের আর তৃতীয়টি নিরুদ্দিষ্ট হওয়া লোকজনদের। তৃতীয় তালিকাটিতে একদিন চোখ বুলোতে গিয়েই চোখের সামনে সমস্ত কিছু একাকার হয়ে এলো। হ্যাঁ, লিয়াকৎ, নামই ওটা। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মত আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। দৌড়ে গিয়ে বিছানায় আছাড় খেয়ে পড়লাম। বুকের ভেতরটা সাইক্লোনে যেন তোলপাড় করে তুলছিল। পরের মুহূর্তেই অনুভব করছিলাম এক বিরাট শূন্যতা। নিরাকার আল্লার মত লিয়াকতের জন্যও আমি হৃদয়ে এক অনামী আসন পেতে রেখেছিলাম। যমুনার বালিতে দাঁড়িয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের মত লিয়াকৎকে আমি বলেছিলাম, 'হয় আমার মুসলমান হওয়া উচিত ছিল, নাহয় তোমার হিন্দু হওয়া উচিত ছিল।' আমার কথা শোনামাত্র ধর্মগুরুর মত গদগদ কণ্ঠে সে যেন ঘোষণাই করছিল, 'হিন্দু মুসলমান এ সমস্ত কোন কথাই নয় নয়না। তুমি কেবল আমার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাও। জান কি তুমি, তুমি জান কি ভালোবাসা কী করতে পারে? ভালোবাসা ঈশ্বর আল্লা একাকার করে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এ সমস্ত কী ছিল? রাম জনমভূমি, বাবরি মসজিদের মত ঘটা পাগলামিগুলি?

লিয়াকতের প্রতি আমার উদ্বিগ্ন মনোভাব আমি একাই অনুভব করছিলাম। কারো সঙ্গে সেই মনোবেদনা ভাগ করে নেবারও কোন উপায় নেই। এদিকে আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল ছোট্ট একটি প্রাণ। ক্রমশ স্ফীত হয়ে ওঠা আমার উদরের টনটনে ভাবটা আমাকে রাতের বেলা শুতেও দিচ্ছিল না। কেবল আজানের স্বর্গীয় বন্দনা শুনলেই যেন শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ত। সারাটা রাত এপাশ ওপাশ করতে করতেই সময়টা বড় শ্লথভাবে পার হয়ে যেত। আর এমনই ক্লান্তিকর সময়গুলিতে ইষ্টদেবতার নাম নিতে গিয়ে বার বার আমার লিয়াকতের কথা মনে পড়ত। কী হল লিয়াকতের? তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে কি? যদি এখনও তাকে না পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে কোথায় কীভাবে সে আছে? হে আমার ঈশ্বর, সে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে

অক্ষত রেখো। তার পেশীবহুল গ্রিক দেবতার মত শরীর যার মধ্যে থাকা হৃদয় কেবর আমারই জন্যে স্পন্দিত হত তা যেন অটুট থাকে। সে যেখানেই থাকুক না কেন, কোনভাবে আমাকে সেটা জানিয়ে দাও। একই পরমপিতার সন্তান আমরা। কেউ বা আকারের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়, আর কেউ বা নিরাকারের মধ্যে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য একটাই। পথটা কেবল ভিন্ন। তাই যদি হয় তাহলে কার জন্যে কে কাকে হত্যা করে? কেন এরকম হয়!

হ্যাঁ, একমাত্র প্রেম, একমাত্র প্রেমই ঈশ্বর-আল্লা সব একাকার করে দিতে পারে। তুমি ঠিকই বলেছিলে লিয়াকৎ। যার হৃদয় প্রেমময় হয়ে পড়ে, যার শরীরে সেই হৃদয় বাস করে, সেই শরীরই তো ধর্মগুরুর মত গদগদ কণ্ঠে বলতে পারে, দেখ আমি মানুষ। আমি প্রেম। আমি প্রেমময় মানুষ।

ইশ্, লিয়াকৎ এ সমস্ত কী বলেছিল, যুক্তিতর্কের তুফানের অনেক ঊর্ধে দাঁড়িয়ে এসমস্ত কীসের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিল সে। তার আল্লার সঙ্গে আমার ঈশ্বর যদি একাকার হতেন, তাহলে নিশ্চয় প্রেমের মহৎ বীজ বপন করতে পারতাম। না না, তা বলে কোনোদিন তার সঙ্গে এক বিছানায় শোবার স্বপ্ন কোনদিন আমার কল্পনাতেও আসেনি। প্রভাতের সোনালি সুযোগ আমি যেন পেয়েও হারিয়েছিলাম। লিয়াকতের প্রতি অনুভূত হওয়া এক অহেতুক প্রেম আমাকে মাকড়সার জালের মত চারদিকে থেকে ঘিরে ধরেছিল। আমি যেন উত্তাল হয়ে হাতে খোল-করতাল নিয়ে বৃন্দাবনের সংকীর্তনে মেতে উঠেছিলাম। হে পরমপিতা, হে সর্বশক্তিমান একাকার কর, ঈশ্বর আল্লা একাকার কর ...।

সমস্ত রাতের অনিদ্রাজনিত যাতনা, লিয়াকতের প্রতি সঙ্গোপন বিষাদগ্রস্ততা আমাকে পিষে আঁখের ছিবড়ের মত করে ফেলিছিল যেন। স্বামী আমাকে কাঞ্চিপুরমে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলেন। আর একদিন আমরা কাঞ্চিপুরমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের জন্যে মা রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। তাই আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে থাকা পিতাকেই আমি অকস্মাৎ লিয়াকতের খবর জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

অনেক কথায় উন্মুখ হয়েও যেন অকস্মাৎ নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হাতে ধরে আমাকে পাশে বসিয়েছিলেন আর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিলেন নিয়তির অমোঘ বক্তব্য।

....

বাঁধা তাবিজ, পিঠের কালো তুলসি, হাঁটুর নিচে ছোটবেলায় সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সেলাইয়ের মস্ত দাগ। হায়, ওটা লিয়াকতেরই মৃতদেহ ছিল। মার সঙ্গে আগ্রায়

গিয়ে আম্মির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ঘোর ঠান্ডায় জীর্ণ হয়ে যাওয়া লতাপাতাহীন গাছের মত খুঁটিতে হেলান দিয়ে তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। নানি, লিয়াকতের কাছে না থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আব্বাজানও ছিলেন না যে। হজ করতে গিয়ে সেই পুণ্যাত্মা তখনও ফিরে আসেননি। ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনা আম্মির উদাস চাহনি আমার মধ্য শরীরের ফুলে ওঠা অংশটাতে এসে কেমন যেন চমক খেয়ে থমকে গেল।

'আমার ছেলে মরেনি নয়না। সে আসছে। আমি জানি।' করুণ হাসিতে আম্মি আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কোন ধর্মীয় কংক্রিটের দেওয়ালকে গ্রাহ্য না করে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। বাধাহীন ভাবে বয়ে চলেছিল দুই নিঃস্ব নারীর শোকাশ্রু... নিচের দিকে। চোখ থেকে আমাদের শরীর অতিক্রম করে একেবারে দাঁড়িয়ে থাকা ভূমিখণ্ডের নিচে পর্যন্ত। যে ভূমি কখনও রক্তে রঞ্জিন হবে না। যেখানে একাকার হয়ে যাবে ... জনমভূমি, বাবরি মসজিদ। আর সেই পূণ্যভূমিতে একদিন জন্ম নেবে আমার সন্তান। আম্মির লিয়াকৎ। আমার লিয়াকৎ, যে ঈশ্বর আল্লার এককার হওয়াকে বাস্তবায়িত করে তুলবে একদিন।

।। অনুবাদ : বাসুদেব দাস।।

কালবেলা

মদন শর্মা

চন্দ্রমার তন্দ্রা এসেছিল মাত্র। তখনই বাইরে ধুপধাপ দৌড়নোর শব্দ আর সাথে চাপা ভয়ার্ত চিৎকার শুনে তিনি বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে রইলেন। ভয়ানক শব্দগুলো কোনদিক থেকে আসছে — রাস্তার দিক থেকে না পিছন দিকের উঠোন থেকে স্থির করতে না পেরে তিনি একমুহূর্ত অপেক্ষা করলেন। আবার দৌড়ঝাঁপের শব্দ আর চিৎকার শুনে স্থির থাকতে না-পেরে এক লাফে দরজাখোলার জন্য এগিয়ে গেলেন।

অন্ধকারে মরমীর পড়ার টেবিলে ধাক্কা লেগে চন্দ্রমার মাথা ঘুরে গেল, দেওয়াল ধরে পিছনদিকের দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। ঘন অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ঘুমের ঘোরে সবকিছু তাঁর কাছে আরো অস্পষ্ট লাগে। ঘরের ভেতর আর বারান্দার লাইট জ্বালিয়ে তাড়াহুড়ো করে বারান্দায় আসামাত্র তাঁর যেন কী হয়ে গেল। তাঁর শরীরে অদ্ভুত ধরনের কম্পন শুরু হয়েছে, গলা শুকিয়ে আসছে, চারটা মস্ত কুকুর সাদারঙের হৃষ্টপুষ্ট খরগোশটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাণরক্ষার জন্য বেচারা মূক পশুটির কী কাতর হৃদয়বিদীর্ণ আর্তনাদ। শূন্য খাঁচা, লোহার খাঁচার রড ভেঙে কীভাবে যে বেচারাকে টেনে নিয়ে গেল, হয়তো একমিনিটের মতো সময়, তিনি ভয়ে উত্তেজনায় এবং দুঃখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, বারান্দা থেকে নেমে হাতের কাছে পাওয়া একটা ইটের বড়ো টুকরো সর্বশক্তি দিয়ে ছুড়ে মেরে চিৎকার করলেন 'হেই হেই'। খরগোশটিকে কুকুরগুলো টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে একলাফে নিচু দেওয়াল পার হয়ে বড়ুয়াদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বেচারা খরগোশ প্রাণপণে মাটি আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। কীভাবে চারটা হিংস্র জন্তুর সঙ্গে একাই লড়াই করল।

চন্দ্রমা টলতে টলতে ফিরে এসে মরমী ও তার বাবাকে ডাকলেন। দুজনেই তাঁর পিছনে পিছনে ছোট উঠোন পার হয়ে পাকা দেওয়ালের পাশ থেকে ওই পাশের অন্ধকারের দিকে তাকালেন। কচমচ শব্দ। অনুমান করা যায় দুটো কুকুর খরগোশটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার কোমল দেহটাকে তারা ছিঁড়েখুড়ে ফেলছে।

চন্দ্রমা খাঁচাটির পাশে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। একমুঠো সাদালোম মাটিতে পড়েছিল। আলতো করে লোমগুলো হাতে তুলে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন, মরমী মায়ের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল। তার বাবা নির্বাক হয়ে খাঁচাটির দিকে তাকিয়ে আছেন, চন্দ্রমা কেঁদে কেঁদে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন — 'তুমি কী দেখছ? ইস্, কীভাবে বেচারাকে ঘিরে-ধরে মারল।' মাটিতে খরগোশটির নখের আঁচড় স্পর্শ করে বললেন — 'দেখ তো বেচারা কীভাবে মাটিকে আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। একটু আগে কেন বুঝতে পারলাম না।' মা মেয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে এলেন। দুজনেরই দৃষ্টি এখনো দেওয়ালের ওপারের অন্ধকারে। চন্দ্রমা বলতে লাগলেন — 'এমনকী পড়তে বসেও মরমী ওকে কীভাবে কোলে নিয়ে বসে থাকত। অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছিল। খুব শান্ত ছিল, লালচেরির মতো চোখ দুটি নিয়ে তাকিয়ে থাকত। খিদে পেলেও কিছু বলতে পারত না। কীভাবে আর্তনাদ করছিল বেচারা, ইস্ আমি কিছুই করতে পারলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম।'

চন্দ্রমা নীরবে কাঁদতে লাগলেন। স্বামী প্রশান্ত মা-মেয়েকে কোনোভাবে বুঝিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন। তিনটে বেজে গেল। আশেপাশের লোক জেগে গেলে অন্য কিছু হয়েছে বলে ভাববে। কী বলে ভাববে? ভাবতেই ভয় লাগল প্রশান্ত চৌধুরীর।

চন্দ্রমা মেয়ের পাশে শুয়ে প ড়লেন। 'আমার মাথা ঘোরাচ্ছে'। মরমী উঠে গিয়ে সর্ষের তেল আর জল মিলিয়ে মায়ের মাথায় ঘষে দিল। ইস্ একে কীভাবে ঘিরে ধরে মারল। মরমীর দুচোখে জল ভরে আসল। 'মা, আর বলো না, তার হয়তো এভাবেই মৃত্যু হতো, খরগোশরা এমনিতেই বেশিদিন বেঁচে থাকে না না।'

মরমী চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে। এখন বড়োদের মতো কথা বলতে শিখেছে — গম্ভীর গম্ভীর। হয়তো সময় এবং পরিস্থিতি শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোর ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। প্রশান্ত বললেন — 'এমনিতেই চিন্তায় ঘুম আসে না — তার মধ্যে...।'

ঘরে কম আলোর বাল্ব জ্বলছিল। ঘরটিতে আবার থমথমে নীরবতা নেমে এল। মরমী এখন ঘুমে। ও কম আঘাত পেয়েছে? চন্দ্রমা আর প্রশান্তের চোখে ঘুম নেই। এমনি করে কতোদিন সকাল হওয়ার অপেক্ষায় দুজনেই বিছানায় জেগে থাকে — নীরবে গভীর বেদনায় অসহায়ভাবে। হঠাৎ সামনের দিকের পাকারাস্তায় ভারি পা ফেলে কে যেন হেঁটে চলে গেল। চন্দ্রমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — 'আমাদের এখানে আসবে নাকি?' প্রশান্ত বিরক্ত হলেন — 'আমি কী জানি?' পরমুহূর্তেই তাঁর

খারাপ লাগল, মায়ের মন, কত দুঃশ্চিন্তা, কত মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্চে তাকে। চন্দ্রমার পিঠে আলতো হাত রাখলেন, কতবার পুলিশ এসেছে। ঘর তছনছ করে চলে গেছে। একটাই প্রশ্ন — প্রণব এসেছিল কি? সে কোথায় আছে? অস্ত্র আর টাকা পয়সা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? প্রশান্তকে দুবার ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। যদিও ওরা মারধর করেনি। মরমী মা বাবার মনে এখনও শিশু হয়ে আছে। ঘর সার্চ করা লোকগুলোর কুৎসিত চাউনি মা বাবাকে বুঝিয়ে দিল — সে যৌবনের দুয়ারে পা রেখেছে। জীবনটার প্রতি মরমীর ভয় জাগল। জীবনের সুন্দর রূপটা তারা কখন দেখবে। হয়তো হিংসা, সন্ত্রাস, ক্রুরতা, বীভৎসতার মধ্য দিয়েই পার হবে তাদের যৌবনের দিনগুলো, ভাবলেই প্রশান্ত দুঃখ পায়, মনে জাগে হতাশা, ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করার দায়িত্ব তো তাঁর মতো অধ্যাপকের কাঁধে ন্যস্ত। কিন্তু কতদিনের জন্য? হঠাৎ চন্দ্রমা উঠে বসলেন। স্বামীর হাত ধরে আকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন — 'আচ্ছা বাবাসোনা কী ভালোই আছে?'

'ভালোই আছে, নিরাপদেই আছে, চিন্তা করো না তো, ঘুমাও তো অল্প।'

প্রশান্ত নিজের কথাই বিশ্বাস করেন না। কারই বা নিরাপত্তা আছে এখানে? তিনি ছেলের কথা ভেবে ব্যথিত হলেন, তারাও তো অনেক লোকের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। দোষী অনুভব করেন নিজের ছেলেকে ধরে রাখতে পারেননি বলে। কিন্তু তিনি তো কখনো প্রণবকে এইপথ বেছে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেননি। তবুও হয়তো তাঁরই মতো তাঁর প্রজন্মের সমস্ত মানুষ দোষী।

নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর পোষা খরগোশটির মৃত্যুর কথা মনে এল, একটা সামান্য প্রাণীর মৃত্যুতে মনটা কীভাবে হাহাকার করে উঠল। অথচ ভোরে উঠেই খালি খাঁচাটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মানসিক অস্থিরতার মধ্যে প্রশান্তর দিন কাটল। প্রশান্ত একগোছা খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন। চন্দ্রমা একটা মোড়া টেনে পাশে বসলেন। চন্দ্রমাকে অস্থিরভাবে একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে প্রশান্ত বুঝলেন স্ত্রী কিছু একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছেন না। তিনি কিছু জিজ্ঞেস না-করাই ভালো হবে বলে মনে করলেন। খরগোশটির প্রসঙ্গ ঘরের তিনিজন প্রাণীই সর্তকভাবে তুলতে চাইছেন না, শেষপর্যন্ত চন্দ্রমাই কথা বললেন — 'আজ আইজনি দিদির সঙ্গে ডালিমী এসেছিল।'

'কোন ডালিমী?'

'কেন, নাহারকাটিয়ার পাশে যে আমাদের জয়ার বন্ধু' —

কোন জয়া তিনি চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না, চন্দ্রমা কিন্তু চাল থেকে ধান বাছার মতো অনায়াসে সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন। প্রশান্ত বললেন — 'আচ্ছা কী হলো বলো?'

'ডালিমীর দেওর যে নিখোঁজ হয়েছিল —'

'কবে নিখোঁজ হয়েছিল?'

'ইস তুমি কোনো খবর রাখ না। কেন, খবরের কাগজেই কথাটা বেরিয়েছে।'

'আচ্ছা, বলে যাও।'

'দুদিন আগে কোনোভাবে খবরটা পেয়েছিল।'

— 'কোথাও পায়নি?' প্রশান্ত মাথা তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

— চন্দ্রমা অন্যমনস্কভাবে বলে গেলেন, 'কেউ মেরে ফেলেছে হয়তো।'

— ডালিমী খুব দুঃখ করছিল। নিখোঁজ হওয়ার তিনচারদিন আগে সে বৌদিকে বলেছিল — 'বৌদি তোমার হাতের চা খাবার জন্য আর কতদিন বা বেঁচে থাকব।' ডালিমী খুব ধমক দিয়েছিল — 'এখন অমঙ্গলময় কথা বলতে নেই।' প্রথমে ডালিমী ঠাট্টা বলে ভেবেছিল, কিন্তু সে বোধহয় সত্যিই বুঝতে পেরেছিল তাকে কেউ মারতে চাইছে।

— 'কেন মারতে চেয়েছিল?'

'বোধহয় মতের মিল হয়নি বলে। সে সব রাজনীতির কথা ভালো করে বুঝতে পারি না।'

'কে মারতে চেয়েছিল?' প্রশান্ত উৎসুকভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চন্দ্রমা আগের মতোই নিরুত্তাপভাবে বললেন — 'জানো! ডালিমীর কথাগুলো কীরকম লাগামছাড়া মনে হয়, বেচারি কম আঘাত পেয়েছে — ওর সমবয়সী দেওরের জন্য।'

প্রশান্ত চন্দ্রমার করুণমুখের দিকে তাকালেন। এত সরল চন্দ্রমা যে সরাসরি কথা না-বললে ঘুমোতেই পারেন না। 'ডালিমী তোমার সামনে এত বিস্তারিত ভাবে কেন বলল? বুঝতে পেরেছ?'

'বোঝার কী আছে? বেচারি আমার দুঃখ হাল্কা করার জন্য বলেছিল। কে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারতে পারে?

প্রশান্ত স্ত্রীকে কিছুই বললেন না। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রণবের কথা জানতে পেরেই ডালিমী দেওরের প্রসঙ্গ তুলেছিল। অন্যদিকে প্রণবরেও যে ডালিমী সন্দেহকারীদের তালিকায় রেখেছিল, সে কথা চন্দ্রমার না-বুঝে থাকাই ভালো বলে তিনি মনে করলেন।

প্রশান্ত খবরের কাগজগুলো অর্ধেক পড়েই ঘূর্ণায়মান টেবিলটির উপর ছুঁড়ে ফেলে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ঘনগভীর অন্ধকার আর অসহনীয় দুঃখ তাকে ঘিরে ধারল।

কতসময় ধরে গাড়ীর হর্ন বাজছে তিনি বুঝতেই পারেননি। খোলা জানলার পর্দা তুলে বাইরে তাকালেন। কাকভোরের আলোতে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। প্রশান্ত একদৌড়ে দরজাখুলে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে আসলেন। মরমী আর চন্দ্রমা ঘুমে। পাড়ার ওই প্রান্তের ভূঁইয়াদের বড়ো ছেলে বিনয় আর একজন অপরিচিত যুবক এগিয়ে এল। গেটে তালা লাগান ছিল। তালা খুলতে ভুলে গিয়ে চাবিটা তার হাতেই রয়ে গেল। বিনয় গেট মেলল। ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে নামিয়ে আনল প্রণবের ক্ষত-বিক্ষত দেহ। বোধহয় প্রশান্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কেউ প্রণবকে পিছনের উঠোনে শুইয়ে রেখেছে। মানুষের টুকরো-টুকরো কথাবার্তায় ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল—

বাগানের সামনে যে দোকানটি আছে তার সামনের নালাটিতে পড়েছিল।

ইস্ মুখটা যে থেঁতেলে দিয়েছে। চিনতেই পারা যায় না।

হাঁটুর মালাইচাকি বের করে দিয়েছে।

সুন্দর চেহারার ছেলেটার শরীরকে কীভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

সোফাতে কতক্ষণ এভাবে পড়ে ছিলেন প্রশান্ত জানেন না, টলতে-টলতে পিছনের উঠোনে নেমে আসলেন। মরমী আর চন্দ্রমা কোথায়। থেকে থেকে কে যেন কাঁদছে — চন্দ্রমা না অন্য কেউ? তিনি ছেলের নিথর নিঃস্পন্দ দেহের দিকে তাকালেন। অনেক লম্বা হয়েছিলি সে। কখন যে এত বড়ো হয়ে গিয়েছিলি তিনি বুঝতেই পারেননি। মাটিতে বসে তিনি তার মুখের দিকে তাকালেন — কালো রক্ত। তার কোমল মুখটি যেন হিংস্র জন্তুর আঁচড়ের আঘাতে হারিয়ে গেছে। প্রণবের একটি হাত হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে বললেন — 'তোর অস্ত্র কোথায়? বন্দুক কোথায় লুকোলি?' প্রশান্ত ছেলের বলিষ্ঠ বুকে মুখ গুঁজে অস্ফুটস্বরে বললেন — 'এমনিভাবে ঘুরে এলি?'

উঠোন ভর্তি রোদ। ভোরের একঝলক উজ্জ্বল রোদ এসে পিতাপুত্রকে স্পর্শ করল। ইতিমধ্যে পুলিশ আধিকারিক কনেস্টেবলরা তাঁদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনেক নিয়মকানুন আছে। এই সমস্ত ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না।

কেউ রেগে বলল, 'কাটা ছেড়া করে দেখবার কী আছে? পুলিশ আধিকারিক উচ্চবাচ্য করলেন না। তবে অল্প অপেক্ষা করতে বললেন।

সবাইকে অবাক করে হঠাৎ ভেতর থেকে চন্দ্রমা বেরিয়ে এলেন। পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে লাগলেন — 'সোনা তারা তোকে একা পেয়ে কীভাবে ঘিরে ধরে মারল।' কিছুক্ষণ পরেই আবার — 'উফ্ কুকুরগুলোকে তাড়াও তাড়াও — ওরে ওকে কীভাবে ধরে নিয়ে গেল রে — বলেই চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর নিথর হয়ে বসে পড়লেন। উঠোনে বিষণ্ণ নীরবতা বিরাজ করছে। আচমকা চন্দ্রমা তড়িৎগতিতে ছুটে বারান্দার একটি কোণে বেড়াতে রাখা দা-খানা হাতে তুলে নিলেন। রোদে দায়ের ধার চকচক করছে। চন্দ্রমা দা-খানা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন — 'ওকে একা পেয়ে ঘিরে ধরে মারল — কেটে ফেলব, কুকুর, তোদের সবাইকে কেটে ফেলব।'

বিনয় সাবধানে অগ্রসর হয়ে দা-খানা কেড়ে নিল। তারপর চন্দ্রমাকে ছেলের পাশে বসিয়ে দিল, চোখের অবিরাম ঝরে-পড়া জলে চন্দ্রমা কী দেখতে পেলেন — হৃষ্টপুষ্ট খরগোশটাকে না ক্ষতবিক্ষত হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে!

।। অনুবাদ : দেববানী দে।।



ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নির্বাচিত

গল্পগুচ্ছ

বাংলা অনুবাদ



অসম সাহিত্য সভা

প্রচ্ছদ সজ্জা : মনজিৎ রাজখোয়া